জিজ্ঞাসু রবীন্দ্রনাথ

ভবানীশঙ্কর চৌধুরী

B, C. P. L. No. 7

BIR CHANDRA PUBLIC LIBRARY

Class No. 891.44194 01
C - 552

Book No. B (8)

Accn. No. 37760

Date 21. 8. 63.

TAPA—31-1-62—10,000

This book is returnable on or before
the date last stamped.

জিজ্ঞাসু রবীন্দ্রনাথ

জিজ্ঞাসু রবীন্দ্রনাথ

শ্রীভবানীশঙ্কর চৌধুরী

37760
11-8-65

এস্, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স্ প্রাঃ লিঃ
১।১সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট্
ক লি কা তা

প্রকাশক— শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সরকার,
এস্. সি. সরকার, এ্যাণ্ড সন্‌স্ প্রাঃ লিঃ
১/১ সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-১২

১৩৬৩, পৌষ

দাম পাঁচ টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীবিভাসকুমার গুহঠাকুরতা
ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস।
৯/৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা-১২

নামকরণ

যখন লিখতে আরম্ভ করি তখন ভেবেছিলাম রবীন্দ্রনাথের জিজ্ঞাসু মূর্ত্তিটিই শুধু আঁকবো। কিন্তু লেখা কিছু দূর এগুতেই দেখা গেল তাঁর অন্যান্য মূর্ত্তিগুলিও সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ছে। কোনটিকেই বাদ দেওয়া উচিত নয়, কয়েকটিকেতো সম্ভবই নয়। তখন একে একে এসে পড়ল জাতীয়কবি রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি। মনে করলুম গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা সারবো, বইয়ের নাম দেবো নানা 'রবীন্দ্রনাথের একখানি মালা।" কিন্তু নামটা বড্ড কাব্যগন্ধমাখা। গদ্য সমালোচনা গ্রন্থের পক্ষে উপযুক্ত মনে হল না। তখন আর একটা নাম মনে এলো—দু তিন রকম রবীন্দ্রনাথ। Aldous Huxley'র Two or three Graces বইখানির নাম থেকেই এই নামটা মনে আসে। যার মতের বিশেষ মূল্য আছে এমন একজন বন্ধু নানা রবীন্দ্রনাথের একখানি মালা-ই উপযুক্ত বলে বিবেচনা করলেন। কিন্তু তার মতের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা সত্ত্বেও এ মত গ্রহণ করতে পারলাম না। আর দু' তিন রকম রবীন্দ্রনাথ নামটা সর্বসাধারণের ভাল নাও লাগতে পারে এ ভয়ও মন থেকে গেল না। সুতরাং 'জিজ্ঞাসু রবীন্দ্রনাথ' নামটা রাখতেই হল। তা' ছাড়া হাই কোর্টের শত বার্ষিকী উপলক্ষে আমাদের উকীল সভার সাহিত্য কর্মের যে ইতিহাস পেলাম তাতে ৺অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'কাব্য জিজ্ঞাসা'র সহিত ধারার অবিচ্ছিন্নতা রক্ষিত হবে ভেবেও প্রথম নামটিই বহাল রাখলুম। মধুসূদনের সঙ্গে যেমন হেমচন্দ্রের নাম করা হয় পরবর্তীকালের উকীল সভা হয়তো অতুলচন্দ্রের সঙ্গেও ভবানী শঙ্করের নাম করবে। তবে শেষোক্ত যুগলের পার্থক্যটা কতখানি এবং সম্পর্কটা কি তা নির্দেশ করবার জন্যেই জিজ্ঞাসু রবীন্দ্রনাথ কাব্য-জিজ্ঞাসার লেখকের স্মৃতিতে উৎসর্গ করলাম। উত্তর সাধকের এই শ্রদ্ধা নিবেদন আশাকরি অতুল বাবুর আত্মার কাছে অতৃপ্তিকর হবে না।

ধন্যবাদ

শ্রীমতী তৃপ্তি মজুমদার—(বড়) তার বহুযত্নসুরক্ষিত বিশ্বভারতী সংস্করণ রবীন্দ্র রচনাবলী ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্য। শ্রীমতী নীলিমা চৌধুরী ও শ্রীমতী তৃপ্তি মজুমদার (ছোট)—পাণ্ডুলিপির অংশ বিশেষ কপি করে দেওয়ার জন্য। শ্রীপ্রবীর চৌধুরী, শ্রীমতী স্বাগতা চৌধুরী ও শ্রীমান অরুণ শঙ্কর চৌধুরী—প্রুফ সংশোধনে সাহায্যের জন্য। মুদ্রক শ্রীবিভাষকুমার গুহঠাকুরতা—অতি অল্প সময়ে মুদ্রণ কার্য্য সম্পন্ন করার জন্য, এবং বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগ—প্রচ্ছদপটে রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত "নিজের ছবি" ব্যবহার করবার অনুমতির জন্য।

উৎসর্গ

ব্যবহারজীবী ও সমালোচক

কাব্য-জিজ্ঞাসা প্রণেতা

৺অতুলচন্দ্র গুপ্তের

স্মৃতিতে

সূচী

অবতরণিকা ১

আমিও রবীন্দ্রনাথ ১—কবিতা ছবি, ছবি কাব্য ৪—দুঃখের আঁধার রাত্রি ৫—নিজের ছবি ৭

জিজ্ঞাসু রবীন্দ্রনাথ ৯

সাধক রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসু শ্রেণীর ৯—প্রাকৃত মানুষ ও ক্রম-পরিণতি ১০—ক্রমপরিণতির ইতিহাস ১২—প্রতিভার উপাদান ১৫ জিনিয়াস্ ও যুগ্ম সত্তা ১৭—জীবন দেবতা ২১—বাল্যলীলা ও ভবিষ্যৎসম্ভাবনা ৪৫—পরিবেশের ফল ৪৮—দুঃখের অভিজ্ঞতা ৫১ গৃহে সন্ন্যাসী ৫৪—সন্ন্যাস ও স্বধর্ম ৫৭—রাজা নাটক ৬১—যত মত তত পথ ৭৫—সুদর্শনার প্রশ্ন ও উত্তর ৭৭

জাতীয় কবি ও রবীন্দ্রনাথ ৮২

জাতীয় কবি ও জাতীয় মানস ৮২—জাতীয় কবি ও মহাকাব্য ৯১

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ৯৯

রোমাণ্টিক রবীন্দ্রনাথ ১০৫

দূরের আকর্ষণ ১০৫—বৈষ্ণব সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ১০৭—রোমান্টিকের বিদ্রোহ ১০৯—রোমান্টিকের আত্মদর্শন ১১৭—রোমান্টিকের বৈশিষ্ট্যবাদ ১২২—প্রকৃতি প্রেম ১২৫—কল্পনা ১৩১ মরণ বিলাস ১৩৭—মিস্টিশিজম্ ১৪২—প্রেমপ্রবণতা ১৪৬

হিউম্যানিষ্ট রবীন্দ্রনাথ ১৫৪

অবতরণিকা

আমি ও রবীন্দ্রনাথ

আমি রবীন্দ্রনাথকে দেখি নাই। দূর থেকে যা দু'একবার দর্শন পেয়েছি তা না দেখারই মত। তবে দেখি নাই বলে আমার বেশি দুঃখও নাই। দেখলে কি হত? হয়তো পেতাম একটা স্বাক্ষর—দু ছত্র লেখা। ভক্তিভরে তা পূজা করা যেত সারা জীবন, কিন্তু আসল রবীন্দ্রনাথকে পাবার পক্ষে তা হয়তো অন্তরায় হয়েই থাকতো।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে কারলাইলের কথা, লেখক তাঁর বইখানা শেষ করে বলছেন, এই আমি যা' কিছু বুঝেছি, যা কিছু পেযেছি, যা কিছু হয়েছি, আমার মধ্যে যা কিছু বড়, যা কিছু সুন্দর, সব এইখানে রইল। বাকি আমি-টা খেয়েছে, ঘুমিয়েছে, প্রেম-কোঁদল করেছে—যা' সকলেই করে থাকে। সেখানে আমাকে চেনবার জানবার মত কিছু নেই।

ম্যাথিউ আর্নল্ডের জীবনীকার ট্রিলিঙ্গ-এর অভিজ্ঞতাও এই মতের সমর্থন করছে। আর্নল্ডের তখন বিশ্বজোড়া নাম। মার্কিন মুলুক ভ্রমণে বেরিয়েছেন তিনি। লক্ষ লক্ষ নরনারী শুধু তাঁর দর্শন ও কণ্ঠস্বর শ্রবণ প্রার্থী। বড় বড় সভায় আর্নল্ড তাঁর লেখা থেকে কিছু কিছু পাঠ করে শোনাচ্ছেন আর প্রণাম ও প্রণামী কুড়োচ্ছেন। অভিজাত মহলে তখন ভাগ্যবানেরা তাঁর সান্নিধ্য লাভ করে ধন্য হচ্ছে। জীবনীকার ট্রিলিঙ্গ এই ভাগ্যবন্তদেরই একজন। বয়স তার সতেরো কি আঠেরো। আর্নল্ডের দর্শনলাভে ধন্য হবার ঐকান্তিক আগ্রহে তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হয়েছেন। প্রবীণ লেখক বালকের কাঁধে হাত রেখে সস্নেহে কুশল প্রশ্ন করলেন, জিজ্ঞেস করলেন, খোকা তোমার বয়েস কত?

উত্তর অবশ্য একটা দিতে হল খোকাকে। কিন্তু তার অন্তরাত্মা অতৃপ্তিভরে বিদ্রোহ করে উঠল। এই কথা শোনবার জন্যে এত কষ্ট করে আরনল্ড দেখতে আসা?—খোকা, তোমার বয়েস কত?

অনুতপ্ত হৃদয়ে খোকা প্রতিজ্ঞা করল সে আর কখনও বড় লোকের দর্শন প্রার্থী হবে না।

অন্ততঃ যে বড় লোক লেখেন তাঁকে না দেখলেও ক্ষতি নেই। 'মহাকালের সোনার তরীতে তিনি আপনার পাকা ফসল সমস্তই বোঝাই করিয়া দিয়াছেন।' ব্যক্তি হিসাবে সেখানে তাঁর ঠাঁই না হলেও ক্ষতি নেই এ কথা রবীন্দ্রনাথও বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভের আমি কোনদিনও চেষ্টা করিনি। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শান্তিনিকেতনের ওপর একটা বিজাতি-সুলভ বিরূপতা লক্ষ্য করেই হয়তো ও-ব্যাপারে তেমন উৎসাহ আসে নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে তাঁর লেখার ভেতর দিয়ে জানবার ইচ্ছা আমার চিরকালই প্রবল ছিল। কোথায় যেন তাঁর মনের সঙ্গে আমার মনের একটু মিল ছিল যার জন্যে আমি তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়েছি। চতুর্থ শ্রেণী অর্থাৎ হাইস্কুলের ক্লাস সেভেনে যখন পড়ি তখনই ক্লাসের বই-এর বাইরে রবীন্দ্রনাথের বই আমার প্রিয়।

এক উগ্র স্বদেশী আবহাওয়ায় আমার ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়েছে। চারিদিকে বিপ্লবী দাদারা আমাদের ঘিরে ছিলেন। বন্ধু বান্ধব সহপাঠীরা সব অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত। আমাদের পাঠ অগ্নিবীণা, পথের দাবী, ডি ভ্যালেরার মাই ফাইট্ ফর্ আইরিশ্ ফ্রিডম্। একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু, পরবর্তীকালে তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আই, এন, এ,র লেফটেনাণ্ট কর্ণেল হয়েছিলেন—উগ্র নজরুল ভক্ত। দিনরাত অগ্নিবীণা বাজাচ্ছেন। ভোরবেলা দেখা হলে খুব উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে সুপ্রভাত জানান, বল বীর চির উন্নত মম শির। আমি বেসুরো গানে প্রত্যভিবাদন জানাই, আমার মাথা নত করে দাওহে তোমার চরণ ধূলার তলে। একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে বন্ধুটি একখানা গীতাঞ্জলি হাতে করে আমার ঘরে ঢুকলেন। বললেন, আমাকে তোমার রবীন্দ্রনাথের কবিতা বুঝিয়ে দাও।

নজরুলের রাজ্যে রবীন্দ্রনাথের হল জয়।

রবীন্দ্রনাথের ওপর বাঙ্গালী সমাজের বিরূপতার কথা বলছিলাম। আজকের পাঠক সেদিনের বিরূপতার চেহারা কল্পনা করতে পারবেন না। লেখক হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠালাভ তখন সম্পূর্ণ হয়েছে বটে কিন্তু মানুষ হিসেবে তখনও তিনি বাঙ্গালীর প্রিয় হতে পারেন নি। লোকের ধারণা তিনি উচ্ছৃঙ্খল বিলাস

ব্যসনের সমর্থক ও প্রচারক। বাঙ্গালীর সমাজ জীবনের তিনি কালা পাহাড়। তাঁর লেখা পড়া তাঁর গান গাওয়া বয়ে যাওয়ারই নামান্তর।

আর একটি কাহিনী মনে পড়ছে। রবীন্দ্র-জয়ন্তীর পরের এ ঘটনা।

আমি অসুখের পর মাদারীপুরে ফিরে গিয়েছি স্বাস্থ্য ভাল করতে। বিখ্যাত পণ্ডিত ৺কুঞ্জলাল নাগ মহাশয়ের পুত্র স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ নাগ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা। তিনিও ছুটী কাটাতে এসেছেন মাদারীপুরে। আমার ওপর খুব প্রসন্ন। বয়সের পার্থক্য ভুলে গিয়ে দু'জনে খুব অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছি। নাগ মহাশয় পৈত্রিক শিল্পীমন উত্তরাধিকার সূত্রেই লাভ করেছিলেন। অভিনয়ে দক্ষতাও ছিল তাঁর যথেষ্ট। কিন্তু সংসারী ব্যক্তি তিনি, ভদ্রতা তাঁর অপরিহার্য্য। রবীন্দ্রনাথের কথায় বললেন, বাবা আর একটু বয়স হলে বুঝবে। তোমার সামনে তোমার সতেরো আঠেরো বছরের মেয়েটি যদি ঘুরে ঘুরে গাইতে থাকে—"কি ঘুম তোরে পেয়েছিলো, হতভাগিনী, সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি" তাহলে সেদিন বুঝবে রবীন্দ্রনাথের গান ভাল না মন্দ।

আমি তাঁকে বললাম, আমার যদি মেয়ে হয় আর সে যদি গাইতে পারে তবে হয়তো আমিই তাকে ফরমাস কোরব একদিন এ গানটা গাইতে। তবে প্রয়োজন মনে করলে আমি হয়তো গানটার অর্থ তাকে বুঝিয়ে দেব।

তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, কি অর্থ?

আমি বললাম, ও গানে আমি সাধক, রাধা ভাবে—সে ভগবান, কৃষ্ণভাবে। ভগবান এমন সময়ে দেখা দেন যখন আমরা তাঁকে দেখবার জন্যে প্রস্তুত থাকি না। পরে সুযোগ হারিয়ে অনুতাপ হয়—যেমন পরমহংসদেবকে দেখবার জন্যে একটি লোক অনেক আগে থেকে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। তার ঘুম শেষ কবার পূর্ব্বেই পরমহংসদেব এলেন এবং সকলকে দর্শন ও আনন্দ দিয়ে চলে গেলেন। সে বেচারা পরে জেগে উঠে সব শুনে তো হায় হায় করে মরে।

সেদিন নাগ মহাশয় আর কিছু বললেন না। তারপর থেকে অবসর যাপনের বাকি দিনগুলিতে প্রত্যহই আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ ও আলোচনায় কাটাতেন।

আরো কত বাদানুবাদ করতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের জন্যে—কত গুণী-জ্ঞানীর সঙ্গে। সর্ব্বক্ষেত্রেই যে সফল হয়েছি তা নয় তবে সাধ্যমত ওকালতি করতে ত্রুটি করি নাই।

পাঠক হয়তো ভাবছেনলোকটার বড্ড অহঙ্কার। হ্যাঁ, আমিও ভাবছি এ অহংকার!

—তবে যাহাই হোক আর যাহারই হোক আরো দু'একটা কথা না বললে এ বই লেখার প্রয়োজন বা প্রস্তুতির কথা অবলাই থেকে যাবে।

কবিতা ছবি, ছবি কাব্য

স্কুল ছেড়ে কলেজে পড়ছি। রবীন্দ্রনাথ সত্তর বৎসর পার হলেন। এলো তাঁর জয়ন্তী। কলকাতায় রবীন্দ্র আলোচনা আরম্ভ হলো পুরোদমে। আমিও সাধ্য মতো অংশ গ্রহণ করলাম তাতে।

জয়ন্তী উৎসবে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার প্রদর্শনী হল। গোল বাঁধলো তাঁর ছবি নিয়ে। এ আবার কি রকম ছবি? এক ফরাসী সমালোচক বলে দিলেন, রবীন্দ্রনাথ যখন কবিতা লেখেন তখন ছবি আঁকেন আর যখন ছবি আঁকেন তখন লেখেন কাব্য। অনেকেই ভাবতে বসল। আমার মনেও চিন্তাচক্রে অদৃশ্যে সুরু হল ঘূর্ণন।

রসিক বন্ধু একটি হেসে বলল, স্বপ্নে দেখেছেন রাজা হবুচন্দ্র ভূপ, অর্থ তার ভেবে ভেবে গবুচন্দ্র চুপ। নে, রবি ঠাকুরের কবিতা বুঝিস সেই ভালো, ছবিতা বুঝে আর কাজ নেই।

আমিও ছাড়বার পাত্র নই। বললাম, গীতা বলেছেন, কাজকে যে অকাজ বলে মনে করে আর অকাজের মধ্যেই যে কাজ দেখে সেই তো প্রকৃত দ্রষ্টা।

তবে কাজ বা অকাজ খুব বেশিদূর এগোলনা।

অনেকদিন পর। বৈকালিক ভ্রমণ উপলক্ষে ময়দানে এক জায়গায় বসে আছি। আকাশে ঘনমেঘ অলস মন্থর গতিতে ভেসে যাচ্ছে। অকারণ দৃষ্টি গিয়ে নিবদ্ধ হল তাদের ওপর। ঐ মেঘখানাকে ঠিক উটের মত দেখায় না? বেশ তো, আরে ওটা যে এবার কুমীর হয়ে গেল! না, ওটা কুমীরও হতে পারে উটও হতে পারে। না, হাতি!—বেশ মজা তো—কেউ কাছে থাকলে জিজ্ঞেস করা যেতো, বলতো ওটা কি জন্তু?

বাস্—অমনি চিন্তার শিকলে টান পড়ল। মনে হল রবীন্দ্রনাথের সেই দুর্বোধ্য ছবিগুলি বোধ হয় এই রকমই। ওরা যে কি চিত্রকর তা দর্শককে কল্পনা করতে বলছেন। ওরা একটা কিছু বিশেষ নয়, ওরা অনেকের আভাষ।

আর যাই কোথায়। বাড়ী এসে একটা প্রবন্ধ লিখে ফেললাম। বিষাণ

বলে একখানা পত্রিকা ছিল। এখনও আছে কিনা জানি না। প্রবোধচন্দ্র মিত্র ছিলেন সম্পাদক। বৌবাজার থেকে বেরোতো। প্রবোধবাবু প্রবন্ধটি তার পত্রিকার জন্য নিলেন।

কিন্তু যথাসময়ে প্রবন্ধটি প্রকাশিত না হওয়ায় মনটা খুব দমে গেল। অনেকদিন পর আর তার কথা মনেও রইল না। এমন সময়ে একদিন দেখি বিষাণ আমার প্রবন্ধটি সগর্বে ঘোষণা করে একটি বিশেষ সংখ্যায় আত্মপ্রকাশ করেছে।

পরে প্রবোধবাবুকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন যে তিনি ওটা শান্তিনিকেতনে পাঠিয়েছিলেন—রবীন্দ্রনাথ নাকি ওটা পছন্দ করেছেন।

আরও অনেকদিন পর। ১৯৪২ সাল। আগষ্ট মুভমেন্ট আরম্ভ হল। অধ্যাপক বৃত্তি নিয়ে বিশ্বভারতীতে যোগ দিয়েছি। এদিকে মুভমেন্টের জন্যে কলেজ বন্ধ, কিন্তু আশ্রম ত্যাগ করার উপায় নাই। নানারকম আলোচনা চক্রের মধ্যে যথাসম্ভব শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হল।

বর্তমানে ভারত সরকারের মন্ত্রী শ্রীঅনিলকুমার চন্দ তখন অধ্যক্ষ। রাণী চন্দের আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ ছাপা হচ্ছে। প্রুফ সংশোধন করছেন অনিলদা। আমাকে শুনতে হবে তাঁর সঙ্গে বসে। রাজী হলাম। এক জায়গায় পেলাম, রবীন্দ্রনাথ বলছেন, আমার ছবিকে নন্দলাল অবন এত বড় বলে কেন জানি না। ওরা আমার একটা দর্শন মাত্র। একদিন দেখলাম শান্তিনিকেতনের বড় বড় গাছের ডালগুলি নানারকম জন্তু জানোয়ারের মূর্তি নিয়েছে। ছবিতে সেই দর্শনটিই রূপায়িত করতে চেষ্টা করলাম।

বললাম, অনিলবাবু, আপনাকে সাহায্য করতে এসে নিজেরও খুব উপকার হল। বিষাণের প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ছবির অপব্যাখ্যা করি নাই।

দুঃখের, আঁধার, রাত্রি···

রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়ে একবার এক বিপদ বাধলো। কবির মৃত্যুর দিন কাগজে বেরোলো ‘মৃত্যু’ নাম দিয়ে এক কবিতা—“দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে এসেছে আমার দ্বারে।” হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের টেলিগ্রাফ সংস্করণে কবিতাটি পড়ে মন খারাপ হয়ে গেল। বললাম, এ কবিতার ঠিক নামকরণ হয়নি। নামটি রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নয়।

আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ স্কলার। বিদ্বৎসমাজেই অধিবাস। আমার কথা অনেকেরই কানে গেল। ডাঃ অমিয় চক্রবর্ত্তী ছিলেন। তিনি বললেন, নামে কি আসে যায়? শেলীর ALASTOR-এর নাম Spirit of the Wilderness হলে কি হত?

আমি ঠোঁটকাটা। জবাব দিলাম, কি হত জানি না। তবে আলুকে পটল বললে লোকের একটু অসুবিধে হয় বই কি?

ক্ষীণ প্রতিবাদ জিয়িয়ে রেখে ডাঃ চক্রবর্তী বললেন, হয় তো তোমার অনুমানই ঠিক। আমি বিশ্বভারতীতে খোঁজ নিয়ে দেখি। অনিল বা অন্য কেউ নামটা দিয়ে থাকবে। গুরুদেব সম্ভবতঃ নামের কথা তখন আর ভাবেননি।

ইতিমধ্যে প্রবাসীতেও মৃত্যু নাম দিয়ে কবিতাটা বের হল। এক সভায় রামানন্দবাবুর সাক্ষাৎ পেয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম ঐ কবিতাটার "মৃত্যু" নাম কোত্থেকে এল। তিনি একটু বিরক্ত হয়েই উত্তর দিলেন, আমি কি জানি? বিশ্বভারতী নাম শুদ্ধ ই কবিতাটা আমাদের দিয়েছে।

এততেও কিন্তু শান্তি পেলাম না। একটা প্রবন্ধ লিখলাম, মৃত্যুর কবিতা কেউ মৃত্যুর সময়ে লেখে না। টেনিসন, ব্রাউনিং প্রভৃতির মৃত্যু কবিতাগুলি উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করলাম। রবীন্দ্রনাথের "মৃত্যুঞ্জয়" থেকে এর "দুঃখঞ্জয়" নামকরণ সুপারিশ করে বা নাম ছাড়াই প্রথম লাইনটি নামস্বরূপ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালাম। বিশ্বভারতীর নিকট নামকরণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবারও অনুরোধ রইল—বিশেষ করে অনিলবাবুর দায়িত্ব সম্বন্ধে।

প্রবন্ধটি ছাপানো হল সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্যের বঙ্গশ্রীতে। অনেকগুলি Reprint চেয়ে নিলাম ঝগড়া পাকাবার জন্যে। তারপর তারই একটা শান্তিনিকেতনে শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একটা চিঠির সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম।

বুঝেছিলাম পৈত্রিক সম্পত্তিতে পুত্রের যত্ন সবচেয়ে বেশি। যদি কেউ এ ব্যাপারে মাথা ঘামায় তো সে ব্যক্তিটি ইনিই হবেন।

আমার অনুমান সত্য হল। কয়েকদিন পরেই রথীবাবুর ধন্যবাদ এল। আমার অনুমান ঠিক। কবি ও-কবিতাটির কোন নাম করণ করেননি। তবে নামকরণের দায়িত্বটা তিনি সংবাদ পত্রের ওপরই চাপালেন।

এর পর বিশ্বভারতী প্রথম ছত্রটিকেই নামরূপে ব্যবহার করে কবিতাটি ছাপান।

পরবর্ত্তীকালে অধ্যাপকরূপে বিশ্বভারতীতে যোগ দিতে গেলে অনিলবাবু

interview-এর পরেই আমাকে বললেন, "ঐ কবিতাটির নামকরণে আমার কোন হাত ছিলনা। গুরুদেবের লেখায় হাত দেবো এমন ঔদ্ধত্য আমার নাই।"

বলতে কি এই ব্যাপারটা উপলক্ষ করে চাকরী জীবনে একটু মান বেড়েই গিয়েছিলো। অন্ততঃ এইটুকু সুবিধে হয়েছিল যে নবাগত বা বহিরাগত হলেও শান্তিনিকেতনে আমি অনধিকারী বিবেচিত হই নাই।

নিজের ছবি

শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে চিত্রশিল্পে মনোযোগ দেবার একটু অবসর হ'ল। কেন জানিনা বেণুকুঞ্জের বৈঠক থেকে শিল্পগুরু নন্দলাল বসু আমার ওপর প্রসন্ন হয়ে পড়লেন। ক্রমে প্রত্যহ কিছুটা সময় যেন পরস্পরের সঙ্গ না পেলে দুজনেরই ভাল লাগতোনা।

নন্দলালবাবু অতি স্নেহ ভরেই এই সময়ে আমাকে নানারূপ শিল্পকলার নিদর্শন দেখাতেন এবং বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করতেন। স্বভাবতঃই দুজনের দৃষ্টিকোণের একটা পার্থক্য প্রথম থেকেই ফুটে উঠল। নন্দলাল বাবুর উৎসাহ শিল্পের রং ও রেখায়, আমার উৎসাহ তার অন্তর্নিহিত ভাব-বস্তুতে।

এরমধ্যে একদিন বিশ্বভারতী পত্রিকাতে প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত তাঁর নিজের ছবি।

ছবিটা দেখেই গবুচন্দ্রের চির পরিচিত ভূমিকাটায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও মন নেবে পড়ল। কিন্তু চুপ করে থাকা ছাড়া আর কিছু সম্ভব হল না। বেণুকুঞ্জের মজলিসে একদিন কথাটা পাড়লুম।

নন্দলালবাবু বোঝাতে লাগলেন, সরল ঋজুরেখা যৌবনের প্রতীক, বক্র বার্দ্ধক্যের, ইত্যাদি।

কিন্তু মন মানতে চাইল না।

এরপর একদিন সুরসিক, বর্ত্তমানে অধ্যাপক, অনিল চট্টোপাধ্যায় খুব গম্ভীর ভাবে বললেন, ও, গুরুদেবের ঐ ছবিটা? তা শুনুন, একদিন গুরুদেবের দোয়াতের মধ্যে একটা আরসুলো পড়েছিল। আরসুলোটাকে ঠেলে তুলতেই সে বেটা টেবিলের ওপর রক্ষিত গুরুদেবের একখানা ফটোগ্রাফের ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তারপর সেখান থেকেও সেটাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে গুরুদেব ছবিখানার দুর্দশা দেখতে লাগলেন। হঠাৎ কি মনে করে তার তলায় লিখে দিলেন, কবি অঙ্কিত তার নিজের ছবি।

খুব হাসির রোল পড়ে গেল। বক্তাও বিজয় গর্বে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। শুধু বেশিক্ষণ হাসতে পারলাম না আমিই।......

আরও দু'একদিন কেটে গেছে। সন্ধ্যার পর আমাদের ব্যাচেলারস্ কোয়ার্টার্সের বারান্দায় ঘুরে ঘুরে বাহিরের অন্ধকার দেখছি। কণ্ঠে সুরতালহীন গুন্‌গুন্ চলছে—

আঁধার রাতে একলা পাগল যায় কেঁদে।
বলে শুধু, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে॥
আমি যে তোর আলোর ছেলে—
সামনে দিলি আঁধার মেলে,
মুখ লুকালি মরি আমি সেই খেদে॥......

বাস্! হঠাৎ association of idea-য় টান পড়ল। কবিতা ছেড়ে মন চলে গেল ছবিতে। হ্যাঁ! এই তো! এই তো সেই ছবি। ফটোগ্রাফের ওপর আরসুলোর পায়ের দাগের মত আঁকিবাকি। হ্যাঁ, ওই মাকড়সার জালের মত দাগগুলোই তো অন্ধকার। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ চোখ দুটো বড় বড় করে যথাসম্ভব কষ্টে আঁধারের ভেতর দিয়ে দেখতে চেষ্টা করছেন। দেখতে পারছেননা বলে চোখে জল এসেছে। দুটো চোখের দু'কোণে দুটো বড় বড় ফোঁটা। এই তো কবির চোখে তাঁর আপন রূপ। তিনি সত্যান্বেষী। তিনি চির জিজ্ঞাসু। যাঁকে প্রথম দিনের সূর্য্য প্রশ্ন করেছিল সত্তার নূতন আবির্ভাবে, 'কে তুমি'? আবার দিবসের শেষ সূর্য্যও যাঁর কাছে শেষ প্রশ্ন রেখে গেল, 'কে তুমি'?—কিন্তু পেল না সে, পেল না উত্তর। প্রশ্নই শুধু রইল শাশ্বত হয়ে। সমুদ্রের মত তাঁর অনন্ত জিজ্ঞাসা। ইনিই জিজ্ঞাসু রবীন্দ্রনাথ।

পরের দিন নন্দলালবাবুর সঙ্গে দেখা হলে বললাম সব কথা। তিনি খুশি হলেন। হেসে বললেন, আমি পটুয়া মানুষ ঐ রেখা আর রংই বুঝি। আপনি গভীর অর্থ খোঁজেন, তাই পান-ও তাই-ই।

রবীন্দ্রনাথের এই জিজ্ঞাসু রূপটিই বর্ত্তমান গ্রন্থের উপজীব্য।

জিজ্ঞাসু রবীন্দ্রনাথ

সাধক রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসু শ্রেণীর

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন,
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

(—গীতা—৭ম অঃ ১৬শ শ্লোকঃ)

ঈশ্বরের ভজন করেন চার রকম লোক—আর্ত অর্থাৎ দুঃখী, জিজ্ঞাসু বা সত্যান্বেষী, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী। ইহার মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীর পূজারীর সংখ্যাই সর্ব্বাধিক। কষ্টে পড়েই মানুষ ঈশ্বরের পানে চায়। অর্থাভাবও মানুষকে ঈশ্বর মুখী করে। তবে ইহারা নিকৃষ্ট ভক্ত। ঈশ্বরকে তারা চায় কেন না তাঁর সাহায্যে দুঃখ ও দারিদ্র্য মোচন হতে পারে এবং তৎপর সুখ ও সম্পদ লাভ করা যায়। অতি প্রাচীনকাল থেকেই আর্ত ও অভাবগ্রস্ত মানুষ নানা দেব দেবীর উপাসনা করে দুঃখ ও অভাব থেকে পরিত্রাণ পেতে চেষ্টা করে এসেছে। Lords' prayer-এর give us this day our daily bread প্রার্থনাটি ইহারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

কিন্তু সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যখন daily bread এর সমস্যাটার একরকম সমাধান হয়ে গেল, যখন শিকার না জুটলেও আহার বন্ধ রইলনা তখন বাকী রইল রোগ শোক। যারা ভাগ্যক্রমে রোগ শোকের হাত থেকে রেহাই পেলেন তাদের—আর ঈশ্বরের নাম করার প্রয়োজন রইল না। তখন শুধু ঈশ্বর সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত রইলো সত্যান্বেষীর দল—যারা জানতে চান—এ জগৎটা ভাল কিম্বা মন্দ কিম্বা যা হোক একটা কিছু। এরাই জিজ্ঞাসু ভক্ত। জ্ঞানীর অবশ্য ভগবানে প্রয়োজন নাই। তবে জ্ঞানী বুঝেছেন ঈশ্বরই সত্য। সুতরাং সেই সত্যকে নিয়েই তিনি থাকবেন বইকি? এ তো সর্বশেষ অবস্থা। বহুজন্মের পর লাভ হয়। বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেব সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।

—(গীতা—৭—১৯)

এই তো জ্ঞানীর পূজা। জ্ঞানলাভ করার পর পূজা। সিদ্ধির পরে সাধনা। এ যেন বিখ্যাত ক্রীড়াকুশলীর ক্রীড়ানুশীলন বা প্র্যাক্টিস্। যা পেয়েছি তারই

সংরক্ষণার্থে করনীয়। নোতুন কিছু পাবার জন্যে নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ যাকে বলতেন আগে ফল পরে ফুল। নিত্যসিদ্ধেরা এই দলের লোক। ইঁহাদের সংখ্যা খুবই অল্প। ইঁহারা খানিকটা অপ্রাকৃতও বটেন। অস্বাভাবিক, শুধু অসাধারণ নন। এঁদের জীবন খানিকটা অবিশ্বাস্য। জন্ম থেকেই তাঁরা ঈশ্বরমুখী। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, চৈতন্য, রামকৃষ্ণের দল। অতিমানুষ, মানবিক দুর্বলতা ও বাধা বিপত্তি এঁদের সাধনার অন্তরায় হয়না। এঁদের মনে কখনও সন্দেহের ছায়া পড়েনা ; অবিশ্বাস সাধনার ফল গ্রাস করে না। শ্রীরামকৃষ্ণের পাকা পাশা খেলোয়াড়, যা বলা তাই দান পড়া। কচ ছ' বারো, তো কচ ছ' বারো। এঁদের পিতা বলে প্রণাম করা যায়, কিন্তু বন্ধু বলে এঁদের দুহাত ধরা যায় না।

সুতরাং প্রাকৃত মানুষ সাধক হলে অবশিষ্ট ঐ জিজ্ঞাসু দলেই পড়বে। সংসারকে সে দেখবে, ভোগ করবে, তারপর ভোগকে ছাড়িয়ে সে সাধনার স্তরে উঠে আসবে। ভোগের অতৃপ্তি ও ক্ষণিকতাই তাকে নিত্য তৃপ্তির দিকে ঠেলে দেবে। সে জানতে চাইবে, কেন এই অতৃপ্তি ? কিসে তৃপ্তি লাভ হয় ? তার এই জিজ্ঞাসাই তার সাধনার কারণ বা হেতু। সংশয়, অবিশ্বাস, শ্রান্তি, দুর্ব্বলতা অনেক সময়েই তার সাধনাকে গ্রাস করবার উপক্রম করবে। তবে উঠে, পড়ে, জিরিয়ে, কেঁদে, কঁকিয়ে, তার পদযাত্রা চলতে থাকবে। মাঝে মাঝে প্রতিহত হলেও তা পরিত্যক্ত হবে না। গন্তব্য তীর্থের সে দর্শন পাবে, কিন্তু সেখানে ইচ্ছামতই গিয়ে পৌঁছতে পারবে না। সে এপারের লোক কিন্তু ও পারের যাত্রী। মাঝখানে সংশয় ও অজানার ক্ষীণ পর্দ্দার ব্যবধান। এই পর্দ্দার এদিকে থেকেই ওদিক সম্বন্ধে তার কৌতুহল। আর সেই কৌতুহল মেটাবার চেষ্টাই তার সাধনা।

রবীন্দ্রনাথ এই শেষোক্ত দলেরই সাধক।

প্রাকৃত মানুষ ও ক্রমপরিণতি

রবীন্দ্রনাথ মানুষ—প্রাকৃত মানুষ এবং প্রকৃত মানুষ, দুই-ই। শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্যের ভেতর দিয়ে দেহ ও মনের পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন ও পরিণতি তার জীবন, চিন্তা ও লেখার বৈশিষ্ট্য। দোলনায় শুয়েই বীরত্বের পরিচয় যাঁরা দেন বা জন্ম থেকেই বৈরাগ্যের বাণী আওড়ান সেইসব হারকিউলিস্ বা শুকদেবদের দলে উনি নন্। বরং বৃন্দাবনের যে ক্রীড়ামোদী রাখাল বালক কালে কুরুক্ষেত্রের নিয়ামক ও গীতা-উদ্গাতা এবং যুধিষ্ঠিরের

রাজসূয় যজ্ঞসভায় ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলে নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন, এই ক্রম পরিণতির দিক দিয়ে যেন তাঁর সঙ্গেই রবীন্দ্র চরিত্রের খানিকটা সাদৃশ্য আছে। (অবশ্য উপমাটা আমি এই ক্রম-পরিণতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাই সে কথা উহ্য থাকে।)

তবে রবীন্দ্রনাথের জন্ম থেকে শত বর্ষ পরে বসে যারা তাঁর লেখা পড়বেন এ কথাটা মনে রাখা তাদের পক্ষে খুবই শক্ত। শত বর্ষ পরে কেন আরও পঁচিশ বছর আগে থেকেই সেটা শক্ত হয়ে উঠেছিল। শুধু আমার নয় আমার বয়োজ্যেষ্ঠদেরও। যারা রবীন্দ্রবিদ্বেষী—তাদের কথা তো আলাদাই। যারা রবীন্দ্র ভক্ত তাদের কথাই বলছি। বীরপূজা শুরু হলে বীরের জন্মমুহূর্ত্ত পর্য্যন্তই তা প্রসারিত হয়ে থাকে। ফলে রবীন্দ্র ভক্তদের কাছে তিনি আজন্ম গুরুদেব, বিশ্বকবি। তাদের কাছে তাঁর কৈশোর ও যৌবনের কাব্য ও একটা পরিণত বয়সের পরিপক্কতা লাভ করে। অকালপক্কতা। অবশ্য দোষটা কবির নয়, কবি-ভক্তদের। উদাহরণস্বরূপ দেখাতে পারি রবীন্দ্রনাথের হৃদয় যমুনার ব্যাখ্যা —৺চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত। যদিও চিত্রায় রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন যে উর্ব্বশীর মদির গন্ধে

মধুমত্ত ভৃঙ্গ সম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধ চিতে
উদ্দাম সঙ্গীতে।

তবু চারুবাবু সোনার তরীর হৃদয় যমুনার সম্বন্ধেই লিখছেন,—"কবি নিজের হৃদয় যমুনায় বিশ্ববাসী সকলকেই আহ্বান করিতেছেন। যাহার যতটুকু প্রয়োজন সে ততকুটুই লউক, কিন্তু সকলেই আসুক, সকলেরই অভাবমোচনের মত প্রসারতা ও গভীরতা ও উপযোগিতা তাঁহার হৃদয়ের আছে, এবং বিশ্ববাসী প্রত্যেককেই তৃপ্ত করিতে না পারিলে তাঁহার প্রতিভার পূর্ণ সার্থকতাও তো হইবে না।"

—(রবিরশ্মি-১ম খণ্ড, ৩১২ পৃঃ)

পাঠক একবার সোনার তরী খুলিয়া দেখুন—

যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ এসো ওগো এসো মোর
হৃদয়নীরে—
তলতল ছলছল কাঁদিবে গভীর জল
ওই দুটি সুকোমল চরণ ঘিরে।

পড়ে যান।

বিশ্ববাসী সকলের প্রতি আহ্বান চারুবাবু কোথায় পেলেন? অবশ্য কোথায় পেলেন তা তিনি লুকোতে পারেন নি, তাঁর—"বিশ্ববাসী প্রত্যেককে তৃপ্ত করিতে না পারিলে তাঁহার প্রতিভার পূর্ণ সার্থকতাও তো হইবে না" এই বিশ্বাস এবং ভয়ের মধ্যেই চারুবাবুর হৃদয় যমুনায় রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববাসী সকলকে আহ্বান নিহিত আছে।

কিন্তু কেন এই ভয়? রবীন্দ্রনাথের কি যৌবন বা যৌন আকর্ষণ থাকতে নেই কোনদিন? তিনিও কি কোনদিন সাধারণ মানুষের মত নারীর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করতে পারেন না? তিনি তো উদ্দাম সঙ্গীতে তারই স্বীকৃতী রেখে গেছেন—তবে আমাদের ভক্তি তার কদর্থ করছে।

ক্রমপরিণতির ইতিহাস

রবীন্দ্রনাথের লেখায় পৌগণ্ড থেকে পরিণতির কথা তিনি নিজেই খুব সুন্দর করে বলে গেছেন। ইহজন্মেই তিনি নিজের কাব্যের যে সমালোচনা করেছেন তা থেকে তাঁর মানসিক ক্রম-পরিণতির কথা বুঝতে পারা যায়।—The **growth and development of his Mind and Art** "রচনা-বলীর" 'সূচনা' কয়েকটিতে পরিস্ফুট। সন্ধ্যা সংগীত সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন। —"এই গ্রন্থাবলীতে আমার কাব্য রচনার প্রথম পরিচয় দিয়ে দেখা দিয়েছে সন্ধ্যা সংগীত। তার পূর্বেও অনেক লেখা লিখেছি কিন্তু সেগুলোকে লুপ্ত করবার চেষ্টা করেছি অনাদরে। হাতের অক্ষর পাকাবার যে খাতা ছিল বাল্যকালে সেগুলিকে যেমন অনাদরে রাখিনি, এও তেমনি। সেগুলি ছিল যাকে বলে কপিবুক, বাইরে থেকে মডেল লেখা নকল করবার সাধনায়। কাঁচা বয়সে পরের লেখা মক্শ করে আমরা অক্ষর ছেঁদে থাকি বটে কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার মধ্যেও নিজের স্বাভাবিক ছাঁদ একটা প্রকাশ পেতে থাকে। অবশেষে পরিণতিক্রমে সেইটেই বাইরের নকল খোলসটাকে বিদীর্ণ করে স্বরূপকে প্রকাশ করে দেয়। প্রথম বয়সের কবিতাগুলি সেই রকম কপিবুকের কবিতা।"

প্রভাত সঙ্গীতের "সূচনা"তে বলেছেন – প্রভাত সংগীতে যে অবস্থায় আমার প্রথম বিকাশোন্মুখ মন অপরিণত ভাবনা নিয়ে অপরিস্ফুট রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিল তার কথা আজও আমার মনে আছে। তার পূর্ব্বে সন্ধ্যা সংগীতের পর্ব্বে আমার মনে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের গদগদভাষী আন্দোলন চলছিল।

প্রভাত সংগীতের ঋতুতে আপনা আপনি দেখা দিতে আরম্ভ করেছে একটা

আধটা মননের রূপ, অর্থাৎ ফুল নয় সে, ফসলের পালা, সেও অশিক্ষিত বিনা চাষের জমিতে। সেই সময়কার কথা মনে পড়ছে যখন কোথা থেকে কতকগুলো মত মনের অন্দর মহলে জেগে উঠে সদরের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল।"

ছবি ও গান সম্বন্ধে বলছেন। "এটা বয়ঃ সন্ধি কালে লেখা, শৈশব যৌবন যখন সবে মিলেছে। ভাষায় আছে ছেলেমানুষি, ভাবে এসেছে কৈশোর। তার পূর্বেকার অবস্থায় একটা বেদনা ছিল অনুদ্দিষ্ট, সে যেন প্রলাপ বকে আপনাকে শান্ত করতে চেয়েছে। এখন সেই বয়স যখন কামনা কেবল সুর খুঁজছে না, রূপ খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু আলো আঁধারে রূপের আভাষ পায়, স্পষ্ট করে কিছু পায়না। ছবি এঁকে তখন প্রত্যক্ষতার স্বাদ পাবার ইচ্ছা জেগেছে মনে কিন্তু ছবি আঁকার হাত তৈরি হয় নি তো।"

কবি সংসারের ভিতরে তখনো প্রবেশ করেনি, সে বাতায়নবাসী। দূর থেকে যার আভাস দেখে তার সঙ্গে নিজের মনের নেশা মিলিয়ে দেয়। এর কোনো কোনোটা চোখে দেখা একটুকরো ছবি পেনসিলে আঁকা, রবার ঘষে দেওয়া, আর কোনো কোনোটা সম্পূর্ণ বানানো। মোটের উপরে অক্ষম ভাষার ব্যাকুলতায় সবগুলিতেই বানানো ভাব প্রকাশ পেয়েছে, সহজ হয়নি। কিন্তু সহজ হবার একটা চেষ্টা দেখা যায়। সেইজন্যে চলতি ভাষা আপন এলোমেলো পদক্ষেপে এর যেখানে সেখানে প্রবেশ করছে। আমার ভাষায় ও ছন্দে এই একটা মেলা-মেশা আরম্ভ হল। ছবি ও গান কড়ি ও কোমলের ভূমিকা করে দিল।"

তারপর ভানুসিংহের পদাবলী সম্বন্ধে কবি বলেছিলেন "অক্ষয়বাবুর কাছে শুনেছিলুম বালক কবি চ্যাটার্টনের গল্প। তাঁকে নকল করবার লোভ হয়েছিল। এ কথা মনেই ছিলনা যে ঠিকমতো নকল করতে হলেও শুধু ভাষায় নয় ভাবে খাঁটি হওয়া চাই। নইলে কথার গাঁথুনিটা ঠিক হলেও সুরে তার ফাঁকি ধরা পড়ে। পদাবলী শুধু কেবল সাহিত্য নয়, তার রসের বিশিষ্টতা বিশেষ ভাবের সীমানার দ্বারা বেষ্টিত। সেই সীমানার মধ্যে আমার মন স্বাভাবিক স্বাধীনতার সঙ্গে বিচরণ করতে পারে না। তাই ভানুসিংহের সঙ্গে বৈষ্ণবচিত্তের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা নেই। এ জন্য ভানুসিংহের পদাবলী বহুকাল সঙ্কোচের সঙ্গে বহন করে এসেছি। একে সাহিত্যে একটা অনধিকার প্রবেশের দৃষ্টান্ত বলেই গণ্য করি।......"

আর কড়ি ও কোমল সম্বন্ধে কবির মন্তব্য শুনুন।—"যৌবন হচ্ছে জীবনে সেই ঋতু পরিবর্তনের সময় যখন ফুল ও ফসলের প্রচ্ছন্ন প্রেরণা নানা বর্ণে ও রূপে অকস্মাৎ বাহিরে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। কড়ি ও কোমল আমার সেই নব যৌবনের রচনা। আত্ম-প্রকাশের একটা প্রবল আবেগ তখন যেন উপলব্ধি করেছিলুম। ……এই আমার প্রথম কবিতার বই যার মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বহির্দৃষ্টি প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আর প্রথম আমি সেই কথা বলেছি যা পরবর্তী আমার কাব্যের অন্তরে অন্তরে বরাবর প্রবাহিত হয়েছে।"

মানসীর সূচনায় কবি লিখেছেন।—গাজিপুরে এসে "মন নিমগ্ন হল অক্ষুণ্ণ অবকাশের মধ্যে। আমার গানে আমি বলেছি—আমি সুদূরের পিয়াসী। পরিচিত সংসার থেকে এখানে আমি সেই দূরত্বের দ্বারা বেষ্টিত হলুম; অভ্যাসের স্থূল হস্তাবলেপ দূর হবামাত্র মুক্তি এলো মনোরাজ্যে। এই আবহাওয়ায় আমার কাব্য রচনার একটা নতুন পর্ব আপনি প্রকাশ পেলো। আমার কল্পনার ওপর নূতন পরিবেষ্টনের প্রভাব বাববার দেখেছি। এই জন্যেই আলমোড়ায় যখন ছিলুম আমার লেখনী হঠাৎ নতুন পথ নিল শিশুর কবিতায়, অথচ সে জাতীয় কবিতার কোনো প্রেরণা কোনো উপলক্ষ্যই সেখানে ছিল না। পূর্বতন রচনাধারা থেকে স্বতন্ত্র এ একটা নূতন কাব্যরূপের প্রকাশ। মানসীও সেই রকম। নূতন আবেষ্টনে এই কবিতাগুলি সহসা যেন নবদেহ ধারণ করল। পূর্ববর্তী কড়ি ও কোমলের সঙ্গে এর বিশেষ মিল পাওয়া যাবে না। আমার রচনার এই পর্বেই যুক্ত অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে ছন্দকে নূতন শক্তি দিতে পেরেছি। মানসীতেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।"

"…সোনার তরীর লেখা আর এক পরিপ্রেক্ষিতে। বাংলা দেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নূতনত্ব চলন্ত বৈচিত্র্যের নূতনত্ব। শুধু তাই নয়, পরিচয়ে-অপরিচয়ে মেলামেশা করেছিল মনের মধ্যে। বাংলা-দেশকে তো বলতে পারিনে বেগানা দেশ, তার ভাষা চিনি, তার সুর চিনি। ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্দরমহলে আপন বিচিত্র রূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানাশোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে, যে উদ্বোধন এনেছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোটো গল্পের নিরন্তর ধারায়। সে ধারা আজও থামত না যদি সেই উৎসের

তীরে থেকে যেতুম। যদি না টেনে আনত বীরভূমের শুষ্কপ্রান্তরের কৃচ্ছ্র সাধনের ক্ষেত্রে।”

প্রতিভার উপাদান

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যে নোবেল প্রাইজ পকেটে করেই জন্মাননি তা আর কেউ না বুঝুন রবীন্দ্রনাথ নিজে বুঝতেন। তাঁর জীবনে চিন্তায় ও কাব্যে একটা ক্রম পরিণতির দিক আছে। কী সে দিক আর কি ভাবে সেই পরিণতিলাভ হল এবার সেটাই বিবেচ্য। তবে সবার আগে বিবেচ্য কার ক্রমপরিণতি– ওটা তাঁ'র। অর্থাৎ তাঁ'র নিজের—রবীন্দ্রনাথ নামধেয় ব্যক্তিটির।

বিখ্যাত ফরাসী সমালোচক M. Taine তাঁর Shakespeare সমালোচনায় একটা থিওরি দিয়েছেন প্রতিভার। প্রতিভা তিনটি জিনিষের সংমিশ্রণের ফল। The Race the Milieu and the Moment—জাতি, পরিবেশ ও যুগ। অর্থাৎ একজন প্রতিভাবান ব্যক্তির চরিত্রে তিনটি দিক আছে। একটি তার জাতিগত, দ্বিতীয়টি তার পারিপার্শ্বিক বা পরিবেশগত, এবং তৃতীয়টি তার যুগ বা কালের। এই তিনটির প্রভাবেই ব্যক্তি বিশেষের প্রতিভা বিশেষ রূপ ও বিস্তার লাভ করে। ইংরেজ জাতিতে, লণ্ডন সহরে, এলিজাবেথান যুগে সেক্সপীয়ারের প্রতিভা যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকাররূপে ফুটে উঠেছিল তার কারণ ঐখানেই। এলিজাবেথান যুগ ইংরেজ জাতির পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের যুগ। বিশ্বের সকলকে হারিয়ে দিয়ে ইংরেজ পৃথিবী-জয়ী হয়ে উঠল সে সময়ে। Armada বিজয় আর নাটক বিজয় সমকালীন ঘটনা। আর জীবনের যে উচ্ছল মদিরা পান করে এলিজাবেথীয় ইংরেজ পাগল হয়ে জীবনের সমস্ত দিক আলোকিত, উদ্ভাসিত করতে চেয়েছিল তার সেই চেষ্টার প্রতিবিম্ব শুধু নাট্য সাহিত্যেই ধরা সম্ভব। নাট্যকারও জীবনরসিক, সমস্তটুকু রসই তার চাই, মায় বীররসটুকু শুদ্ধ। Shakespeare-এর প্রতিভা তাই নাট্যকার না হয়ে উপায় ছিল না।

ইদানীং কালে এলে থিওরিটা আরো বোধগম্য হত। জাতির কথাই ধরা যাক। ইংরেজ আর বাঙালী। কাল একই। রবীন্দ্রনাথ ও Thomas Hardy. হার্ডির সমকালীন ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেও রবীন্দ্রনাথ ধর্ম্মের কবি। তাঁর লেখা গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, (গীতি) নৈবেদ্য—সব পূজা উপচার। তাঁর সাহিত্য-সাধনা পূজা বিশেষ। তিনি ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত। আর Hardy জড়বাদ কবলিত ইউরোপের সন্তান, তাই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে ব্যঙ্গরচয়িতা। তার কাছে মানুষের অমরতা তার দেহের

নবপরিণতিতে—হয়তো গলিতদেহ বৃক্ষের খাদ্য হয়ে বৃক্ষে রূপান্তরিত হল—বা আত্মীয়-বন্ধুর স্মৃতিতে মাত্র। God forsaken কবিতায় তিনি দেখিয়েছেন অতিবৃদ্ধ সৃষ্টিকর্তা তাঁর যৌবনসৃষ্ট মাটির ঢেলা পৃথিবী এবং তাঁর স্বীয় আকৃতি-বিশিষ্ট জীব মানুষের কথা ভুলেই গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও Hardyর জাতিগত পার্থক্যই তাঁদের এই পার্থক্যের কারণ। পারিপার্শ্বিকও খানিকটা এর মধ্যে রয়েছে।

পারিপার্শ্বিকের পার্থক্যটা রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের পার্থক্যে পরিস্ফুট। অন্য কথা বাদ দিয়ে শুধু দুজনের মানসিক গঠনের কথাই ধরা যাক। রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ছেলে, এক ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত। বিদ্বান, বিনয়ী। তার সুর, আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলারতলে। নজরুল একজন সৈনিক, হাবিলদার, বিদ্রোহী, তার সুর, বল বীর চির উন্নত মম শির। তিনি বিধির বিধান ভাঙতে উৎসাহী। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বিধির বিধান ভাঙবে তোমরা এমনি শক্তিমান বলে বিদেশী অত্যাচারী শাসককে এক অমোঘ শক্তির দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে দেখাচ্ছেন।

যুগ বা কালের পার্থক্য দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ ও মধুসূদনে। ইংরেজ মিশনারী এসে যখন এদেশের হিন্দুর আদর্শকে খর্ব্ব করে দেখিয়েছিল মধুসূদন সেদিনের মানুষ। তিনি ধর্ম্মত্যাগ করে খৃষ্টান তো হলেনই, হিন্দু আদর্শ ও ভুলে গেলেন। তিনি লিখলেন, I hate Rama and his rabble. The idea of Ravana elevates my character......Ravana was a grand fellow. খৃষ্টীয় আক্রমণ প্রতিরুদ্ধ হল রামমোহন প্রভৃতির চেষ্টায়। হিন্দু আদর্শ রুখে দাঁড়াল ব্রাহ্ম সমাজ গঠন করে। বেদান্ত চর্চ্চা সুরু হল বাইবেলের বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথ সেই ব্রাহ্ম সমাজের ছেলে। তিনি সংস্কৃত হিন্দু, অবতার মানেন না। কিন্তু তবুও রাম-চরিত্রে ধিকৃতি দেবার মত নির্বুদ্ধিতা বা দুর্বুদ্ধি তাঁর নাই। ভাষা ও ছন্দে রাম-চরিত্রের যে স্তুতি তিনি করেছেন বাল্মিকী বা তুলসীদাসের পরে তাহা আর কারও পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাঁর বাল্মিকী নারদকে বলছেন,

“ভগবন্‌, ত্রিভুবন তোমাদের প্রত্যক্ষে বিরাজে,
কহ মোরে নাম কার অমর বীণার ছন্দে বাজে।
কহ মোরে বীর্য্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্ম্মের নিয়ম

ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মত,
মহৈশ্বর্য্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে, সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম,
কহ মোরে সর্বদর্শী হে রাজর্ষি তাঁর পুণ্য নাম।”
নারদ কহিলা ধীরে, “অযোধ্যার রঘুপতি রাম।”

অর্ধশতাব্দীর ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথ ও মধুসূদনে এই পার্থক্য। পঞ্চাশ বৎসর পরে জন্মালে মেঘনাদ বধ না লিখে মধুসূদন কোন রকমের রামস্তুতিই লিখতেন। তাঁর নিজের নামটাও মাইকেল হ'তনা যা মুছতে এবং ভুলতে আমাদের অর্ধশতাব্দী লেগেছে।

জিনিয়াস্ ও যুগ্মসত্তা

আমি M. Taine নির্দ্দিষ্ট তিনটি প্রভাবের কথা বললাম। M. Taine কিন্তু এদের প্রভাব বলেন নি। তিনি বলেছেন factor বা উপাদান। অর্থাৎ এই তিনেরই যুক্তফল প্রতিভা। ইহাতে কেহ কেহ সমালোচনা করেছেন, Shakespeare-এর জন্মমুহূর্ত্তে ইংলণ্ডে আরও অনেক ছেলে জন্মেছিল কিন্তু Shakespeare তো আর একটাও হয় নি? সুতরাং প্রতিভার মধ্যে ব্যক্তির দিকটার ব্যাখ্যা হয় না। প্রতিভাবান ব্যক্তির ওপরে ঐ তিনটি উপাদানের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ওরাই তার প্রতিভার সমস্ত উপাদান তা নয়।

তবে এভাবে দেখলে M. Taine এর মতটা যত খেলো মনে হয় আসলে সেটা ততটা খেলো নয়। Biological Science-এ inherited ও acquired characteristics-এর সম্পর্ক যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে এই যে acquired characteristics-গুলো অর্থাৎ অর্জিত গুণাবলী বীজে সঞ্চারিত হতে দীর্ঘ সময় লাগে কিন্তু কালে তাও হয়। অর্জিতগুণ তখন জাতীয় বৈশিষ্ট্যে পর্য্যবসিত হয়। আর বীজের মধ্যেই যে গুণাবলী নিহিত থাকে প্রাকৃতিক নিয়মে জন্মের পর হতেই তাদের বিকাশ হতে আরম্ভ করে। বীজে বীজে তাই এত পার্থক্য, একটায় বট গাছ হয়, আর একটায় সর্ষে। পারিপার্শ্বিক নতুন গুণের জন্ম দেয়, —কাল সেই নতুন গুণকে বীজে সঞ্চারিত করে, এইভাবে পরিবেশের ফল বীজে

প্রবেশ করে। সুতরাং বীজটা সবই বীজ নয়, জাতিটাও শুধুমাত্র জাতি নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে জাতি, পরিবেশ ও যুগ প্রতিভার সম্পূর্ণ উপাদান হতে পারে।

জাতি ও বংশগত গুণে আমরা যত বিশ্বাস করি তত বিশ্বাস আর কিছুতে করিনা। আমাদের জাতিভেদ ও কৌলীন্য এই বিশ্বাস থেকেই এসেছে। পাশ্চাত্যেও জন্মলাভ করেছে science of Eugenics. অসংশয়ে বিজ্ঞ হিতোপদেশকারও সিংহী মাতার মুখ দিয়ে পালিত শৃগাল শাবককে বলিয়েছেন,

বীরোঽসি বীর পুত্রোঽসি দর্শনিয়োঽসি পুত্রকঃ ?

যস্মিন্ কুলে তমুৎপন্নে গজস্তত্র ন হন্যতে।

কালিদাসের কথাও মনে পড়ে—ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধা তলাৎ।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর কুলে জন্ম সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লিখিত একখানি চিঠিতে তার প্রমাণ আছে।

এই যে বংশের বীজ ইংরেজীতে একেই বলে Race ghost. একে National geniusও বলে। তবে এই genius-এর অবস্থান সম্বন্ধে নানারূপ মত আছে। প্রাকবিজ্ঞান যুগের লোকেরা একে মনে করতেন একটা অশরীরী আত্মার মত। ব্যক্তির বাহিরে তার অবস্থান। তবে বাহিরে থাকিয়াও ভেতরকে সে প্রভাবিত করে, তার পরিণতি ঘটায়।

শুধু National genius নয়, family genius এবং Individual genius-এরও ধারণা আসে। এই individual genius ই Double বা দ্বৈত বা যুগ্ম আত্মার ধারণার সৃষ্টি করে। Guardian Angel-এর ধারণা এই genius-এর খ্রীষ্টিয় সংস্করণ।

দ্বৈত বা যুগ্ম আত্মার ধারণাটা এই যে আমার মত একটি অশরীরী আত্মা আছে অন্তরীক্ষে। সে আমার কাজকর্ম্ম পরিচালিত করছে সেখান থেকে। আমি তাকে দেখতে পাইনা। তবে মরবার আগে নাকি তাকে দেখা যায়। তাকে দেখলেই অবশ্য মৃত্যু হবে। Seeing double তাই মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ।

Popular superstition টুকু বাদ দিলে এই ধারণার মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত আছে inherited ও acquired characteristics-এর মধ্যে Biologial science তাকে আবিষ্কার করেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইহার মধ্যে আত্মিক বা spiritual জগতের সত্য একটা আছে মেনে নিয়েছেন। না, শুধু মেনে নেন নাই, তিনি তা অনুভব করেছেন। দ্বৈত অস্তিত্ব ভূলোকে এবং

অন্য লোকে তাঁর অনুভূতিতে সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে। তাঁর আত্মার যুগ্মসত্তাকে তিনি উপলব্ধি করেছেন। আর সেই সত্তার নাম দিয়েছেন জীবন দেবতা। চিত্রার সূচনায় তিনি লিখেছেন,—

ভক্ত যখন বলেন, ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি, তখন হৃষীকেশের থেকে ভক্ত নিজেকে পৃথক করে দেখেন সুতরাং তার নিজের জীবনের সমস্ত দায়িত্ব গিয়ে পড়ে একা হৃষীকেশের পরেই। চিত্রা কাব্যে আমি একদিন বলেছিলুম আমার অন্তর্যামী আমাকে দিয়ে যা বলাতে চান আমি তাই বলি, কথাটা এই রকম শুনতে হয়। কিন্তু চিত্রায় আমার যে উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে সেটি অন্য শ্রেণীর। আমার একটি যুগ্মসত্তা আমি অনুভব করেছিলুম যেন যুগ্ম নক্ষত্রের মতো, সে আমারই ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত, তার (ই) আকর্ষণ প্রবল। তারই সংকল্প পূর্ণ হচ্ছে আমার মধ্য দিয়ে, আমার সুখে দুঃখে আমার ভালোয় মন্দয়। এই সংকল্প সাধনায় এক আমি যন্ত্র এবং দ্বিতীয় আমি যন্ত্রী হতে পারে কিন্তু সংগীত যা উদ্ভূত হচ্ছে, যন্ত্রের স্বকীয় বিশিষ্টতা তার একটি প্রধান অঙ্গ, পদে পদে তার সঙ্গে রফা করে তবেই দুয়ের যোগে সৃষ্টি। এ যেন অর্ধনারীশ্বরের মতো ভাবখানা। সেইজন্যেই বলা হয়েছে—

জ্বেলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার
করিবারে পূজা কোন দেবতার
রহস্য ঘেরা অসীম আঁধার
মহামন্দির তলে।

পরম দেবতার পূজা যুগ্ম সত্তায় মিলে, এক সত্তার ভিতর থেকে আদর্শের প্রেরণা, আর এক সত্তার বাহিরে কর্ম্মযোগে তার প্রকাশ। সংসারে এই দুই সত্তার বিরোধ সর্ব্বদাই ঘটে, নিজের অন্তরে পূর্ণতার যে অনুশাসন মানুষ গূঢ়ভাবে বহন করছে তার সম্পূর্ণ প্রতিবাদে জীবন ব্যর্থ হয়েছে এ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। নিজের মধ্যে নিজের সামঞ্জস্য ঘটাতে পারেনি, এই ভ্রষ্টতা মানুষের পক্ষে সব চেয়ে শোচনীয়। আপনার দুই সত্তার সামঞ্জস্য ঘটেছে কিনা এই আশঙ্কাসূচক প্রশ্ন চিত্রার কবিতায় অনেকবার প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুতঃ চিত্রায় জীবনরঙ্গভূমিতে যে মিলন নাট্যের উল্লেখ হয়েছে তার কোন নায়ক নায়িকা জীবের সত্তার বাইরে নেই এবং তার মধ্যে কেউ ভগবানের স্থলাভিষিক্ত নয়।

মানুষের আত্মিক সৃষ্টি কেন, প্রাকৃতিক সৃষ্টিতেও আদিকাল থেকে মূল আদর্শের সঙ্গে বাহ্য প্রকাশের সাংঘাতিক দ্বন্দ্ব দেখতে পাওয়া গেছে। আঙ্গারিক যুগের

শ্রীহীন গাছগুলো কেন টিকতে পারলো না। আজ পরবর্তী গাছগুলিতে সমস্ত পৃথিবীকে দিয়েছে শোভা। কোন্ শিল্পী রচনার সূত্রপাতে প্রথম ব্যর্থ হয়েছিল, মাথা নেড়েছিল, হাতের কাজ নিষ্ঠুরভাবে মুছতে মুছতে সংস্কার সাধন করেছে এ কথা যখন ভাবি তখন সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে দুই সত্তার মিলন চেষ্টা স্পষ্ট দেখতে পাই। সেই চেষ্টা কি নিষ্ঠুরভাবে নিজেকে জয়যুক্ত করতে চায়, মানুষের ইতিহাসে বারংবার তার প্রমাণ পাওয়া যায়, আজ তার আত্মঘাতী প্রমাণ যেমন প্রকট হয়েছে এমন আর কখনও হয়নি।"

যে শিল্পীর কথা রবীন্দ্রনাথ এখানে বলেছেন তিনি অবশ্য আমাদের হৃষীকেশ ছাড়া আর কেহ নন। আগামী কুরুক্ষেত্রের আয়োজনের মধ্যেও কবি তাঁরই হস্ত দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু আবার শুনুন—"চিত্রার প্রথম কবিতায় তার একটি সূচনায় বলা হয়েছে—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

তারপর আছে—

অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী—
তুমি অন্তরবাসিনী।

আজ ব্যাখ্যা করে যে কথা বলবার চেষ্টা করছি সেই কথাটাই এই কবিতার মধ্যে ফুটতে চেয়েছিল। বাইরে যার প্রকাশ বাস্তবে সে বহু, অন্তরে যার প্রকাশ সে একা। এই দুই ধারার প্রবাহেই কাব্য সম্পূর্ণ হয়। "এবার ফিরাও মোরে" কবিতায় কর্ম্মজীবনের সেই বিচিত্রের ডাক পড়েছে। "আবেদন" কবিতায় ঠিক তার উল্টো কথা। কবি বলেছে যে "কর্ম্মক্ষেত্রে যেখানে কার্যক্ষেত্রের জনতায় কর্মীরা কর্ম করছে, সেখানে আমার স্থান নয়। আমার স্থান সৌন্দর্যের সাধকরূপে একা তোমার কাছে।" জীবনের দুই ভিন্ন মহলে কবির এই ভিন্ন ভিন্ন কথা। জগতে বিচিত্ররূপিণী আর অন্তরে একাকিনী কবির কাছে এ দুই-ই সত্য, আকাশ এবং ভূতলকে নিয়ে ধরণী যেমন সত্য। "ব্রাহ্মণ", "পুরাতন ভৃত্য" "দুই বিঘা জমি" এইগুলির কাব্যকাকলি নীড়ের, বাসার ; "স্বর্গ হইতে বিদায়" এখানে সুর নেবেছে ঊর্ধ্ব লোক থেকে মর্ত্যের পথে ; "প্রেমের অভিষেক"-এর প্রথম যে পাঠ লিখেছিলুম, তাতে কেরাণী জীবনের বাস্তবতার ধূলিমাখা ছবি ছিল অকুণ্ঠিত কলমে আঁকা, পালিত অত্যন্ত ধিক্কার দেওয়াতে সেটা তুলে দিয়েছিলুম, "যেতে নাহি দিব" কবিতায় বাঙালি ঘরের

BIRCHANDRA PUBLIC LIBRARY 37760

ঘরকন্নার যে আভাস আছে তার প্রতিও লোকেন কটাক্ষ বর্ষণ করেছিল। ভাগ্যে তাতে বিচলিত হইনি, হয়তো দু-চারটে লাইন বাদ পড়েছে। লোক জীবনের ব্যবহারিক বাণীকে উপেক্ষা করে আমার কাব্যে আমি কেবল আনন্দ, মঙ্গল এবং ঔপনিষদিক মোহ বিস্তার করে তার বাস্তব সংসর্গের মূল্য লাঘব করেছি এমন অপবাদ কেউ কেউ আমাকে দিয়েছেন। আমার কাব্য সমগ্রভাবে আলোচনা করে দেখলে হয়তো তারা দেখবেন আমার প্রতি অবিচার করেছেন। আমার বিশ্বাস শেষ পর্য্যন্ত আমি এই বাণীর পন্থাতেই আমার পদ্য ও গদ্য রচনাকে চালনা করেছি—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

জীবনদেবতা

জাতির চরিত্র আলোচনা করতে করতে আমরা পিচ্ছিল ভূমিতে এসে পড়েছি। রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতা একটা বিরাট controversial ব্যাপার। Thompson সাহেব তাকে Genius বলেছেন।* তিনি সাহেব এতে তার পক্ষে কোন অসুবিধা ছিল না, বরং তার পক্ষে ওটাই স্বাভাবিক হয়েছে। Bacon-এর ভাষায় ওটা একজন ইংরেজের Idol of the Market বা প্রচলিত সংস্কার। আমরা ভারতীয়েরা ওটা বুঝেই উঠতে পারিনে। জীবন দেবতা বুঝতে তাই আমাদের কষ্ট। বরং যে হৃদিস্থিত হৃষীকেশের ধারণা রবীন্দ্রনাথ অগ্রাহ্য করলেন, আমরা সেটাই সহজে গ্রহণ করতে পারি। তবে কাব্যে পাঠক কোনটা গ্রহণ করতে পারবেন বড় কথা নয়, কবি কি দিতে চাইলেন সেইটাই বড়। চিত্রার উপরি উক্ত সূচনায় দেখলাম রবীন্দ্রনাথ দিতে চেয়েছেন সেই বিলিতি Geniusই। তিনি অবশ্য Genius কথাটা ব্যবহার করেন নাই, তাছাড়া Genius-এর সঙ্গে তিনি Evolutionary philosophy-রও কিছুটা জুড়ে দিয়েছেন। এক মতে Evolution বলে যে ভগবান বা স্রষ্টা সর্ব্বজ্ঞ নন। তিনি করে করে শিখছেন। সমগ্র Evolutionএর ইতিহাসই তাই। একটা সৃষ্টি হল, তৎকালে উহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। ধীরে ধীরে তার দোষ ত্রুটি বার হল। স্রষ্টা সেই পুরানো সৃষ্টি ভেঙে

* সোনার তরীর মাঝির সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—It is jeevan Devata entering his work; the genius of his life and effort crossing the world stream in his Golden Boat—E. J. Thompson.

ফেলে আবার উন্নততর সৃষ্টি করলেন। কিন্তু ওটাই আবার শেষ নয়। যখন ওরও দোষ ত্রুটি ধরা পড়বে তখন উনি ওটাকেও অগ্রাহ্য করবেন। আবার চলবে নূতন সৃজন। রবীন্দ্রনাথও দ্বৈত সত্তা বা জীবন দেবতাকে উদ্দেশ্য করে তাই বলেছেন,—

এখন কি শেষ হয়েছে প্রাণেশ, যা কিছু আছিল মোর—
যত শোভা যত গান যত প্রাণ, জাগরণ ঘুম ঘোর,
শিথিল হয়েছে বাহু বন্ধন, মদিরাবিহীন মম চুম্বন—
জীবনকুঞ্জে অভিসার নিশা আজি কি হয়েছে ভোর।
ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা,
নূতন করিয়া লহ আরবার চির পুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায় নবীন জীবন ডোরে॥

সেই চিরপরিচিত এক এবং বহুর দ্বন্দ্ব। রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরই একজন যাঁরা

তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।

কিন্তু তথাপি সেই এককে তিনি বাসুদেব বলতে পারলেন না কেন? "বাসুদেবঃ সর্বমিতি" জ্ঞান তাঁর হল না কেন? কে বললো হয়নি? রবীন্দ্রনাথ নিজে,—ওই তো উপরের উল্লিখিত চিত্রার সূচনাতে।

চিত্রার সূচনা নিয়ে তাই অনেক বাদানুবাদ হয়েছে। এমন কি রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর কাব্যের এবংবিধ ব্যাখ্যা করতে লেগে ছিলেন তখন সজনীবাবু কবির হাত থেকে কাব্য রক্ষার পবিত্র সংগ্রাম সুরু করতে বাধ্য হয়েছিলেন। খুব যে অন্যায় করেছিলেন তাও নয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির সূচনাই তার প্রমাণ। তিনি নিজেই বলেছেন যে জীবনস্মৃতি আর জীবনী এক নহে। এখানে ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য, ঘটনার আপেক্ষিক গুরুত্ব কিছুই রক্ষিত হয় নাই। ওটা আর একটা শিল্পসৃষ্টি জীবনের মালমশলা দিয়ে তৈরী, কিন্তু আলাদা জিনিষ, জীবন নয়। রবীন্দ্রনাথের একটা গল্প ধরে নিতে পারেন। তার সত্য মিথ্যা তাঁর জীবনের সত্য মিথ্যার সঙ্গে এক নয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার উল্লিখিত ব্যাখ্যাও সেই রকম। বড় জোর ওটা আর একটা সমালোচনা সাহিত্য, ওর নিজস্ব সাহিত্যিক মূল্য আছে বটে, কিন্তু জীবনদেবতা সম্বন্ধে যে ওটাই একমাত্র সত্য বা একেবারেই ভ্রান্ত কথা নয়, তা বলা চলে না। তবে

রবীন্দ্রনাথের বেলায় এ রকম ভ্রান্তি আরোপ করা স্পর্ধার কথা সন্দেহ নাই। শনিবারের চিঠি লাঠি ঘুরিয়ে যা বলেছেন অন্য কারও পক্ষে তা বলা সম্ভব নয়। তবে শনিবারের চিঠির অনুসরণ না করে রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেই তাঁর এই বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহসী হয়েছি। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের অগ্রনায়কগণ যখন প্রগতি ভুলে রক্ষণশীল হয়ে দাঁড়ালেন তখন রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলে বঙ্কিমের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন সেই কথা কটি স্মরণ করে আমরাও রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা কোরবো।—

ভয় নাই যার কি করিবে তার এই প্রতিকূল স্রোতে,
তোমারি শিক্ষা করিবে রক্ষা তোমারি বাক্য হতে॥

এই বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যার একটা ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ ঐ সূচনার মধ্যেই রেখে গেছেন। বয়স হয়েছিল তাঁর। সত্তর বৎসরের জয়ন্তীর পরে শ্রদ্ধা ও সম্মান পাচ্ছিলেন প্রচুর। মনটা তাইতেই একটু নরম হয়েছিল। এমনিতেই তিনি শান্তিপ্রিয়। তাই যখন লোকে খুব বিরূপ সমালোচনা করতে লাগল—তিনি লোকজীবনের ব্যবহারিক বাণীকে উপেক্ষা করে তাঁর কাব্যে কেবল আনন্দ মঙ্গল এবং ঔপনিষদিক মোহ বিস্তার করে তার বাস্তব সংসর্গের মূল্য লাঘব করেছেন তখন তিনি যেন খানিকটা পপুলার কন্‌সেসন হিসাবেই জীবনদেবতার এই ব্যাখ্যা দিয়ে সেই সমালোচনার অভিযোগ খণ্ডন করলেন। আর এমন দুর্বলতা যে তাঁর এসেছিল লোকেন পালিতের সমালোচনা আংশিক মেনে নেওয়ায় তার প্রমাণ রয়েছে। তাইতো পালিতকে তিনি ভয়ে ভয়ে লিখেছিলেন, আগে থেকে দোষ স্বীকার করছি তাতে যদি তোমার মনস্তুষ্টি হয়।

পাঠক চিঠিটা দেখবেন, কবি দোষ স্বীকার করলেন বটে কিন্তু দোষ তাঁর ছিল না। নইলে প্রাচ্যের সমগ্র অধ্যাত্মানুভূতিতে যার সমর্থন নাই এমন অযৌক্তিক একটা বিলিতি Superstition-কে তিনি আপন অনুভূতির রাজ্যে স্থান দিতেন না। সকলকে যারা খুশী করতে চান তারা এমন বিপদে বরাবরই পড়েন। রবীন্দ্রনাথও বাদ যান নি। এই লেখাটা এত দুর্বল যে রবীন্দ্রনাথের বলেই মনে হয় না। অমন ক্ষুরধার বুদ্ধি যার তিনি কিনা এমন দুর্বল যুক্তির ব্যবহার করলেন? প্রথম লাইনটাই কী বিভ্রান্তিকর! ভক্ত যখন বলেন ত্বয়া হৃষীকেশ ··তখন হৃষিকেশের থেকে ভক্ত নিজেকে পৃথক করে দেখেন। তবে হৃদিস্থিতেন কথাটার মানে কি? হৃষীকেশ কিভাবে হৃদিস্থিত হয়ে কর্ম করান গীতায় তো তা লুকোনো হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের তা অজানা

নয়। আর এ কথাটা ভক্তের কথাও নয়। দুষ্টের কথা, যে পদে পদে ঈশ্বরের অনুশাসন অমান্য করেছে তারই কথা। তবে সে শেয়ানা—নিজের অপকর্ম বুঝতে পেরেছে। তখন সান্ত্বনা দিচ্ছে নিজেকে এই বলে যে তিনি আমাকে যে ভূমিকায় অভিনয় করতে দিয়েছিলেন আমি তাই করছি। হৃদিস্থিত হৃষীকেশকে যে জানে সে তার কল্যাণমার্গ বিচ্যুত হয় না। সে রবীন্দ্রনাথের মতই বারে বারে জিজ্ঞেস করে, আমি তোমার ইচ্ছে মত চলছি তো? তুমি খুশী হচ্ছ আমার কর্মে?·· "ওহে অন্তরতম, মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ—

অসি অন্তরে মম।

জীবনদেবতা যদি হৃষিকেশ না হন, জনগণমনঅধিনায়ক ভারত ভাগ্য বিধাতাও তবে বিশ্বনাথ নন। তবে কে তিনি? সৌভাগ্যের বিষয় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সেই বিশ্ববিধাতা বলেই প্রচার করেছেন। নইলে জীবনদেবতা, ভারত ভাগ্যদেবতা আর বিশ্বদেবতা—তিন বিভিন্ন দেবতা এর মধ্যেই এসে যান। একেশ্বরবাদীর একী দুর্ভোগ!

তবে দুই সত্তার কথা নোতুন নয়। শ্রীরামকৃষ্ণও "কাঁচা আমি" "পাকা আমির" কথা বলেছেন। আত্মা পরমাত্মা না হয় ঔপনিষদিক। তবে এই "পাকা আমি" আর একটা আমি না যিনি অন্য স্তরে থেকে আমার কাজ কর্ম করাচ্ছেন আমাকে দিয়ে। সেই পাকা আমিই সোহহম্-এর সঃ।

কাঁচা আমি—অহম্ কার? না তাঁর। তিনি সকলের হৃদিস্থিত পুরুষ। এই পুরুষ ব্যতীত মানব অন্তরে আর দ্বিতীয় সত্তা নেই।

মনের বিভাজনও অবোধগম্য নয়। রূপকচ্ছলে এই সব ভাগগুলোতে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আরোপ করাও নোতুন নয়। ইংরেজীতে conscienceকে উপলক্ষ্য করে অনেক অনেক কথা বলার রীতি ছিল। মনকে উদ্দেশ করেও আমাদের দেশে লেখার অভাব নাই। কিন্তু সেই মন conscience বা বিবেক আমার আর একটা সত্তা একথা কেউ বলেন নাই। যেমন রামপ্রসাদের

"মন রে কৃষি কাজ জান না—
এমন মানব জমিন রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলতো সোনা।"

প্রাচীনকালের সাহিত্যে এই গুণটি বিশেষ পরিস্ফুট। কবি নিজেই বলেছেন, তখন উষাকে আকাশকে চন্দ্র সূর্যকে আমরা আমাদের স্বতন্ত্র শ্রেণীর বলে মনে করতে পারতুম না। এমন কি যে সকল প্রবৃত্তির দ্বারা আমরা চালিত হতুম,

যারা মনুষ্যত্বের এক একটি অংশ মাত্র, তাদের প্রতিও আমরা পূর্ণ মনুষ্যত্ব আরোপ করতুম। এখন আমরা মনুষ্যত্বের আরোপ করাকে রূপক অলংকার বলে থাকি—

র-র—৮—৪৮২

তবে অস্পষ্টকে স্পষ্ট করা, অরূপকে রূপ দেওয়া অসীমকে সীমার বাঁধনে ধরাই তো আর্ট-এর কাজ। সর্বদেশে সর্বকালেই কবিরা তাই একাজ করেছেন এবং করছেন। ইহার প্রথম পর্য্যায়ে তারা নৈর্ব্যক্তিক গুণ বা বস্তুতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করেন যার নাম Personification এবং পরে সেই ব্যক্তি বা Person সম্বন্ধে কাহিনী বানান,যার নাম mythmaking। এই জন্যই প্রাচীন দেবদেবীর কল্পনা ও কাহিনী রচনা হয়েছিল। কবিরা এইরকম mythmaker। উপমার ছলে তারা নিত্য নূতন myth রচনা করছেন। অবশ্য বর্তমানকালে পৌরাণিক কায়দায় সুদীর্ঘ mythology কেউ তৈরী করেন না। তবে সেদিনও ইংরেজ কবি শেলি নোতুন নতুন myth তৈরী করতে চেষ্টা করে গেছেন। মেঘের সম্বন্ধে তার Cloud-এ, নদীর সম্বন্ধে তার Arethusa কবিতায়। Symbolic কাব্য নাটক ইত্যাদিও ঐ mythmaking ছাড়া অন্য কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথ তো ঐ Symbolic কাব্য ও নাটকের Past master সুতরাং তিনি একটা নোতুন myth তৈরী করবেন জীবনদেবতা নাম দিয়ে—তা আর এমন আশ্চর্য্য কি? তবে গোল বাধে যখন এই কবি কল্পনার বেশি বাস্তবতা তাতে আরোপ করা হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজের এই গুণটি সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন। লোকেন পালিতকে লিখিত পত্রে তাই তিনি লিখেছেন—"উপমার জ্বালায় তুমি বোধ হয় অস্থির হয়ে উঠেছ। কিন্তু আমার এ প্রাচীন রোগটিও তোমার জানা আছে। মনের কোনো একটা ভাব ব্যক্ত করার ব্যাকুলতা জন্মালে আমার মন সেগুলোকে উপমার প্রতিমাকারে সাজিয়ে পাঠায়—অনেকটা বকাবকি বাঁচিয়ে দেয়। অক্ষরের পরিবর্তে হায়ারোগ্লিফিক্ ব্যবহারের মত। কিন্তু এ রকম প্রণালী অত্যন্ত বহুকেলে। (র, র ৮—সাহিত্য পৃঃ ৪৮০)। পাঠক লক্ষ্য করবেন কবির অনুরাগ ঐ বহুকেলে জিনিষটির প্রতিই। তিনি ব্যজস্তুতি করছেন মাত্র।

"সাহিত্যের বিচারক" (১৩১০) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লেখকের ব্যক্তিত্বের বা দ্বৈতসত্তার বিশ্লেষণ দিয়েছেন।—

"জগতের সহিত মনের যে সম্বন্ধ, মনের সহিত সাহিত্যকারের প্রতিভার সেই সম্বন্ধ। এই প্রতিভাকে বিশ্বমানবমন নাম দিলে ক্ষতি নাই। জগৎ হইতে

মন আপনার জিনিষ সংগ্রহ করিতেছে, সেই মন হইতে বিশ্বমানবমন পুনশ্চ নিজের জিনিষ নির্বাচন করিয়া নিজের জন্য গড়িয়া লইতেছে।

বুঝিতেছি কথা বেশ ঝাপশা হইয়া আসিতেছে। আর একটু পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব। কৃতকার্য্য হইব কি না জানিনা।

আমরা আমাদের অন্তরের মধ্যে দুইটা অংশের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি। একটা অংশ আমার নিজত্ব, আর একটা অংশ আমার মানবত্ব। আমার ঘরটা যদি সচেতন হইত, তবে সে নিজের ভিতরকার খণ্ডাকাশ ও তাহারই সহিত পরিব্যাপ্ত মহাকাশ, এই দুটাকে ধ্যানের দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারিত। আমাদের ভিতরকার নিজত্ব ও মানবত্ব সেই প্রকার।" (সাহিত্য-র,র ৮—৩৫২ পৃঃ) স্পষ্টতঃই রবীন্দ্রনাথ এ্যারিষ্টটলের individual ও universal-এর কথা বলছেন। কিন্তু তিনি প্রশ্নটা poetics ছাড়িয়ে philosophy-তে নিয়ে গেছেন। কথাগুলো লক্ষ্য করুন।—

খণ্ডাকাশ ও মহাকাশ—নিজত্ব ও মানবত্ব। আত্মা ও ঈশ্বর বা পরমাত্মা এ ছাড়া আর কি? বৈদান্তিক উপমাটাই বৈদান্তিক ভাববস্তুর প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা সেই লীলাময় পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কেহ নন। তবে তিনি যে তাহার নাম করিলেন না, বরং নাম গোপন করিবার চেষ্টা করিলেন তাহারও অর্থ পরিস্ফুট। অনধিকারীর হস্ত থেকে বস্তু রক্ষাই কবির উদ্দেশ্য। যেমন স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলে প্রচার করবার সময় বলেছিলেন; আমি তাঁকে betray করেছি, Judas Iscariot-এর মতই আমি অপরাধী। এই betrayal অনধিকারীর কাছে প্রচার ছাড়া আর কিছু নয়। Judas যেমন রোমান সৈনিকদের দেখিয়ে দিলেন, এই যীশু। স্বামীজীও যেন অবিশ্বাসী-দের দেখিয়ে দিলেন, ইনিই ঈশ্বরাবতার। একদিক দিয়ে বিবেচনা করলে দুটোই গর্হিত কাজ। রবীন্দ্রনাথ এই গর্হিত কাজ করবার জন্যেই অনধিকারী সমালোচককে বললেন, কই জীবনদেবতা দেবতা বা ঈশ্বর নয়, ও আমার ভেতরেরই আর একটা অংশ—আমি মাত্র। কথাটা সত্য এবং সত্যগুপ্তি দুই-ই। এরপর পাঠক তার নিজ সঙ্গতিমত অর্থ গ্রহণ করবেন। কেউ বা বলবেন এই তো কবি তো নিজেই বললেন জীবনদেবতা ভগবান নন্—ওটা তারই ব্যক্তিত্বের একটা অংশ আর একটা দিক্। আবার গভীর মর্মগ্রাহী পাঠক বলবেন সেই আর একটা দিক কি রকম? কিসের দিক সেটা? কবির মনের যে দিকটা আমরা চিনি তার সঙ্গে এই নোতুন দিকটার কি সম্পর্ক? আর প্রশ্ন

এলেই সমাধান আসবে। সমাধান কবির লেখার মধ্যে ছড়ানো রয়েছে। আমরা যতদিন বিপরীত মুখে তাকে পড়বো ততদিন বিশ্বজোড়া সে লিপির অর্থ আমাদের হৃদয়ঙ্গম হবে না তো, মুখ ফিরিয়ে দেখলেই দেখতে পাব ঘটাকাশ ও মহাকাশ—আত্মা ও পরমাত্মা · এরাই রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর জীবনদেবতা। মানুষের ধর্মে কবি এ বিষয়টা আরও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ভূমিকাতে কবি একে গীতার ভাষায় 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ' বলেছেন। "আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে "সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট ঃ"। তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব। মহাত্মারা সহজে তাঁকে অনুভব করেন সকল মানুষের মধ্যে, তাঁর প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন। সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীব সীমা অতিক্রম করে মানব সীমায় উত্তীর্ণ হয়। সেই মানবকেই মানুষ নানা নামে পূজা করছে, তাঁকেই বলেছে 'এষো দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা'। সকল মানবের ঐক্যের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে তাঁকে পাবে আশা করে তাঁর উদ্দেশে প্রার্থনা জানিয়েছে,

স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।"

সমস্ত প্রবন্ধটাতে তিনি সোঽহম্ তত্ত্ব প্রতিপাদন করেছেন। কিন্তু তবুও সেই সঃ-কে তিনি বলেছেন 'মানব'—বিশ্বমানব। রামকৃষ্ণ দেবের 'বড় আমি'। ইহার জন্য তিনি নিজের ছোট আমি বা জীবভাবকে একরকম অস্বীকারই করেছেন। যীশুখৃষ্ট এইজন্য নিজেকে মানবপুত্র ও ঈশ্বরপুত্র এই দুই নামেই প্রচার করতেন। এখানে মানবই ঈশ্বর, অর্থাৎ মানুষের বিশ্বমানবতা তার অন্তরের দেবত্ব।

"মানুষ আছে তার দুইভাগকে নিয়ে, একটা তার জীবভাব, আর একটা বিশ্বভাব। জীব আছে আপন উপস্থিতকে আঁকড়ে, জীব চলেছে আশু প্রয়োজনের কেন্দ্র প্রদক্ষিণ করে। মানুষের মধ্যে সেই জীবকে পেরিয়ে গেছে যে সত্তা সে আছে আদর্শকে নিয়ে। এই আদর্শ অন্নের মতো নয়, বস্ত্রের মতো নয়। এ আদর্শ একটা আন্তরিক আহ্বান, এ একটা নিগূঢ় নির্দেশ। যেদিকে সে বিচ্ছিন্ন নয়, যে দিকে তার পূর্ণতা, যেদিকে ব্যক্তিগত সীমাকে সে ছাড়িয়ে চলেছে, যেদিকে বিশ্বমানব। ঋগ্বেদে সেই বিশ্বমানবের কথা বলেছেন—

পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি—তাঁর এক চতুর্থাংশ আছে

জীবজগতে, তাঁর বাকী বৃহৎ অংশ উর্ধ্বে অমৃতরূপে।"—ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে এই বর্ণনাটি আছে। উপমাস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ মানবদেহ ও তার জীবকোষগুলির সম্বন্ধ দেখিয়েছেন "মানবদেহে বহুকোটি জীবকোষ। তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জন্ম স্বতন্ত্র মরণ। …একদিকে এই জীবকোষগুলি আপন আপন পৃথক জীবনে জীবিত, আর একদিকে তাদের মধ্যে একটি গভীর নির্দেশ আছে, একটি ঐক্য তত্ত্ব আছে, সেটি অগোচর পদার্থ; সেই প্রেরণা সমগ্র দেহের দিকে, সেই ঐক্য সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত। মনে করা যেতে পারে, সেই সমগ্র দেহের উপলব্ধি অসংখ্য জীবকোষের অগম্য, অথচ সেই দেহের পরম রহস্যময় আহ্বান তাদের প্রত্যেকের কাছে দাবি করছে তাদের আত্মনিবেদন। যেখানে তারা প্রত্যেকে নিজেরই স্বতন্ত্র জীবন সীমায় বর্তমান সেখানে তার মধ্যে রহস্য কিছুই নেই—কিন্তু যেখানে তারা নিজের জীবন সীমাকে অতিক্রম করে সমস্ত দেহের জীবনে সত্য সেখানে তারা আশ্চর্য্য। সেখানে তারা আপন জন্মমৃত্যুর মধ্যে বদ্ধ নয়। সেইখানেই তাদের সার্থকতা।"

সমস্ত দেহের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ইহাদের কী চেষ্টা। "এই চেষ্টার রহস্য অনুসরণ করলেই বোঝা যেতে পারে, এই ক্ষুদ্র দেহগুলির চরম লক্ষ্য অর্থাৎ পরম ধর্ম এমন কিছুকে আশ্রয় করে যাকে বলব তাদের বিশ্বদেহ।

মানুষ ও আপন অন্তরের গভীরতর চেষ্টার প্রতি লক্ষ্য করে অনুভব করছে যে সে শুধু ব্যক্তিগত মানুষ নয়, সে বিশ্বগত মানুষের একাত্ম। সেই বিরাট মানব 'অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিবচ স্থিতম্।' সেই বিশ্বমানবের প্রেরণায় ব্যক্তিগত মানুষ এমন সকল কাজে প্রবৃত্ত হয় যা তার ভৌতিক সীমা অতিক্রমণের মূল। যাকে সে বলে ভালো, বলে সুন্দর, বলে শ্রেষ্ঠ; কেবল সমাজ রক্ষার দিক থেকে নয়; আপন আত্মার পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তির দিক থেকে।"

এই বিশ্বমানবতাকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করাই মানুষের সাধনা। "মানুষ হয়ে জন্মলাভ করে আরাম চাইবে কে, বিশ্রাম পাব কোথায়। মুক্তি পেতে হবে, মুক্তি দিতে হবে, এই যে তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য—

মহাবিশ্ব জীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা
মৃত্যুরে না করি শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজল ধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি, তারি মাঝে যাব অভিসারে
তারি কাছে জীবন সর্বস্ব ধন অর্পিয়াছি যারে—

জন্ম জন্ম ধরি।
কে সে? জানি না কে। চিনি নাই তারে।
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানব যাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে,
ঝড় ঝঞ্চা বজ্রপাতে জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি।…"

রবীন্দ্রনাথ দেবতাকে নিজের বাহিরে রাখিতে নারাজ। বৃহদারণ্যক থেকে তিনি উদ্ধৃতি নিলেন—

অথ সোঽন্যাং দেবতাং উপাস্তে
অন্যোঽসৌ অন্যোঽহম্ অস্মীতি
ন স বেদ, যথা পশুরের স দেবানাম্।

যে মানুষ অন্য দেবতাকে উপাসনা করে, সেই দেবতা অন্য আর আমি অন্য এমন কথা ভাবে সে তো দেবতাদের পশুর মতোই।

উপনিষদের মতোই তিনি বাউলদের কাছ থেকে নিলেন—

মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ।

তারপর কাঠ-পাথর পূজাকে হীনতা বলে তাই নিয়ে যারা মারকাট করলেন রবীন্দ্রনাথ দেখালেন "তাদেরও দেবতা প্রতিমার মতই—বাইরে অবস্থিত। নানাপ্রকার অমানুষিক বিশেষণে লক্ষণে সজ্জিত, শুধু তাই নয়, বিশেষ জাতের ঐতিহাসিক কার্য্যকলাপে জড়িত ও কাল্পনিক কাহিনী দ্বারা দৈশিক ও কালিক বিশেষত্ব গ্রস্ত। এই পৌত্তলিকতা সূক্ষ্মতর উপাদানে রচিত বলেই নিজেকে অপৌত্তলিক বলে গর্ব করে। বৃহদারণ্যক এই বাহ্যিকতাকেও হীন বলে নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, যে দেবতাকে আমার থেকে পৃথক করে বাইরে স্থাপন করি তাঁকে স্বীকার করার দ্বারা নিজেকে নিজের সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দিই।

তবে কি মানুষ নিজেকে নিজেই পূজা করবে। অহংকে নিয়েই অহংকার। সে তো পশুতেও করে। অহং থেকে বিযুক্ত আত্মার ভূমার উপলব্ধি একমাত্র মানুষের পক্ষেই সাধ্য। অহংকার দূর করতে হয়, তবেই অহংকে পেরিয়ে আত্মাতে পৌঁছুতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ বাউলদের কাছ থেকে আরও নিলেন,—

জীবে জীবে চাইয়া দেখি সবই যে তার অবতার—
ও তুই নূতন লীলা কী দেখাবি যার নিত্যলীলা চমৎকার।

উপনিষদ থেকে—শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ,

যীশুর বাণী থেকে **I and my Father are one.** সুতরাং তার বিশ্বমানব যে ভগবান এতে কি সন্দেহ থাকতে পারে?

তারপর মানব সভ্যতা নামক মানুষের ধর্মের শেষাংশে তিনি বললেন, "যখন অহং আপন ঐকান্তিকতা ভোলে তখন দেখে সত্যকে। আমার এই অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে, "জীবন দেবতা" শ্রেণীর কাব্যে।

ওগো অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াস
আসি অন্তরে মম।

আমি যে পরিমাণে পূর্ণ অর্থাৎ বিশ্বভূমীন সেই পরিমাণে আপন করেছি তাঁকে, ঐক্য হয়েছে তাঁর সঙ্গে। সেই কথা মনে করে বলেছিলুম, "তুমি কি খুশি হয়েছ আমার মধ্যে তোমার লীলার প্রকাশ দেখে।"

অহং-এর আপন ঐকান্তিকতা ভোলা মানে শ্রীরামকৃষ্ণের ছোট আমি ত্যাগ। এই অহং গেলেই যেটা থাকে সেটা তুঁহু তুঁহু। এই অহং যাওয়া কত শক্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেব গরুর উদাহরণে বুঝিয়েছেন। গরু যতক্ষণ বেঁচে থাকে ততক্ষণ বলে হাম্ বা হাম্ বা অর্থাৎ আমি আমি। তারপর কসাইয়ে কাটে, নাড়িভূড়ি দিয়ে ধুনুরীর তাঁত তৈরী হয়। তারপর সেই তাঁতে ছড়ের টান পড়লে তখনই তুঁহু তুঁহু বার হয়। রবীন্দ্রনাথ ও রাজা নাটকে অভিমান যাওয়ার কথায় বলেছেন—(সুদর্শনা) "বেঁচেছি, বেঁচেছি, সুরঙ্গমা, হার মেনে তবে বেঁচেছি। ওরে বাস্‌রে কি কঠিন অভিমান। কিছুতেই গল্‌তে চায় না! আমার রাজা কেন আমার কাছে আসতে যাবে—আমিই তাঁর কাছে যাবো এই কথাটা কিছুতেই মনকে বলাতে পারছিলুম না। সমস্ত রাতটা সেই জানালায় পড়ে ধূলোয় লুটিয়ে কেঁদেছি। দক্ষিণের হাওয়া বুকের বেদনার মত হু হু করে বয়েছে, আর কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর অন্ধকারে বউ কথা কও চার পহর রাত কেবলই ডেকেছে। সে যেন অন্ধকারের কান্না।"*

রবীন্দ্রনাথ 'মুক্তি' বলতে কি বুঝতেন তা তাঁর লেখার ভেতর থেকেই অন্বেষণ করা যাক। মানসীর সূচনায় তিনি লিখেছেন, "পরিচিত সংসার থেকে এখানে (গাজীপুরে) আমি

এই আপন ঐকান্তিকতায় সীমাবদ্ধ আমি নিজের সীমা ছাড়িয়েই হয় বিশ্বভূমিন অর্থাৎ বিশ্বমানব। আমি যে পরিমাণে পূর্ণ অর্থাৎ বিশ্বভূমিন সেই পরিমাণে আপন করেছি তাঁকে। ছোট আমি থেকে বড় আমিতে যাওয়াই মানুষের দেবতা হওয়া—সাধকের মুক্তি বা নির্বাণ।

এর পরেই তিনি বিশ্বদেবতার কথা বলেছেন, "তাঁর আসন লোকে লোকে, গ্রহচন্দ্রতারায়। জীবনদেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে,-হৃদয়ে হৃদয়ে তার পীঠস্থান। সকল অনুভূতি সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। সমস্ত জীবনে বা জীবে পরিব্যাপ্ত হয়ে মানবাত্মা আরো প্রসার চায়। সে তখন সমস্ত বিশ্বকে আপনার

সেই দূরত্বের দ্বারা বেষ্টিত হলুম, অভ্যাসের স্থূলহস্তাবলেপ দূর হবামাত্র মুক্তি এল মনোরাজ্যে। এই আবহাওয়ায় আমার কাব্য রচনার একটা নতুন পর্ব আপনি প্রকাশ পেল।

দেখা যাচ্ছে মন যে পথে চলতে অভ্যস্ত ছিল সেই পথ ছেড়ে অন্য পথে যেতে পারলেই তার মুক্তি হল। সে তার গণ্ডী বা সীমা থেকে মুক্তি পেল।

তেমনি মানুষ তার ব্যক্তিত্ব বা আমিত্বের বন্ধন থেকে ছাড়া পেলেই তার আত্মার মুক্তি হয়। মানুষ ব্যস্ত তার নিজের সুখ দুঃখ, লাভালাভ, জয় পরাজয় নিয়ে। এই সীমা ছাড়িয়ে যে অপরের বা সকলের সুখদুঃখ ইত্যাদির মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারে সেই মুক্তি পেল তার ব্যক্তিত্বের বন্ধন থেকে। 'আমি' থেকে 'আমি'র বাইরে যাওয়াটাই মুক্তি। তাইতো তিনি বলেছেন,

আমার মুক্তি গানের সুরে
এই আকাশে,
আমার মুক্তি ধূলায় ধূলায়
ঘাসে ঘাসে॥
দেহমনের সুদূর পারে
হারিয়ে ফেলি আপনারে,
দিগ্বিদিকে ছড়ায় আমায়
কোন বাতাসে॥
মন মেশে মোর শ্যামলবনের
মনের সাথে।
ফুল ফোটানোর নিবিড় নেশায়
পরাণ মাতে।
কচি পাতার ব্যাকুলতা
রক্তে আমার কয় যে কথা,
স্বপ্ন আমার মেঘের লীলায়
শূন্যে ভাসে।

মধ্যে গ্রহণ করে। সাধকের পক্ষে ইহা উচ্চতর অবস্থা। সহানুভূতি স্বগৃহে জন্মলাভ করে স্বজাতি ছাড়িয়ে এবার বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে। মানুষের মুক্তির প্রকৃতি এবং পরিমাণই এতে সূচিত হয় মাত্র। অন্য দেবতার কথা গৌণ উপমা বই নয়। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সত্যলোকে এসেই হাজির হয়েছেন। পথটা তার সনাতন না হলেও হতে পারে। তাই ফিরে যাবার প্রয়োজন হয় নাই।

তারপর চিত্রার ঐ সূচনায়ই দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনদেবতাকে 'অন্তর্যামী'ও বলছেন। এই অন্তর্যামীর প্রেরণায়ই তিনি কাব্য লেখেন। চিরদিন তিনি তাই লিখে এসেছেন। নইলে—

ফুলের মতন আপনি ফোটাও গান,
হে আমার নাথ, এই তো তোমার দান,—
ওগো সে ফুল দেখিয়া আনন্দে আমি ভাসি,
আমার বলিয়া উপহার দিতে আসি,
তুমি নিজ হাতে তারে লও স্নেহে হাসি,
দয়া করে প্রভু রাখো মোর অভিমান।

'দিগ্বিদিকে নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া', 'দেহমনের পারে নিজেকে হারানো', 'বনের মনের সাথে মন মেশানো'—এই তো মুক্তি। 'গানের সুরে মনটাকে আকাশে উড়িয়ে দেওয়া'ও মুক্তি। মুক্তি 'আমি'র বাইরে যাওয়া।

কিন্তু এই মুক্তি আংশিক। যখন সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে নিজেকে এক করে দেওয়া যায় তখনই হয় পূর্ণ মুক্তি; অবশ্য একমাত্র পূর্ণমুক্তিকেই আধ্যাত্মিক অর্থে মুক্তি বলা যেতে পারে। আপন সীমায় বদ্ধ মানুষ পরিপূর্ণতার স্বাদ চায়। যেভাবেই তা পাক না, পেলেই তার মুক্তি। তাই তো "মুক্তি" কবিতায় কবি লিখেছেন,—

মুক্তি নানা মূর্তি ধরে দেখা দিতে আসে নানা জনে
এক পন্থা নহে।
পরিপূর্ণতার সুধা নানা স্বাদে ভুবনে ভুবনে
নানা স্রোতে বহে।

স্বামী বিবেকানন্দ মানুষ ও ঈশ্বরের সংজ্ঞা ও পার্থক্য নির্দেশ করে, ঈশ্বর হওয়াকেই মুক্তি বলেছেন। সংজ্ঞাটা অবশ্য প্লেটোর। মানুষ একটি সীমাহীন বৃত্ত মাত্র। পরিধি কোথাও নেই, কিন্তু কেন্দ্র একটি বিন্দুতে অবস্থিত। আর ঈশ্বরও একটি সীমাহীন বৃত্ত, তার পরিধি নেই, কিন্তু তাঁর কেন্দ্রটি সর্বত্র অবস্থিত।

সুতরাং মানুষ এক কেন্দ্রিক, ঈশ্বর বহু কেন্দ্রিক। মানুষের ঈশ্বর হতে গেলে তার কেন্দ্র সংখ্যা বাড়াতে হয়। ভালবাসা বা প্রেমে এই কেন্দ্র বাড়ে। আমি যৌবনে শুধু নিজের

এই তুমিটি কে? গীতাঞ্জলি কাঁর পায়ে অর্পিত হয়েছে? তিনিই কি রবীন্দ্রনাথের গানের উৎস নন? হ্যাঁ, তিনিই।—বক্তা কবি রবীন্দ্রনাথ। আর গানের দেবতা তাঁর জীনিয়স বা যুগ্মসত্তা ভগবান নন একথা বলেছেন স্পর্শকাতর সমালোচকতুষ্টিবিধায়ক সর্বজনপূজিত রবীন্দ্রনাথ। কার কথা মানি?

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।—গীতা

হে অর্জুন, অন্তর্যামী নারায়ণ সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া সর্বভূতকে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় মায়া দ্বারা চালিত করিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথও তাঁহাকে চেনেন। তিনি কতবার তাঁকে চিনিয়েছেন—মোর আঁকা পটে দেখেছে তোমারে অনেকে অনেক সাজে। দেখুন কোন লীলাময়কে তিনি চেনাচ্ছেন এই লাইনগুলোতে,—

তাই তোমার আনন্দ আমার পর,
তুমি তাই এসেছ নীচে;
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে। —গীতাঞ্জলি (২২১)

সুখদুঃখই বুঝতুম। বিবাহের পরে স্ত্রীর সুখ দুঃখ আমার হল। আমার এক কেন্দ্র দুই হল। একটি সন্তান জন্মিলে আর একটি কেন্দ্র বাড়ল। হল তিন। আর একটি সন্তানে চার। ইত্যাদি। তারপর বন্ধু প্রিয়জনের সংখ্যা অনুসারে এই কেন্দ্রের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। আর শেষ পর্য্যন্ত যদি সবারে ভালবাসতে পারি তবেই আমার মনের কালো একেবারে ঘুচে যায়; আমি এক ব্যক্তি হয়েও বহুর সঙ্গে এক হয়ে যাই। তখন আমি জীবন্মুক্ত। রবীন্দ্রনাথ এই অবস্থাটার কথাই বলেছেন—"অসংখ্যবন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ"-এ।

মনে রাখতে হবে এই অসংখ্য বন্ধন তথাকথিত বিশ্বহিতৈষণা নয়। এরও কমবেশি গুণগত তারতম্য হতে পারে। যেমন একটা ছোট ছেলেকে একটা জোয়ান মানুষ চড় মারলে আপনার আমারও কষ্ট হয়, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের পিঠে বলিষ্ঠ এক মাল্লার দেওয়া আর এক বালক কর্মীর পিঠের চড়টির পাঁচ আঙুলের দাগ পর্য্যন্ত ফুটে উঠেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ যে পরিমাণে ঐ ছেলেটির মধ্যে নিজেকে অনুভব করতে পেরেছিলেন সেইটেই মুক্তির বন্ধনের পরিমাপ। এর একটু কম হলেও—এমনকি চোখ থেকে কলসী কলসী জল পড়লেও মুক্তির পূর্ণতা হবে না।

তবে এ চেনা সুর নিশ্চয়াত্মক নয়। সন্দেহ, দ্বিধা লেগেই আছে। তাই তো এক এক সময়ে তাঁর লজ্জা—"তোমায় চিনিনি জানিনি একথা কেমনে বলিব লোকের মাঝে।"

তাঁর সঙ্গে দেখা যে হয়েছে তা এইরূপ—

জ্যোৎস্না নিশিতে পূর্ণ শশীতে দেখেছি তোমার ঘোমটা খসিতে
আঁখির পলকে পেয়েছি তোমায় লখিতে।
বক্ষ সহসা উঠিয়াছে দুলি, অকারণে আঁখি উঠেছে আকুলি ;
বুঝেছি হৃদয়ে ফেলেছ চরণ চকিতে।

যিনি বাহিরে তিনিই আবার অন্তরে। বহু সৃষ্টির মধ্যে যিনি, নিভৃত অনুভূতির মধ্যেও তিনিই।

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াস
আসি অন্তরে মম।
দুঃখ সুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়াছি তোমায়
নিঠুর পীড়নে নিঙারি বক্ষ দলিত দ্রাক্ষাসম।

মানুষের পক্ষে নিজেকে সবকিছুর সঙ্গে অভিন্ন দেখা বা identify করা খুবই শক্ত, প্রায় অসম্ভব। তাই যিনি সব কিছুর সঙ্গে এক তাঁর সঙ্গে identify করতে পারলেই পরোক্ষ ভাবে জগতের সঙ্গেও identify করা হয়। গীতায় সেই নিরাকার এবং সাকারের ধ্যানের পার্থক্য।—

ক্লেশো হধিকতরস্তেষাম্ অব্যক্তাসক্তচেতষাম্।
অব্যক্তা হিগতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

রবীন্দ্রনাথ সাধারণ লোকের জন্য এই আধ্যাত্মিক সহজ পন্থার বিরুদ্ধে অনেকবার বিদ্রোহ করেছেন। ইহাকে তিনি আধ্যাত্মিক made easy বলেও বিদ্রূপ করেছেন। কিন্তু ধর্মজগতে এর উপযোগিতা বহু সহস্র বৎসর ধরেই প্রমাণিত হয়ে আসছে। তবে পথ সম্বন্ধে জীবনের নানা অবস্থায় নানা মত পোষণ করলেও, তিনি শেষ পর্যন্ত একথাও বুঝতে পেরেছিলেন যে একাধিক পন্থায় মুক্তি অর্জন করা যায়। যত মত তত পথ তিনিও মেনে নিয়েছিলেন। উপরে উদ্ধৃত

"মুক্তি নানা মূর্তি ধরি দেখা দিতে আসে নানা জনে
এক পন্থা নহে।

—এই দুই ছত্রের মধ্যেই তার প্রমাণ রয়েছে। তবে মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁরও কোন ভিন্ন মত ছিল না। বিশ্বের সঙ্গে একত্ব অনুভূতিকেই তিনি মুক্তি মনে করতেন। এই বিষয়ে—

তখন কে বলেগো সেই প্রভাতে নেই আমি
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি,

—এই ধরণের বহু উদ্ধৃতি আমরা স্থানান্তরে করবো।

ওই যে মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে, তাতে কি তোমার তৃপ্তি হল ?

আমার জীবন তাঁর আর্ট ! রক্তমাংসের কাহিনী—জীবননাট্য। Plato-র idea আর জগতে যে সম্বন্ধ। Idea বাস্তবে রূপায়িত হয় মাত্র। খুঁত থাকলো বলে সেটাকে ভেঙে ফেলতে হয়। আবার উন্নতির চেষ্টা। এমনি চলছে। তবে বাস্তব কোনদিনই কি সম্পূর্ণ করে প্রকাশ করতে পারবে সেই idea-কে ?

কথা তারে শেষ করে পারে নাই বাঁধিতে,
গান তারে শেষ করে পারে নাই সাধিতে

—সে তো জীবনে চিরদিন আভাসেই রয়ে গেল। প্রভাতের এমন ফুলেও তার পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব হলনা। তবু ফুল কী সুন্দর ! প্রকাশের চেষ্টা কি অপূর্ব ! তাই তো নিজের জীবনেও তিনি দেখতে পেলেন, 'সমস্ত বাধা বিরোধ ও বক্রতার ভিতর দিয়ে আনন্দময় নৈপুণ্যের সহিত তাঁহার জীবনদেবতা একটি অন্তরতম অভিপ্রায়কে বিকাশের দিকে লইয়া চলিয়াছেন, তাহাকে উদঘাটিত করিয়া দেখাইবার শক্তি তাঁহার নাই, বলে তিনি জীবন স্মৃতিতে সে চেষ্টা করেন ও নাই। (জীবনস্মৃতি—শেষপ্যারা)

এই যে Idea ইহা আমার নয় তো। Platoরও নয়—রবীন্দ্রনাথেরও নয়। তাঁর। কার ইচ্ছা ?—না তাঁর ইচ্ছা। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। জগত লীলাময়ের

তাছাড়া অসংখ্য বন্ধন মাঝে যে মুক্তি তার আংশিকরূপ সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন। তাইতো তিনি বলেছিলেন অসংখ্য বন্ধনমাঝে লভিব 'মুক্তির স্বাদ'। 'মুক্তির স্বাদ' পুরো মুক্তি নহে। মুক্তির ভোজ হল না, একটু 'স্বাদ' পাওয়া গেল মাত্র। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলেছেন রসগোল্লা কেউ দেখেছে কেউ শুনেছে আর কেউ খেয়ে হেউঢেউ হয়ে গিয়েছে। সেই রকম খেয়ে হেউঢেউ হওয়া মুক্তি অসংখ্য বন্ধন পরে হয় না, ওর মধ্যে একটু আধটু দরশন, পরশন, জিঘ্রণ পর্য্যন্ত হতে পারে। তবে জীবনের কবি হিসেবে তিনি ঐ স্বাদটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট, তিনি পূর্ণ মুক্তির প্রার্থী ছিলেন না। তিনি জীবনের নিমন্ত্রণ চেয়েছিলেন "লোকে লোকে, নবনব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে"। সূর্যের অস্তের পরে কামনা করেছেন নব উদয়। নির্বাণ বা শান্তি নহে।

অস্ত রবির আলোর শতদল
মুদিল অন্ধকারে।
ফুটিয়া উঠুক নবীন ভাষায়
শ্রান্তি বিহীন নবীন আশায়
নব উদয়ের পারে।

লীলা। ইনিই অন্তর্য্যামী, ইনিই জীবনদেবতা, ইনিই বিশ্বদেব। পাত্রভেদে আকারভেদ এইমাত্র। কিন্তু তিনিই একমেবাদ্বিতীয়ম। রবীন্দ্রনাথ ইহাকেই বলেছেন অপূর্ণের মধ্যে পূর্ণের প্রকাশ।

যে সমালোচনা রবীন্দ্রনাথকে পর্য্যন্ত বিচলিত করেছিল এখানে তার আর একটু বিশদ আলোচনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সমালোচনাটি হচ্ছে এই যে রবীন্দ্রনাথের লেখা বাস্তব সংসর্গহীন। উহাতে সত্য মঙ্গল প্রেম ও ঔপনিষদিক মোহ বিস্তার আছে কিন্তু জীবনের ব্যবহারিক সত্য নাই। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী অভিযোগটি এইভাবে পেশ করেছেন।—

"আমার কবিতা এখন মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে"।

(বর্ষা ও শরৎ।)

"কড়ি ও কোমল মানুষের জীবন নিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান।"—ঐ

"যৌবনের আরম্ভে মানুষের জীবনলোক আমাকে তেমনি করিয়াই টানিয়াছে। তাহারও মাঝখানে আমার প্রবেশ ছিল না, আমি প্রান্তে দাঁড়াইয়াছিলাম।"

(শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী)

ইহার উপরে বিশী মহাশয় মন্তব্য করেছেন, "বড় সত্য কথা। রবীন্দ্রনাথ মানুষের কবি, মানুষের বিচিত্র জীবন তাঁহাকে নানাভাবে আকর্ষণ করিয়াছে; কিন্তু তিনি সেই রহস্য নিকেতনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, বাহিরে দাঁড়াইয়া যেটুকু স্বাদগন্ধ ইঙ্গিত আভাস পাইয়াছেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার কবি জীবনের ট্রাজেডি।"—রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ পৃঃ ৪।

নিপুণ সমালোচক্ আইনের বেড়াজালে ঘিরে কবিকে কাবু করতে চেষ্টা করেছেন। কবির স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই তাঁর বিচার সমাধা করেছেন বিশী মহাশয়।

নিপুণ আইনজ্ঞের মতই এই যুক্তিজাল যাচাই করা যাক। প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি রবীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তির উদ্দেশ্য ও কাল সম্বন্ধে অবিচার হয়েছে। তিনি বলেছেন যে যৌবনের আরম্ভে·· মানুষের জীবন নিকেতনে তাঁর প্রবেশ ছিল না,—বিশী মহাশয় সেটা তাঁর সমস্ত জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন এবং এই অতি বিস্তারের তিনি উল্লেখ পর্য্যন্তও করেননি। অথচ অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ

নিজেই কাতর নিবেদন জানিয়েছেন যে যারা তাঁর লেখা সম্বন্ধে এরকম অভিযোগ করেছেন তারা তাঁর ওপর অবিচার করেছেন। (ইতিপূর্বে উদ্ধৃত চিত্রার সূচনা দ্রষ্টব্য।)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন দ্বারা কবির উক্তিগুলির অপপ্রয়োগ হয়েছে। ওগুলোকে তাই আর স্বীকারোক্তি বলা চলে না।

তবু সমবেদনা দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলে সমালোচকের অভিযোগটি বোঝা শক্ত নয়। তাদের ধারণা রবীন্দ্রনাথ যা কিছু লিখেছেন সব বানিয়ে। বাইরে থেকে দেখে—ভেতর থেকে ভুগে নয়। যেমন ধরা যাক তাঁর সাধারণ পরিবারের জীবনের সুখ দুঃখের কাহিনী। কবি ছিলেন ধনীর দুলাল, অসাধারণ—রূপেগুণে বিলাসে ব্যসনে। তিনি মাত্র কল্পনার সাহায্যেই সাধারণ জীবন দেখে থাকবেন। বাস্তবে নয়। অর্বাচীন নাবালকের লেখা প্রেমের কবিতার মত। কবি তার নিজের সম্বন্ধেই যা বলেছেন মানসী পর্য্যন্ত। "ভালো করে ভেবে দেখলে মানসীর ভালোবাসার অংশটুকুই কাব্য কথা—বড় রকমের সুন্দর রকমের খেলনা মাত্র—ওর আসল সত্য কথাটুকু হচ্ছে এই যে, মানুষ কি চায় তা কিছু জানে না—

একেই বল ভালবাসা? আমার ভালবাসার লোক কই? আমি ভালোবাসি অনেককে—কিন্তু মানসীতে যাকে খাড়া করেছি—সে মানসেই আছে—সে আর্টিষ্টের হাতে রচিত ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা।"...চিঠিপত্র—৫ পৃঃ ১৫২-৩।

যেমন হয়েছিল তাঁর জীবনের দুঃখ তাপের শৈশব কবিতা, যা শুনে তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উচ্চহাস্য করেছিলেন এবং পরে সেই হাসিকেই কবি নিজে তার উপযুক্ত সমালোচনা বলে গ্রহণ করেছিলেন। জীবন স্মৃতিতে বর্ণনাটা এই রকম ঃ—

"...দুইটি ঈশ্বর স্তবরচনা করিয়াছিলাম। তাহাতে যথারীতি সংসারের দুঃখকষ্ট ও ভব যন্ত্রণার উল্লেখ করিতে ছাড়ি নাই। শ্রীকণ্ঠবাবু মনে করিলেন এমন সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ পারমার্থিক কবিতা আমার পিতাকে শুনাইলে, নিশ্চয় তিনি ভারি খুশি হইবেন। মহা উৎসাহে কবিতা শুনাইতে লইয়া গেলেন। ভাগ্য-ক্রমে আমি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলাম না। কিন্তু খবর পাইলাম যে, সংসারের দুঃসহ দাবদাহ এত সকাল সকালই যে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে পীড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে, পয়ার ছন্দে তাহার পরিচয় পাইয়া তিনি খুব হাসিয়া-

ছিলেন। বিষয়ের গাম্ভীর্য্যে তাঁহাকে কিছুমাত্র অভিভূত করিতে পারে নাই।” (র,র—১৭—পৃঃ ২৯৫)

বালকের অভিজ্ঞতার অভাবই যে এখানে উপহাসের বস্তু তা নয়। তার উপলব্ধি করবার শক্তির অভাব তার বুদ্ধিবৃত্তির অপরিপক্কতাকেই কবি উপহাস করেছেন। সমালোচকেরা তাঁকে পরিপক্কতার সার্টিফিকেট দিচ্ছেন, কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে দোষী সাব্যস্ত করছেন। পার্থক্যটা খুবই মৌলিক। অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করার শক্তি খানিকটা আসে বটে, কিন্তু উপলব্ধি করবার জন্যে উপযুক্ত বয়সও হওয়া চাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটা ঝাঁঝালো উদাহরণ দিয়েছিলেন—পঞ্চ বর্ষীয় বালককে রমণসুখ বোঝান যায় না।

এইটুকু পরিষ্কার হলে এবার বলা যায় যে বয়সে ও মানসিক বৃত্তির পরিণতিতে উপলব্ধির যোগ্য হলে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্থাৎ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলেই বরং ভালো হয়। আর্টের একটা নৈর্ব্যক্তিক দিক থাকে। ব্যক্তির অভিজ্ঞতা অনেক সময়েই সেটাকে ঢেকে ফেলে—অন্ততঃ ম্লান করে দেয়। তাই প্রেমে পড়ে প্রেমের কবিতা লেখা যায় না। সেই অবস্থা কেটে গেলে তা স্মরণ করে তবেই লেখা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন মৌমাছি যখন মধু খায় তখন গুন্ গুন্ করে না। রবীন্দ্রনাথও স্মৃতিচিত্রণ সম্বন্ধে জীবনস্মৃতিতে বলেছেন—“যখন পথিক যে পথটাতে চলিতেছে বা যে পান্থশালায় বাস করিতেছে, তখন সে পথ বা সে পান্থশালা তাহার কাছে ছবি নহে, তখন তাহা অত্যন্ত বেশি প্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত অধিক প্রত্যক্ষ। যখন প্রয়োজন চুকিয়াছে, যখন পথিক তাহা পার হইয়া আসিয়াছে তখনই তাহা ছবি হইয়া দেখা দেয়। জীবনের প্রভাতে যে সকল সহর এবং মাঠ, নদী এবং পাহাড়ের ভিতর দিয়া চলিতে হইয়াছে, অপরাহ্ণে বিশ্রামশালায় প্রবেশের পূর্বে যখন তাহার দিকে ফিরিয়া তাকানো যায়, তখন আসন্ন দিবাবসানের আলোকে সমস্তটা ছবি হইয়া চোখে পড়ে।” জীবন-স্মৃতি—র,র –১৭—পৃঃ ২৬৪।

আর একটি কথা আছে। শোভাযাত্রায় নামলে আর তার শোভা দেখা যায় না। তেমনি জীবনের শোভাযাত্রায়ও যারা অংশ গ্রহণ করেন তারা আর্টিষ্ট হতে পারেন না। আর্টিষ্ট একান্তভাবে দর্শক। একটু দূরত্ব বাঁচিয়ে চললেই তার পক্ষে ভাল হয়। কারণ—

Distance Lends enchantment to the view
And covers the mountain in its azure hue.

দূর থেকে পাহাড়কে দেখায় সবুজ কার্পেটে মোড়া। কাছে এলে খচাখচা পাথর অসুন্দর গাছ মরাডাল ঝরা পাতার আবর্জনা। কবির যদি এই কর্ম হয়, জীবনের সমস্ত কিছুর রস বাহির করা অথবা সব কিছুতে রস সঞ্চার করা তবে তাকে সব কিছু থেকে কিঞ্চিৎ দূরেই থাকতে হবে। এমন কি নারী ও তার কাছে 'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা' হয়ে রইবে। কল্পনার 'প্রকাশ' কবিতায়—রবীন্দ্রনাথ কবির অবস্থাটা বেশ পরিষ্কার করে দেখিয়েছেন। আদি কবিটি ছিলেন যেন বোকাসোকা একটি মানুষ। তিনি কথা বলতেন না কারও সাথেও। দেখতেন সব শুনতেন সব কিন্তু তিনি যে দেখছেন বা শুনছেন তা কাউকে বুঝতে দিতেন না। তাই তো ভ্রমর নব মালতীর কাণে তাকে শুনিয়ে শুনিয়েই প্রেম মন্ত্র পড়ত, চকোরী চাঁদকে খুঁজতো, ঊষা অরুণকে। এমনকি বাসর ঘরের দরজাও তাকে দেখলে বন্ধ করার প্রয়োজন বোধ করত না কেউ? সেই জন্যেই তার পক্ষে প্রকৃতির অন্তরে ভালবাসার খেলা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছিল এবং পরে সুযোগ বুঝে তিনি একদিন সকল কথা প্রকাশ করে দিতে পেরেছিলেন তার কাব্যে। কিন্তু এইভাবে সকলের গোপন কথা প্রকাশ করে দেওয়ায় পরবর্তী কবিদের হল বিষম মুস্কিল। কারণ—

হায় কবি হায়, সে হ'তে প্রকৃতি হয়ে গেছে সাবধানী,
মাথাটি ঘেরিয়া বুকের উপরে আঁচল দিয়েছে টানি।

তাই আজকের কবি দুঃখ করছেন,

যত ছলে আজ যত ঘুরে মরি জগতের পিছু পিছু
কোনোদিন কোনো গোপন খবর নূতন মেলে না কিছু।
শুধু-গুঞ্জনে কূজনে গন্ধে সন্দেহ হয় মনে
লুকানো কথার হাওয়া বহে যেন বন হতে উপবনে,
মনে হয় যেন আলোতে ছায়াতে রয়েছে কী ভাব ভরা,
হায় কবি হায়, হাতে হাতে আর কিছুই পড়ে না ধরা।

আদি কবি আর পরবর্তী কবিদের অবস্থায় এই পার্থক্য থাকলেও দুয়ের মধ্যে এক জায়গায় কিন্তু মিল আছে। দু'জনের কেহই জীবনে অংশ গ্রহণ করেন নাই। দু'জনেই দ্রষ্টা, শ্রোতা—কেহই নট নন, দর্শকমাত্র।

কবি হবে গিরগিটি স্বভাবের—ক্যামেলিয়ান জাতীয়। যার কাছে যাবে তার রং লাগবে তার দেহে, নিজের রং বলতে থাকবে না কিছু। বয়সের, অবস্থার কোন গণ্ডী মানবে না সে।

সবার আমি সমানবয়সী যে
চুলে আমার যতই ধরুক পাক্‌।

এই সকলের সমানবয়সী হতে হলে নিজের কোন বয়স থাকলে চলবে না। সহানুভূতিই কবির একমাত্র অনুভূতি। অন্যের ভেতরে ঢুকে ভাবটা তার নিজের করে নিতে পারা চাই।

সুতরাং কবিকে অভিজ্ঞতার জন্য ছুটতে হবে কেন? তাকে কেন ঢুকতে হবে কোন ঘরে—এমন কি বাসর ঘরেও নয়। দুয়ারে কান পাতাই তার পক্ষে যথেষ্ট। এহেন কবিই ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি অভিজ্ঞতার জন্য দুঃখ করেন নাই। তাঁর অল্পবয়সের লেখায় তিনি যে পরিণত বয়সের ভাব ফোটাতে চেষ্টা করেছেন তাতেই ছিল তার লজ্জা। তখন ওসব ভাব বোঝবার তার বয়স হয় নি। ভাবের ঘরে তিনি ঢুকতে পারেন নি অথচ বর্ণনা করেছেন, সেই জন্যেই তার লজ্জা। সেইজন্যেই তার ত্রুটি স্বীকার।

কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার জন্য তিনি লালায়িত নন। ভাষা ও ছন্দ—কবিতায় তিনি সে কথা স্পষ্ট করে বলেছেন। বাল্মিকী হঠাৎ ছন্দ আবিষ্কার করে পাগল হয়ে আছেন কী করবেন এ দিয়ে। ব্রহ্মা নারদকে পাঠালেন সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করে,

এই ছন্দে গাথি' লয়ে কোন দেবতার যশোগাথা
স্বর্গের অমরে, কবি, মর্ত লোকে দিবে অমরতা?

কিন্তু বাল্মিকী দেবতার স্তবগীত গাইতে রাজী নন। দেবতার স্তবগীত তো 'গাহিতেছে বিশ্বচরাচর।' বরং মানুষের ভাষাটুকু যে অর্থদিয়ে বদ্ধ চারিধারে। তাকেই তিনি খানিকটা স্বাধীনতা দিতে চেষ্টা করবেন, তাছাড়া—

দেবতার স্তবগীতে দেবেরে মানব করি' আনে।
তুলিব দেবতা করি' মানুষেরে মোর ছন্দে গানে।

নারদের কাছে এই সঙ্কল্প নিবেদন করে বাল্মিকী হঠাৎ তাঁকেই পাল্টা প্রশ্ন করে বললেন,—

ভগবন্‌, ত্রিভুবন তোমাদের প্রত্যক্ষে বিরাজে

বলনা কে এই গানের যোগ্য?—তখন নারদ অযোধ্যার রঘুপতি রামচন্দ্রের নাম করলেন। বাল্মিকী বললেন, নাম তো তাঁর জানি, কিন্তু সব কথা তো

জানিনা। 'পাছে সত্যভ্রষ্ট হই এই ভয় জাগে।' তখন নারদ তাঁকে রামের ইতিহাস না শুনিয়ে বরং বললেন,—

সেই সত্য যা' রচিবে তুমি।
ঘটে যা' তা সব সত্যনহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

সর্বদর্শী দেবর্ষি নারদের অভিমত এই। রবীন্দ্রনাথও সবিনয়ে তাই তাঁর সমালোচকদের নিবেদন করলেন। অভিজ্ঞতার অভাবে তিনি অবাস্তব লিখেছেন তা' তিনি স্বীকার করেন না। তাঁর লেখা বস্তুর চেয়েও বাস্তব।

জীবন দেবতার বাড়াবাড়িটা বাদ দিয়ে আবার কবির জীবনে ফিরে আশা যাক্।

জাতীয় বৈশিষ্ট্য বা Race-এর প্রভাব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ খুবই সচেতন ছিলেন। তিনি বা কোন মহাপুরুষই যে ভুঁই-ফোড় নন বা হতে পারেন না সে বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না। জাতির অতীত যে ব্যক্তির মধ্যে বেঁচে থাকে তা' তিনি জানতেন। তাই তো অতীতকে সম্বোধন করে বলেছিলেন,

তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া—
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ
মজ্জায় মিশাইয়া।

মানুষের অস্থির ভেতর মজ্জায় মিশে আছে পূর্বপুরুষদের গুণাবলী, তাঁদের চরিত্র। জাতিকুলের প্রভাব এড়িয়ে সে যাবে কোথায়?

তবে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই জাতীয় প্রভাবটা ঋজুরেখায় ফুটে উঠতে পারে নি। ধর্মের আতসকাঁচের ভেতর দিয়ে তাকে আসতে হয়েছে বলে তাকে পুরোপুরি সনাক্ত করা মুস্কিল।

Race বললে যে জাতি বুঝায় Caste তার অঙ্গীভূত। ওটা ethnic concept. Nation টা political. Caste system-এ সত্যিই Nation grow করে না। কারণ Nation হতে হলে ethnic unity দরকার। দেশের যে অবস্থায় দুই প্রতিবেশি পরিবারের একটি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও অন্যটির একবিন্দু রক্তের ক্ষতি হয় না সে দেশে জাতীয়তা বোধ জাগবে কি

* 'অতীত' রবীন্দ্রনাথের আর একটি ব্যক্তি কল্পনা বা Personification. বিধাতা বা সৃষ্টি কর্তার সমগোত্রীয়। বিধাতার আর একটি যুগ্মসত্বা আর কি।

করে? যুদ্ধে যদি ক্ষত্রিয়ই মরে শুধু, ব্রাহ্মণের ক্ষতি না হয়, তবে সে-যুদ্ধে ব্রাহ্মণের কি আসে যায়? তেমনি বৈশ্য বা শূদ্রেরই কি আসে যায়। তাই তো বিদেশী আক্রমণ হল কি না হল তাতে সমগ্র দেশটা কখনও বিচলিত হয় নি। বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধ করবার শক্তিও সে তাই হারিয়ে ফেলেছিল।

আমাদের এক একটি Caste বা sub-caste এক একটা জাতি। বহির্বিবাহ নিষিদ্ধ করে এই খণ্ডজাতীয়তার বনেদ আরও শক্ত করা হয়েছিল। ফলে চারিত্রিক গুণাবলী ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে শ্রেণীতে শ্রেণীতে এদেশে এত পার্থক্য। বহুশতাব্দীর সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকারী পরিবারে জন্মগ্রহণ করে ব্রাহ্মণ-পরিবার-কলঙ্ক বিশেষ ব্যক্তিটিও এবিষয়ে অন্য যে কোন পরিবারের রত্নের চেয়েও ভাল। তাই তো সমস্ত পৈত্রিক গুণাবলী হারিয়েও ব্রাহ্মণ ইতর জাতির প্রণাম হারায় নি। আর যতদিন শিক্ষা ও সংস্কৃতি বংশগত ছিল ততদিন এতে অন্যেরাও কিছু অন্যায় দেখতে পায় নি। শুধু ইংরেজ আমলে ডেমোক্র্যাটিক সেন্টিমেন্ট জেগে উঠলে এবং অপর বর্ণের ভেতরেও শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রবেশ করলেই এই বংশ-মাত্র-সম্বল ব্রাহ্মণপ্রাধান্য বিসদৃশ মনে হতে লাগল। আর তখনই দেখা দিল সংস্কারের প্রয়োজন।

সংস্কার এলো ব্রাহ্ম মতরূপে। জাতিভেদ, দেবদেবী ও মূর্তিপূজা উড়িয়ে দিয়ে। কিন্তু জাতিভেদ মত হিসেবে উঠিয়ে দিলেও তার ফলটা তো আর মজ্জা থেকে মুছে ফেলা যায় না! ব্রাহ্ম হয়েও তাই রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণই থেকে গেলেন। চরিত্রের দিক দিয়ে দেখতে গেলে এ কথা অনস্বীকার্য। অনেক ঘাত প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে তাঁর নিজেকেই এমত স্বীকার করতে হয়েছিল।

অবশ্য গোঁড়া ব্রাহ্মসুলভ অনেক কিছুই তার মধ্যেও দেখা গেছে, কিন্তু তবুও ধীরে ধীরে তিনি পূর্বপুরুষের সংস্কৃতিতে ফিরে এসেছিলেন।

শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়টির ইতিহাস এবিষয়ে প্রনিধান যোগ্য। রবীন্দ্র জীবনী দ্বিতীয় খণ্ডে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সুনিপুণ হাতে এই ইতিহাস বর্ণনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের পিতা রবীন্দ্রনাথের জন্মের দু'বছর পরে আশ্রমের জন্য ২০ বিঘাজমি ক্রয় করেন বাংলা ১২৬৯ সালে। ১২৯৪ সালে ট্রাষ্ট দলিল মূলে একটি অট্টালিকা সহ—বর্তমান অতিথিশালা—উহা উৎসর্গীকৃত হয়। নিজ-জমিদারির কিয়দংশও তিনি দেবোত্তর করেন এই আশ্রমের জন্য।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ট্রাষ্ট অনুযায়ী আশ্রমে কোন মূর্ত্তিপূজা, পরধর্মনিন্দা

বা মদ্য মাংস ও মৎস্য ভোজন জীবহত্যা এবং নিন্দনীয় আমোদপ্রমোদ নিষিদ্ধ।

১২৯৮ সালে ব্রাহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠা ও ৭ই পৌষের উৎসব ও মেলার প্রবর্তন হয়।

ইহার পর বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ওখানে একটি 'ব্রহ্ম বিদ্যালয়' স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। এই বিদ্যালয়ে "ব্রাহ্ম-ধর্মানুমোদিত শিক্ষাপ্রণালী" প্রবর্তনের ব্যবস্থা হইল.। "এমন কি পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে 'পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম,' 'মূল ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' অবশ্য পাঠ্য হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়।

বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর (১৩০৬ সাল) রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের পরিচালন ভার গ্রহণ করেন (১৩০৮)। .তিনি ব্রহ্ম বিদ্যালয়কে 'বোর্ডিং-স্কুল ও পরে 'ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ে' রূপায়িত করেন। রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সাহচর্যে রবীন্দ্রনাথও হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাহাদের বিদ্যালয়ে তাই "ছাত্রেরা সরল কঠোর জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইল। জুতা ছাতার ব্যবহার নিষিদ্ধ, নিরামিষ ভোজন সার্বজনিক, আহার স্থানে বর্ণভেদ মানাই ছিল রীতি। প্রাতে ও সায়াহ্নে ছাত্রদিগকে গায়ত্রী মন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া ধ্যানের জন্য প্রদত্ত হইত, রন্ধন ব্যতীত প্রায় সকল শ্রমসহিষ্ণু কর্ম ছাত্রদের পক্ষে আবশ্যিক।"

বর্ণাশ্রমধর্ম ও হিন্দুত্ব সম্বন্ধে এই সময়ে তিনি বিশেষভাবে চিন্তা করতে আরম্ভ করেন। এই চিন্তার ফল বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধাবলীর মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়।

প্রভাতবাবু তার বইয়ে (২য় খণ্ড ৩১ পৃঃ) একটি প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি যোগান দিয়েছেন। "ভারতবর্ষে যথার্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সমাজের অভাব হইয়াছে—দুর্গতিতে আক্রান্ত হইয়া আমরা সকলে মিলিয়াই শূদ্র হইয়া পড়িয়াছি। আমি ব্রাহ্মণ আদর্শকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প হৃদয়ে লইয়া যথাসাধ্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি (ত্রিপুরার মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেব) ক্ষত্রিয় আদর্শকে নিজের মধ্যে অনুভব করিয়া সেই আদর্শকে ক্ষত্রিয় সমাজে প্রচার করিবার সংকল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়ো।"

ব্রাহ্মণ বংশে জন্মের ফলেই তাঁর আদর্শ এভাবে রূপায়িত হতে চাইল। স্বল্পকালীন ব্রাহ্মত্ব—মাত্র এক পুরুষের—তাঁহার অঙ্গাবাস ছাড়িয়ে মর্ম অধিকার করতে পারল না। প্রভাতবাবুর আর একটি উদ্ধৃতি নিচ্ছি। (রবীন্দ্রনাথ ২য় খণ্ড—৩২ পৃঃ)

মাঝে মাঝে আমি কল্পনা করি, পূর্বকালে ঋষিরা যেমন তপোবনে কুটির রচনা করিয়া পত্নী, বালকবালিকা ও শিষ্যদের লইয়া অধ্যয়ন-অধ্যাপনে নিযুক্ত থাকিতেন, তেমনি আমাদের দেশের জ্ঞানপিপাসু জ্ঞানীরা যদি এই প্রান্তরের মধ্যে তপোবন রচনা করেন,তাঁহারা জীবিকাযুদ্ধ ও নগরের সংক্ষোভ হইতে দূরে থাকিয়া আপন আপন বিশেষ জ্ঞান-চর্চায় রত থাকেন তবে বঙ্গদেশ কৃতার্থ হয়। অবশ্য অশনবসনের প্রয়োজনকে খর্ব করিয়া জীবনের ভারকে লঘু করিতে হইবে। উপকরণের দাসত্ব হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া সর্বপ্রকার বেষ্টনহীন নির্মল আনন্দের উপর তপোনিরত মনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যেমন শাস্ত্রে কাশীকে বলে পৃথিবীর বাহিরে, তেমনি সমস্ত ভারত-বর্ষের মধ্যে এই একটুখানি স্থান থাকিবে যাহা রাজ্যেরও সমাজের সকল প্রকার বন্ধন পীড়নের বাহিরে। এখানে আমরা খণ্ডকালের অতীত—আমরা সুদূর ভূতকাল হইতে সুদূর ভবিষ্যৎকাল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া বাস করি; সনাতন যাজ্ঞবল্ক্য এবং অনাগত যুগান্তর আমাদের সমসাময়িক।

নির্মল আসনের উপর তপোনিরত মনকে প্রতিষ্ঠিত করার কথা গীতার "শুচৌদেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ" কথাগুলিরই বাংলা সংস্করণ। শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাও শাস্ত্রে কাশীকে পৃথিবীর বাহিরে বলার মর্মটুকু গ্রহণ করার মধ্যেই রয়েছে। এবার শুনুন মন্ত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব – প্রভাতবাবুর ভাষায়।

"শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হইলে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীদের যে উপদেশ দেন, তাহাও তাহার এই সময়ের সামাজিক ও ধর্মীয় মতের সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি। রবীন্দ্রনাথ মানবকদিগকে ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষিত করিয়া প্রাচীন ভারতের গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ পরিষ্কারভাবে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, "গুরুকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধা করবে, মনে বাক্যে কাজে তাকে লেশমাত্র অবজ্ঞা করবে না। শরীরকে পবিত্র রাখবে।" উপসংহারে তিনি বলিলেন, "আজ থেকে তোমরা ব্রহ্মব্রত। এক ব্রহ্ম তোমাদের অন্তরে বাহিরে সর্বদা সকল স্থানে আছেন।...প্রত্যহ অন্তত একবার তাঁকে মনে করবে। তাঁকে চিন্তা করবার মন্ত্র আমাদের বেদে আছে। এই মন্ত্র আমাদের ঋষিরা দ্বিজেরা প্রত্যহ উচ্চারণ করে জগদীশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হতেন। সেই মন্ত্র, হে সৌম্য, তুমিও একবার আমার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ কর।"
ইহার পর তিনি গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিলেন।" (৩২-৩৩ পৃঃ)

তারপর প্রভাতবাবু বলছেন। "পাঠক লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন ধর্ম-

সাধনার জন্য গায়ত্রী মন্ত্রের উপর কবির শ্রদ্ধা অপরিসীম, এ বিষয়ে তাঁহাকে রামমোহন রায় ও মহর্ষির আধ্যাত্মিক সাধনার উত্তরাধিকারী বলা যাইতে পারে। মন্ত্রের শক্তি ও সাধনায় তিনি চিরদিন শ্রদ্ধাবান, তিনি বহুবার বলিয়াছিলেন যে জীবনের চরম সংগ্রামের মুহূর্তে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্ত্রগুলির ধ্যান মানব মনকে অসীম বল দান করে। সেই কবিকেই মন্ত্রের নিন্দা ও বিদ্রূপ করিতে দেখিয়া অনেকে আশ্চর্য হইয়া যায়। তিনি যে মন্ত্রের নিন্দা করিয়াছেন, তাহা হইতেছে অভ্যস্ত শব্দের পুনরুক্তি—যে শব্দের অর্থ লুপ্ত এবং যে মন্ত্রের আবৃত্তি মাত্র পুণ্যার্জনের সোপানরূপে মানুষ ব্যবহার করে—সেই মন্ত্রের তিনি নিন্দা করিয়াছেন ; কিন্তু যে মন্ত্র মানুষ জ্ঞানত ধ্যান করে, যে অশ্রুত শব্দ, অনুচ্চারিত বাণী মানুষ স্তব্ধ হইয়া শোনে, সেই মন্ত্রের নিন্দা তো কখনও করেন নাই, বরং তাহা তাঁহার দিক হইতে সমর্থনই পাইয়াছে।" (৩৩ পৃঃ)

সুতরাং Race-ghost বা জাতীয় চরিত্রের প্রভাব যে রবীন্দ্রনাথে প্রকট এ বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না। তিনি ব্রাহ্মণ, বর্ণাশ্রমী, কৃচ্ছ্র-সাধক, ধ্যান-পরায়ণ, শাস্ত্র ও মন্ত্রে শ্রদ্ধাবান্।

আর শুধু তাই নয় বহুদেবতাবাদ বিরোধী একেশ্বর বাদী ব্রাহ্ম আচার্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অজান্তে কখন তেত্রিশ কোটি দেবতার ওপরেও আবার একটা "জীবনদেবতা" বানিয়ে বসেছেন। তাই তো বলে স্বভাব যায় না মলে। স্বভাব বদলায় না ব্রাহ্ম আচার্য্য হ'লেও। তিনি শান্তিনিকেতনের ছেলেদের সরস্বতী পূজা করতে পাঠিয়েছেন আশ্রম সীমার বাহিরে। পোষ্টমাষ্টার তার কোয়ার্টার্সে কালী পূজো করেছেন বলে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তবু নিজের মনের মধ্যেই আর একটা উপদেবতা সৃষ্টি না করে পারেন নি। তা'ছাড়া তাঁর ভারত ভাগ্যবিধাতা, বিশ্বদেব এ দু'টিও আছেন বৈ কি! তবে উপনিষদের শিক্ষায় এই সকলদেবতাই যে এক তাহাও তিনি ভোলেন নি। "যো দেবো হগ্নৌ যোহপ্‌সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ, য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।

বাল্যলীলা ও ভবিষ্যৎসম্ভাবনা

আমাদের কবি বাল্যকালে তাই মুনি বালক—ঋষি কুমার। (তিনি বালক হলেও ঋষি—আবার ঋষি হলেও বালক। এই বালক বয়সে ঋষিই হবেন —অন্য কিছু নয়, বালক সুলভ চপলতা ক্রীড়াসক্তি তাঁর যথেষ্টই আছে।

জীবনস্মৃতিতে উপনয়নের পরে একদিকে মন্ত্রের প্রতি অসীম আকর্ষণ অন্যদিকে বালকসুলভ চপলতার অতি সুন্দর বর্ণনা তিনি নিজেই দিয়েছেন। কবির বয়স তখন বারো।—

"...যথাসম্ভব প্রাচীন বৈদিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া আমাদের উপনয়ন হইল। মাথা মুড়াইয়া বীরবৌলি পরিয়া, আমরা তিন বটু তেতালার ঘরে তিন দিনের জন্য আবদ্ধ হইলাম। সে আমাদের ভারি মজা লাগিল। পরস্পরের কানের কুণ্ডল ধরিয়া আমরা টানাটানি বাঁধাইয়া দিলাম। একটা বাঁয়া ঘরের কোণে পড়িয়াছিল—বারান্দায় দাঁড়াইয়া যখন দেখিতাম নিচের তলা দিয়া কোন চাকর চলিয়া যাইতেছে ধপাধপ শব্দে আওয়াজ করিতে থাকিতাম—তাহারা উপরে মুখ তুলিয়াই আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া, তৎক্ষণাৎ মাথা নীচু করিয়া অপরাধ আশঙ্কায় ছুটিয়া পলাইয়া যাইত। বস্তুত, গুরুগৃহে বালকদিগের যেভাবে কঠোর সংযমে দিন কাটিবার কথা আমাদের ঠিক সে ভাবে দিন কাটে নাই। আমার বিশ্বাস সাবেক কালের তপোবন অন্বেষণ করিলে আমাদের মত ছেলে যে মিলিত না তাহা নহে; তারা খুব যে বেশি ভালো মানুষ ছিল তাহার প্রমাণ নাই। শারদ্বত ও শার্ঙ্গরবের বয়স যখন দশ বারো ছিল তখন তাহারা কেবলই বেদ-মন্ত্র উচ্চারণ কয়িয়া অগ্নিতে আহুতি দান করিয়াই দিন কাটাইয়াছেন, একথা যদি কোনো পুরাণে লেখে তবে তাহা আগাগোড়াই আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য নই—কারণ শিশুচরিত্র নামক পুরাণটি সকল পুরাণের অপেক্ষা পুরাতন। তাহার মত প্রামাণিক শাস্ত্র কোনো ভাষায় লিখিত হয় নাই।" (র,র - ১১ - ৩০৬-৭, জীবনস্মৃতি)।

১২৯৮ সালে লোকেন পালিতকে লিখিত পত্রগুলির (যাহা পরে "সাহিত্যে" পরিশিষ্টরূপে স্থান পাইয়াছে) এক জায়গায় (সর্বশেষের আগের প্যারায়) তিনি নিজের এই জাতিগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতনতা দেখিয়েছেন। অবশ্য হাসির ছলেই বলেছেন কথাগুলো—তবু গভীর করে বলার চাইতে তার মূল্য কম নয়। তিনি শুধু তর্কে আনন্দ পান না—এই কথাটার কারণস্বরূপ বলেছেন, আমি ব্রাহ্মণ কেবলমাত্র যুদ্ধের উৎসাহে আনন্দ পাইনে।

(র,র—৮ – ৪৮৭ পৃঃ)

ব্রাহ্মণ-জন্ম যে উপযুক্তক্ষেত্রে চরিত্রের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে সে কথা বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধে তিনি বঙ্কিমের হাস্যরসের উন্নতরুচি ও সাধারণ আদিরসাত্মক ব্যঞ্জনার

অভাব তাঁর ব্রাহ্মণত্বের ফল বলেই ধরে নিয়েছেন। তাঁর মতে ঈশ্বর গুপ্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের মধ্যে যে বিকৃতরুচির পরিচয় পাওয়া যায় সেটা তাঁরা অব্রাহ্মণ বলেই।—

"ঈশ্বর গুপ্ত যখন সাহিত্যগুরু ছিলেন সে সময়কার সাহিত্য অন্য যে কোন শিক্ষা দিতে সমর্থ হউক ঠিক সুরুচি শিক্ষার উপযোগী ছিলনা।...দীনবন্ধুও বঙ্কিমের সমসাময়িক এবং তাঁহার বান্ধব ছিলেন কিন্তু তাঁহার লেখায় অন্য ক্ষমতা প্রকাশ হইলেও তাহাতে বঙ্কিমের প্রতিভার এই ব্রাহ্মণোচিত শুচিতা দেখা যায় না।" আবার শুনুন কি ভাবে গায়ত্রী মন্ত্র পড়তে পড়তে তাঁর চোখে জল এসেছে। এবং এই অশ্রুর অর্থ তিনি নিজেই কি ভাবে করেছেন।—

"নূতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রী মন্ত্রটা জপ করার দিকে খুব একটা ঝোঁক পড়িল। আমি বিশেষ যত্নে একমনে ওই মন্ত্র জপ করিবার চেষ্টা করিতাম। মন্ত্রটা এমন নহে যে সে-বয়সে উহার তাৎপর্য আমি ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমার বেশ মনে আছে, আমি 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম। কী বুঝিতাম, কী ভাবিতাম তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে কথার মানে বোঝটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস নয়। শিক্ষার সকলের চেয়ে বড়ো অঙ্গটা বুঝাইয়া দেওয়া নহে—মনের মধ্যে ঘা দেওয়া। সেই আঘাতে ভিতরে যে জিনিসটা বাজিয়া ওঠে যদি কোনো বালককে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে বলা হয় তবে সে যাহা বলিবে, সেটা নিতান্তই একটা ছেলেমানুষি কিছু। কিন্তু যাহা সে মুখে বলিতে পারে তাহার চেয়ে তাহার মনের মধ্যে বাজে অনেক বেশি। (ঐ—পৃঃ-৩০৭)

তাই আমার একদিনের কথা মনে পড়ে—আমাদের পড়িবার ঘরের শান বাঁধানোর এক কোণে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া কেবলই জল পড়িতে লাগিল। জল কেন পড়িতেছে তাহা আমি কিছু মাত্র বুঝিতে পারিলাম না। অতএব, কঠিন পরীক্ষকের হাতে পড়িলে আমি মূঢ়ের মতো এমন কোনো একটা কারণ বলিতাম গায়ত্রী মন্ত্রের সঙ্গে যাহার কোনই যোগ নাই। আসল কথা, অন্তরের অন্তঃপুরে যে-কাজ চলিতেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সকল সময়ে তাহার খবর আসিয়া পৌঁছায় না।*

(জীবনস্মৃতি—র,র পৃঃ-৩০৯)

* পাঠক পূর্বপৃষ্ঠায় প্রভাতবাবুর কথা স্মরণ করুন। অর্থ না বোঝায় মন্ত্রের ওপর কি রবীন্দ্রনাথ বিরূপ? মন্ত্রকে যখন তিনি ব্যঙ্গ করেছেন তখন অন্য কারণ ছিল।

এই যে অন্তরের অন্তঃস্থলে মন্ত্রাঘাত এরই ফল পরবর্তীকালে দেখতে পাওয়া গেল। (বাহিরে জীবন যৌবন রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দ যখন খরস্রোতে অন্য সকলের মত কবিকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল—বাংলার গান বাংলার শোভা যখন নিত্য নূতন ছোটগল্প হয়ে কবির মানস সরসীতে ফুটে উঠছিল, আর সেই তরঙ্গে গা ভাসিয়ে গান গেয়ে—গল্প বলে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবার মত যখন আনন্দের আর কিছু আছে বলে মনে হয় নি ঠিক সেই জীবন উৎসবের মধ্যেই কবির অন্তরে বেজে উঠল বীরভূমের উষর ক্ষেত্রে কৃচ্ছ্র সাধনের ডাক। মুনিবালকের বাল্য গেল ঘুচে—বৃন্দাবন লীলা হল শেষ। কুরুক্ষেত্রের আয়োজন সুরু হল, সুরু হল প্রস্তুতির পালা তারই জন্যে। খেলা ভুলতে হল। এ কথা কবি কণ্ঠে এর আগেই আমরা শুনেছি—মানসীর সূচনায়,—যে উদ্বোধন এনেছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোটো গল্পের নিরন্তর ধারায়। সে-ধারা আজও থামত না যদি সেই উৎসবের তীরে থেকে যেতাম। যদি না টেনে আনত বীরভূমের শুষ্কপ্রান্তরের কৃচ্ছ্রসাধনের ক্ষেত্রে।

কে এনেছিল টেনে? বা কে দিয়েছিল ঠেলে। কবিই বলেছেন,

অদৃষ্টেরে শুধালেম চিরদিন পিছে
অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে?
সে কহিল, ফিরে দেখ, দেখিলাম থামি,
সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি।

এই সেই গায়ত্রী জপতে গিয়ে যার অকারণ অশ্রু ঝরেছিল সেই মুনি বালক। সোনারতরীর সোনার হরিণের পিছে ছোটা ভুলিয়ে—সেই ঠেলে এনেছিল কবিকে শান্তিনিকেতনের সাধন ক্ষেত্রে।

পরিবেশের ফল

ঋষি বালক শার্ঙ্গরব বা শারদ্বতের কণ্বমুনিতে রূপায়ণ একদিনে সম্ভব হয় নাই। ঠাকুর বাড়ীর এই রহস্যপ্রিয় বালকটিও কালের দীর্ঘপথ বেয়ে তবেই শান্তিনিকেতনের আচার্য্য গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে পরিণত হয়েছিলেন। এই পরিণতির ইতিহাস একটু বিষদভাবে আলোচনা করা দরকার।

জন্মের পরেই পারিপার্শ্বিকের স্থান। বীজ তো ভাল কিন্তু তাকে ভাল গাছ হতে হলে প্রয়োজন ভালো মাটি, ভালো সার, জল, বাতাস, আলো এবং নিরুপদ্রব অবস্থান ও বৃদ্ধির সহায়ক অবস্থা। এমন কি যে মানুষ বড় হবে তার

জীবনে ভুলভ্রান্তি এবং দুর্দৈবগুলিও তাকে তার গন্তব্যের দিকে এগিয়ে দেবে। তার জীবনে কিছুই অপচয় হবার উপায় নাই। দীর্ঘপথ এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালে শেষ পর্যন্ত গন্তব্য স্থলের কাছেও পৌঁছান সম্ভব নয়। তাইতো দেখি নেপোলিয়ানের লেখাপড়া বেশিদূর এগুল না। ভর্তি হলেন সৈনিক বিদ্যালয়ে। পড়া শেষ করে চাকরী পেলেন করপোরালের। গতানুগতিক চাকুরীতে জীবন শেষে লেফটেনাণ্ট অবস্থায় আধা মাইনের পেনশান নিয়ে বিদেয় হতে হত। তাই সেখানেও বিপদ হতে লাগল। ছুটিতে জন্মভূমি কর্শিকায় ফিরে গিয়ে বিপ্লবী দলে যোগ দিলেন। দলের কাজে এলো বিরাট সাফল্য। যুবক নেপোলিয়ান প্রধান নেতা পাওলির প্রিয়পাত্র ও দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হয়ে উঠলেন। কালে তিনিই যে পাওলির স্থলাভিষিক্ত হবেন তাতে আর সন্দেহ রইল না। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের অধিনায়ককে তো আর দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে বাঁশি বাজাতে দেওয়া চলে না, তাঁকে বৃন্দাবন ছাডাতে হয়। নেপোলিয়নকেও তাই কর্শিকা ছাড়ানো হ'ল। জ্ঞাতিভাই কে একজন পাওলির বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। তাই প্রবীণ নেতার অন্ধভক্তেরা বোনাপার্টদের কর্শিকা থেকে বিতাড়িত করল। নেপোলিয়ান মা ও বোনকে নিয়ে কোন রকমে ফ্রান্সে পালিয়ে রক্ষা পেলেন! তার পর সেখানেও একটার পর একটা দুর্দৈব এসেছে আর তার ভেতর দিয়েই নেপোলিয়ান ধাপে ধাপে উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথও তাই অনুকূল পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই বেড়ে উঠেছিলেন। আপাত দৃষ্টিতে যা প্রতিকূল মনে হয়েছে পরে তাহারই আনুকূল্য কবিকে তাঁর জীবনপথে খানিকটা এগিয়ে দিয়েছে। এভাবেই তাঁর জীবনের মহৎ পরিণতি সম্ভব হয়ে থাকবে।

পরিবেশের মধ্যে পরিবারটিই হল সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথকে কতটা প্রভাবিত করেছে সে-কথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু সকলের চোখে পড়েও পড়ে না, সেইরূপ একটি জিনিষের দিকে আমি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সে জিনিসটি হচ্ছে এই যে রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চদশ সন্তানের চতুর্দশতম। এমন ছেলের বাপ-মা ও পরিজনবর্গের আদর যত্ন খুব কমই জোটে। ফলে রবীন্দ্রনাথ ভৃত্যতন্ত্রের হাতে ফেলে দেওয়া অনাদৃত শিশুরূপেই বড় হতে লাগলেন। আহার, বিহার, বেশভূষা সব কিছুতেই ঠাকুরবাড়ীর বাড়াবাড়ি থেকে তিনি রেহাই পেলেন। ফলে তিনি হয়ে উঠলেন যাকে বলে

introvert বা অন্তরমুখী। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ছেলেদের মধ্যে আর কেউ যে রবীন্দ্রনাথ হয় নি এইখানেই তার কারণ মেলে, কেন না আগে এসে বাপ-মার আদর যত্ন তাঁরা প্রচুর পরিমাণেই লাভ করেছিলেন।

শৈশবের এই অনাদরে কবিকে দিয়েছিল তাঁর চিত্তে সন্তোষের অধিকার— অল্পে সন্তুষ্টি। সামান্য জিনিস পেলেই মন তাঁর কি আনন্দেই ভরে যেত আত্মকাহিনীতে রবীন্দ্রনাথ তা বারে বারেই উল্লেখ করেছেন। এবং এই অনাদর এবং ভোগের অপ্রাচুর্য যে তাঁর জীবনে বিশেষ উপকারে লেগেছিল তা তিনি নিজেই বুঝতে পেরেছেন। তাই তো জীবনস্মৃতিতে শুনতে পাই—

"উপকরণ প্রচুর থাকিলে মনটা কুঁড়ে হইয়া পড়ে; সে কেবলই বাহিরের উপরেই সম্পূর্ণ বরাত দিয়া বসিয়া থাকে, ভুলিয়া যায় আনন্দের ভোজে বাহিরের চেয়ে অন্তরের অনুষ্ঠানটাই গুরুতর। শিশুকালে মানুষের সর্বপ্রথম শিক্ষাটাই এই। তখন তাহার সম্বল অল্প এবং তুচ্ছ, কিন্তু আনন্দ লাভের পক্ষে ইহার চেয়ে বেশি তাহার কিছুই প্রয়োজন নাই। সংসারে যে হতভাগ্য শিশু খেলার জিনিস অপর্যাপ্ত পাইয়া থাকে তাহার খেলা মাটি হইয়া যায়।"

—(র,র—১৭—পৃঃ ২১২)

আবার তাঁর কবিতায়ও শুনি—

রাজার মতো বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে
পরাও যারে মণিরতন হার,
খেলাধূলা সমস্ত তার কোথায় যে যায় ঝরে
বসনভূষণ হয় যে বিষম ভার।

এ ছাড়া প্রাচুর্য্যের মধ্যে থেকেও দৈন্যের শিক্ষা তার কবি জীবনকে ফুটিয়ে তুলেছে। তিনি ধনীর দুলাল হয়েও শুধু ধন ও ধনলভ্য বিলাস ব্যসনে নিমগ্ন হতে পারেন নি। জোড়াসাঁকোর অতবড় বাড়ী তাঁর কাছে বন্দীশালার মতোই মনে হয়েছে। সেখান থেকে তাঁর শিশুচিত্ত মুক্তি খুঁজেছে গঙ্গাপারে পাল তোলা নৌকোয়। তেপান্তরের মাঠে, তারায় ভরা নীল আকাশে। প্রাসাদে থেকেও তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সমাদর করতে পেরেছেন। তাঁর রোমান্টিকদের মত প্রকৃতি-প্রিয়তার এই-ই উৎস। ভারতের প্রাচীন আদর্শ সর্বরিক্ত অশ্রুসিক্ত দৈন্যের দীক্ষা তিনি এই ভাবেই লাভ করেছিলেন।

দুঃখের অভিজ্ঞতা

এই অবহেলার পরিণাম কি না জানি না, দেখা গেল রবীন্দ্রনাথ স্কুলে গিয়ে পড়াশুনায় মনোযোগী হতে পারলেন না। গৃহের অনাদরে প্রাণটা শুকিয়ে আসছিল বলেই পাঠে আনন্দ খোঁজা তাঁর পক্ষে অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছিল। গৃহকোণটির মত স্কুল ঘরও তাঁর কাছে বন্দীশালা মনে হতে লাগল এবং পাঠে সরস বস্তুর অন্বেষণে তাঁর মন ব্যাপৃত হল। ফলে পাঠ্য পুস্তক অপাঠ্য হয়ে দাঁড়াল এবং শিশু রবীন্দ্রনাথ স্কুল ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু এই অযত্ন তাঁর মনে অন্যের প্রতি দরদ ও সমবেদনা এনে দিল। তাইতো দেখি নিজে স্কুলে প্রাইজ না পেয়েও ভাগিনেয় সত্যের প্রাইজ পাওয়া নিয়ে তিনি এত আনন্দ করতে পেরেছিলেন যা দেখে তাঁর গুণদাদা বিস্মিত হয়েছিলেন। জীবনস্মৃতিতে এ-ব্যাপারটা এইভাবে বর্ণিত আছে—

ইস্কুলে আমি কোনদিন প্রাইজ পাই নাই, একবার কেবল সচ্চরিত্রের পুরস্কার বলিয়া একখানা ছন্দমালা বই পাইয়াছিলাম। আমাদের তিনজনের মধ্যে সত্যই পড়াশুনায় সেরা ছিল। সে কোনো একবার পরীক্ষায় ভালোরূপে পাশ করিয়া একটা প্রাইজ পাইয়াছিল। সেদিন ইস্কুল হইতে ফিরিয়া গাড়ি হইতে নামিয়াই দৌড়িয়া গুণদাদাকে খবর দিতে চলিলাম। তিনি বাগানে বসিয়াছিলেন। আমি দূর হইতেই চীৎকার করিয়া ঘোষণা করিলাম, "গুণদাদা, সত্য প্রাইজ পাইয়াছে।" তিনি হাসিয়া আমাকে কাছে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি প্রাইজ পাও নাই?" আমি কহিলাম, "না, আমি পাই নাই, সত্য পাইয়াছে।" ইহাতে গুণদাদা ভারি খুশি হইলেন। আমি নিজে প্রাইজ না পাওয়া সত্ত্বেও সত্যর প্রাইজ পাওয়া লইয়া এত উৎসাহ করিতেছি ইহা তাঁহার কাছে বিশেষ একটা সদগুণের পরিচয় বলিয়া মনে হইল। তিনি আমার সামনেই সেকথাটা অন্য লোকের কাছে বলিলেন।...এইরূপে আমি প্রাইজ না পাওয়ার প্রাইজ পাইলাম—

—(র,র—১৭—৩৩৬ পৃঃ)

দেশে লেখাপড়ার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হলে পিতা দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে ব্যারিষ্টারি পড়বার জন্য বিলাতে পাঠান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ব্যারিষ্টার না হয়েই ফিরে এলেন। ক্ষুব্ধ পিতা তাই পুত্রের শাস্তি বিধান করলেন; জমিদারী দেখতে হবে। যে ছেলের আর কিছু হল না, সে বাড়ীর দেখাশুনো করবে না তো আর কি করবে? কিন্তু এখানেও রবীন্দ্রনাথের শাপে বর হল।

তিনি ব্যারিষ্টার হলে অন্য দশজন ব্যারিষ্টারের মতই হয়ত মামলার আরজি, জবাব, বর্ণনা লিখে জীবন কাটাতেন, লক্ষ্মীর সাধনায় সাফল্য এলেও সরস্বতীর সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে যেত চিরতরে। যে ছেলে গীতাঞ্জলি লিখে নোবেল পুরস্কার পাবে ব্যারিষ্টারীর চড়ায় তার নৌকো আটকালে চলবে কেন? আর জমিদারী দেখতে গিয়ে কি লাভ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ নিজেই তার বর্ণনা দিয়েছেন।

—"বাংলা দেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নূতনত্ব চলন্ত বৈচিত্র্যের নূতনত্ব। শুধু তাই নয়, পরিচয়ে-অপরিচয়ে মেলামেশা করেছিল মনের মধ্যে। বাংলা দেশকে তো বলতে পারিনে বেগানা দেশ, তার ভাষা চিনি, তার সুর চিনি। ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্দর মহলে আপন বিচিত্ররূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানাশোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে। যে উদ্বোধন এনেছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোটো গল্পের নিরন্তর ধারায়। সে ধারা আজও থামত না যদি সেই উৎসবের তীরে থেকে যেতুম।

(সূচনা—মানসী)

কিন্তু ছোটো গল্পের রবীন্দ্রনাথ তো ছোটো রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ভাগ্য বিধাতা তাঁকে অতো ছোটো হয়ে থাকতে দেবেন না তো। তাই শিলাইদহ থেকে রবীন্দ্রনাথকে আবার অন্যত্র যেতে হল— যেতে হল বোলপুরের ঊষরক্ষেত্রে কৃচ্ছ্রসাধনায়। আর এই সাধনা করেই তবে বড়ো হতে হল। বড়ো—বিরাট—যে জন্য আজ তাঁকে বলি বিশ্বকবি —ঋষি—গুরুদেব। সুখ তার জন্য নয়। বৃহৎ পরিণতি তাকে নিয়তির মত ঠেলে নিয়ে চলেছে। দুর্বার তার বেগ—অনস্বীকার্য্য আহ্বান।

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তুমি সুখে থাকতে দেবে না যে,
দিবা নিশি তাই তো বাজে
হৃদয় মাঝে এমন কঠিন সুর।

কিন্তু কাঠিন্য সত্ত্বেও সুরের অস্তিত্ব তিনি ভোলেন নি। তাঁর শ্রবণ এড়ায় নি।—

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি,
সে কি সহজ গান।

সেই সুরেতে জাগব আমি
দাও মোরে সেই কান।
ভুলব না আর সহজেতে,
সেই গানে মন উঠবে মেতে
মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে
যে অন্তহীন প্রাণ।
আরাম হতে ছিন্ন করে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান।

এবং মৃত্যুকে ডেকে বলেছেন,—

যদি নয়নে জড়ায়ে অবসাদ
আমি শুয়ে থাকি সুখ শয়নে
তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয় শ্বাস ভরণ,
ও গো মরণ, হে মোর মরণ।

দুঃখ এসেছে, মৃত্যু এসেছে, কবি সাংসারিক জীবনে সুখে থাকেন নাই। স্ত্রী বিয়োগ, একটি সন্তানের অকাল মৃত্যুও হয়েছিল। অপর সন্তানেরাও কেউ তাঁকে সুখী করেন নাই। নিজেরা অসুখী হয়ে পিতার দুঃখের কারণ হয়েছেন। শেষ পর্য্যন্ত স্বামী পরিত্যক্তা মীরার যুবক পুত্রের বিদেশে অকাল মৃত্যুও কবিকে সহ্য করতে হয়েছিল। এবং যিনি বংশ-গৌরব কখনও ভুলতে পারেন নি, দৌহিত্রী নন্দিতা নিঃসন্তান রইলেন দেখে স্ববংশলোপও তাঁকে প্রত্যক্ষ করে যেতে হল। তাইতো বিদায়ের পূর্বেও তাঁকে স্মরণ করতে হল—স্বীকার করতে হল—

দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে;

যদিও এই দুঃখকে অস্বীকার করতে তিনি কত চেষ্টাই না করেছেন, কতবার অস্বীকারও করেছেন,—

তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে যতদূরে আমি ধাই—
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু কোথা, বিচ্ছেদ নাই।

কিন্তু দুঃখকে স্বীকার করলেও তার কাছে অবনত হন নাই। দুঃখের চাপে কখনও ভেঙ্গে পড়েন নাই। বরং অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গলের খোঁজ করেছেন।—

যত আশ্রয় ভেঙে ভেঙে যায়, স্বামী,
এক আশ্রয়ে রহে যেন চিত লাগিয়া।
যে অনল তাপ যখনি সহিব আমি
দেয় যেন তাহে তব নাম বুকে দাগিয়া।

আর দুঃখই জাগিয়ে তুলেছে নূতন জিজ্ঞাসা—নূতন প্রশ্ন। উদ্ভাবন করেছে নূতন সমাধান।

এমন একান্ত করে চাওয়া
সেও সত্য যতো,
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেই মতো।
এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল
নহিলে নিখিল,
এতবড়ো নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসি মুখে এতোকাল কিছুতে বহিতে পারিত না।

গৃহে সন্ন্যাসী

বাংলা ১৩০৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীর মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৪১ বৎসর, মৃণালিনীদেবীর ২৯। এই অল্প বয়সে স্ত্রী বিয়োগের ফল হল শুভাশুভ মিশ্রিত। অন্যের বেলায় কি হতে পারতো বলা শক্ত। তবে আশ্রমজীবন যাপন প্রয়াসী রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই অমঙ্গলের মধ্যে একটা বিরাট মঙ্গল-সঙ্কেত লুক্কায়িত ছিল। এক কথায় স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি পরিপূর্ণ আশ্রমিক হয়ে উঠলেন—বৈরাগী সন্ন্যাসী। সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হল না, সংসারই তাঁকে ত্যাগ করে সন্ন্যাসী করে দিল, তিনি জানতেও পারলেন না। বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি তিনি কামনা করেন নি। অসংখ্য বন্ধনই তাঁর মুক্তির স্বরূপ বলে তিনি মনে করতেন। কিন্তু সেই অসংখ্যের শত্রু ছিল এক বন্ধন। তাঁর ভাগ্যবিধাতা সেই বড় বন্ধনটি ছিন্ন

করে দিলেন, তখন সত্যই তাঁর গৃহের বণিতা বিশ্বের কবিতারূপে উদয় হতে পারলেন। অভ্যাসে কর্মে চিন্তায় রবীন্দ্রনাথও পরিপূর্ণভাবে সাধনার জীবন গ্রহণ করলেন। শান্তিনিকেতনে কৃচ্ছ্রসাধনের উদ্দেশ্যেই তিনি এসেছিলেন, সেই সাধনার যা কিছু অন্তরায় স্ত্রীবিয়োগের সঙ্গে তার সমস্তটাই দূর হয়ে গেল।

এ আঘাত রবীন্দ্রনাথেরও ভাল লাগে নাই। কিন্তু ভালো লাগুক আর না-লাগুক তা এসেছিল। এবং এসেছিল বলেই তার যা পরিণাম তাও ঘটতে বাধ্য হল। তারপর একদিন রবীন্দ্রনাথ যখন বুঝলেন তাঁর জীবন দেবতার গূঢ় উদ্দেশ্য তখন দুঃখের সঙ্গেও তার সেই নিষ্ঠুরতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। বুঝেছিলেন ভগবান্ তাঁর সখের উপাসনায় খুশী হলেন না। ঘর-বাড়ী স্ত্রী-পুত্র সব গুছিয়ে রেখে অবসর সময়ের সৌখীন ধর্ম্ম চর্চ্চায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন না। তাই নিষ্ঠুরের মত তিনি ছিনিয়ে নেন সাধককে এইসব বন্ধন হতে। তাই একদিন ভয়ে ভয়ে তিনি স্বীকার করেছিলেন—

তোমার প্রেম যে বইতে পারি এমন সাধ্য নাই,
এ সংসারে তোমার আমার মাঝখানেতে তাই
কৃপা করে রেখেছ নাথ অনেক ব্যবধান,
দুঃখসুখের অনেক বেড়া, ধন, জন, মান।

তারপর তিনি যখন সেই ব্যবধান ঘুচিয়ে দিতে চাইলেন নিজের হাতে, তখন আত্মসমর্পণের পর বললেন,

একটি পুষ্পের কলি,
এনেছিনু দিব বলি,
হায়, তুমি চাও সমস্ত বনভূমি,
লও, তাই লও তুমি।

সেই সমস্ত বনভূমি বা মনোভূমি তাঁকে দিয়ে, তবেই নিষ্কৃতি।

রবীন্দ্রনাথের যা কিছু অর্থকরী প্রচেষ্টা সবই এই স্ত্রীবিয়োগের পূর্ব পর্য্যন্ত। আমরা হয়ত ভুলে যাই যে অর্থের জন্য রবীন্দ্রনাথ পাটের ব্যবসায় পর্য্যন্ত আরম্ভ করেছিলেন। তারপর তিনলক্ষ টাকা লোকশান দিয়ে পরে শান্ত হয়ে বসলেন। এবং শান্তমনে এ সম্বন্ধে ব্যঙ্গকরে বলতেও পেরেছিলেন, আমি কবি—

আকাশে জাল ফেলে তারা ধরাই আমার ব্যবসা,
থাকগে তোমার পাটের হাটে মথুর কুণ্ডু শিবুসা।

—এই দুই নামীয় ভদ্রলোক বড় পাটের ব্যবসায়ী ছিলেন। এরা রবীন্দ্রনাথের জমীদারীর প্রজা ছিলেন। এদের কাছে টাকা ধার করেই রবীন্দ্রনাথ বড় স্কেলে পাটের ব্যবসা ফেঁদেছিলেন। এরপর যা কিছু অর্থ প্রচেষ্টা তা বিশ্বভারতীর জন্য। নিজের জন্যে নয়।

স্ত্রীবিয়োগের পর এই অর্থ চেষ্টা শান্ত হয়ে আসে। জনের সঙ্গে ধনের লিপ্সাও যায় কেটে। আর মান—তা পেয়ে পেয়ে কিছুদিনের মধ্যেই তারও কোন চাকচিক্য আর রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল না। সুতরাং এক স্ত্রীবিয়োগকে উপলক্ষ্য করেই ধনজনমানের তিন বেড়া একসঙ্গে ভেঙে পড়ল।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের আচার্য্যের পদ পূর্বেই গ্রহণ করেছিলেন। এবার তিনি আশ্রমের গুরুদেব হলেন। আশ্রম জীবন তাঁর নিশ্ছিদ্র হল। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান, প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে উপাসনা, ভ্রমণ, পঠন-পাঠন—ঘড়ির মত অনলস ভাবে, নিত্য নৈমিত্তিক জীবনধারার অঙ্গ হয়ে গেল। কবি সাধকে রূপান্তরিত হলেন। তাঁর মনের আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ।

এবার আমায় লহ হে নাথ লহ।

তাঁর প্রশ্ন—আমার কণ্ঠে তোমার গান কি বাজে? তাঁর প্রার্থনা—

আমারে করো তোমার বীণা, লহ গো লহ তুলে।
উঠিবে বাজি তন্ত্রীরাজি মোহন আঙ্গুলে॥

এমন কি তাঁর কবি হিসেবে বিশেষ অস্তিত্বটিও তিনি হারাতে চান—

এবার নীরব করে দাওহে তোমার মুখর কবিরে,
তার হৃদয় বাঁশি আপনি কেড়ে বাজাও গভীরে।
নিশীথরাতের নিবিড় সুরে
বাঁশিতে তান দাওহে পূরে,
যে তান দিয়ে অবাক কর গ্রহ শশীরে।

আর সেই তান শুনে—

যা কিছু মোর ছড়িয়ে আছে জীবনমরণে
গানের টানে মিলুক এসে তোমার চরণে।
বহুদিনের বাক্যরাশি এক নিমেষে যাবে ভাসি
একলা বসে শুনব বাঁশি অকূল তিমিরে।

আর সাধনার কি পরিপূর্ণ চিত্রই না ফুটে উঠেছে এই গানগুলোর মধ্যে। দিবসে নিশিতে অবিরাম চলেছে সাধনা—

নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে
ওগো অন্তরযামী,
প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়া
তোমারে হেরিব আমি।
জাগিয়া উঠিয়া শুভ্র আলোকে
তোমারি চরণে নমিয়া পুলকে
মনে ভেবে রাখি দিনের কর্ম
তোমরে সঁপিব স্বামী।

তারপর দিনের কর্ম সাধিতে সাধিতে ক্ষণে ক্ষণে সাধকের মনে হতে থাকে তিনি কর্ম অন্তে সন্ধ্যেবেলায় তাঁর সঙ্গে বসবেন। এবং—

সন্ধ্যে বেলায় ভাবি বসে ঘরে
তোমারই নিশীথ বিরাম সায়রে।
শ্রান্ত মনের ভাবনা বেদনা
নীরবে যাইবে নামি।

আর গানগুলো শুধু ক্ষণিকের ভাবনা হতে পারে, কিন্তু এই গানটি যে কবির এ সময়কার সাধনার দিবারাত্রির ইতিহাস তাতে আর যারই থাক আমার কোন সন্দেহ্ নাই।

সন্ন্যাস ও স্বধর্ম

এই যে অহোরাত্রের সাধনা এতো নিষ্ফল হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথও তার ফল পেয়েছিলেন। কিন্তু সমস্তটা ফল পান নাই। তার কারণ সেই যাদৃশী ভাবনাযস্য, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। আর রবীন্দ্রনাথের পারিপার্শ্বিকতাই তার জন্য দায়ী। তিনি কবি, তিনি ব্রাহ্ম—তিনি সংস্কারক। তাঁর পক্ষে বৈরাগ্যের সাধনা অসম্ভব। সেই কথাই তো তিনি অবশেষে স্বীকার করলেন।

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মা'ঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।

তখন নিভৃত সাধনা তাঁকে আর ধরে রাখতে পারল না। বিশ্বের কর্মচক্র তাঁকে টেনে ধরল,

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেই খানে যোগ তোমার সাথে আমারো।

শেষের কবিতার কেতকী মিত্রের মত তার স্রষ্টাও বলতে পারেন,

সেই ধাবমান কাল
জড়ায়ে ধরিল মোরে ফেলি তার জাল।

এই প্রসঙ্গে মনে পরে Tennyson-এর Holy Grail-এর গল্প। রাজা অর্থারের নাইটগণ Camelot-এ উৎসব করছিলেন। তাদের পুণ্যকর্মের ফলে মুহূর্তের জন্য Holy grail অর্থাৎ যীশুখৃষ্টের পবিত্র রক্তধারক পাত্রটি দেবদূতদের দ্বারা বাহিত হয়ে চকিতে ঐ Knightদের দর্শন দিয়ে গেল। চির দিনের মত ঐ Holy Grailকে ধরে রাখতে হলে চাই সাধনা, বৈরাগ্য—সেই বিবিক্ত দেশ সেবিত্বমরতির্জন সংসদি। হঠাৎ উৎসাহের মাথায় যোদ্ধৃবৃন্দ শপথ গ্রহণ করলেন যুদ্ধ ছেড়ে তারা নির্জন সাধনা করবেন এক বৎসর কাল। করলেনও তাই, কিন্তু এই সাধনাই তাদের কাল হল। অস্ত্রের জোরে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে তারা ধর্মরাজ্য স্থাপন করেছিলেন ; কিন্তু অহিংসা, ত্যাগ ও উপবাস ব্রহ্মচর্য্যাদি পালন করতে গিয়ে তারা নাজেহাল হয়ে পড়লেন। দু' একদিন পরেই সকলে বুঝতে পারলেন ওপথ তাদের নহে। তখন যে যারমত অন্য জীবনে শটকে পড়লেন। রইলেন শুধু Sir Galahad এবং Sir Percival. এমন কি বীরশ্রেষ্ঠ Lancelot তো পাগলই হয়ে গেলেন। তার জীবনে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ই বলি,—

জড়িয়ে গেছে সরু মোটা দুইটি তারে,
জীবন বীণা ঠিক সুরে আর বাজে নারে।

সেই সরু মোটার জট ছাড়াতে গিয়ে তার কী দুর্গতি! সুতরাং ফল এই যে বর্ষশেষে যখন Knightরা আবার Camelot-এ মিলিত হল তখন দেখা গেল তারা কেহই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে পারেন নি, একমাত্র Sir Galahad ছাড়া, যিনি মহানির্বাণ লাভ করে চলে গেছেন। এবং তাদের দ্বারা সমাজ সেবাও আর সম্ভব নয়। তারা বুঝি সেই অর্জ্জুনের দুর্ভাবনার দশা প্রাপ্ত হয়েছেন—

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্ট ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি।

তাদের শ্যামও গেল কূলও গেল।

রবীন্দ্রনাথেরও সেই ভয় হল। তিনি কবি—পরকালের ডাক শুনলে তাঁর চলবে কেন? তিনি বরং সৃষ্টির রস প্রকাশ করবেন। তিনি বুঝলেন,

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাব নিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্।

আমরা পূর্বেই দেখেছি কবির বয়স কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে এবিষয়টি প্রকাশ করেছেন।

আর তাতে ফল কিছু খারাপ হয়নি। ভগবান যাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেবেন, তাদের তিনি ভাবসমাধি দেন না। বা দিলেও সামান্য একটু চাখ্‌তে দিয়ে আবার রেখে দেন। যেমন হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের বেলায়। তাঁকে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক কাজ করিয়ে নেবেন, সুতরাং অন্যান্য গুরুভাইদের নানান দিব্য ভাববিভূতি এলেও নরেন্দ্রের কিন্তু এলো না। তখন তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন, গুরুকে জানালেন নালিশ। তারপর হঠাৎ একদিন এলো ভাবের বন্যা, সমাধি। তিনি দেখলেন তাঁর দেহ নেই আছে শুধু একটি মস্তক। বিশ্বচরাচর এক হয়ে যাচ্ছে তার চোখে। ভয়ে চীৎকার করে বললেন, আমার কী হল। তখন আবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তার ভাব কেড়ে নিলেন, বললেন, চাবিকাঠি রইল আমায় কাছে, পরে সময় হলে পাবে। এবার লোক শিক্ষা দিতে হবে তোমায়। নরেন্দ্রনাথ প্রচণ্ড আপত্তি করলেন, তিনি ওসব ঝামেলা পোহাতে পারবেন না। কিন্তু পারবনা বললেই তো আর ছাড়া নেই। ঠাকুর বললেন, তুই পারবি না তোর ঘাড় পারবে।

তাইতো বিশ বছর গোটা ভারতবর্ষ ও সমগ্র ইউরোপ আমেরিকা চষে বেড়াতে হল স্বামী বিবেকানন্দকে।

তাইতো যে রবীন্দ্রনাথ অমন করে সাধনায় অবতীর্ণ হলেন তাঁকে আবার জীবনের রসে ডুবতে হল। তিনিও তো সাধনার ফলে সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, তা সে যত ক্ষণিকের জন্যই হোক না কেন।

বক্ষ সহসা উঠিয়াছে দুলি,
অকারণে আঁখি উঠেছে আকুলি,
বুঝেছি হৃদয়ে ফেলেছো চরণ চকিতে।

(আবার এখানে বলে রাখতে বাধ্য হচ্ছি যে এই লাইনগুলোতে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় আধ্যাত্মানুভূতিই ব্যাক্ত হয়েছে। যারা অস্বীকার করবেন, আমি তাদের কথা মানতে পারবো না।)

কিন্তু এই ক্ষণিক আন্দোলনের ভেতর দিয়েই তাঁর সঙ্গে কবির পরিচয়। পূর্ণ পরিচয় কখনও হয় নাই। তাই তো শেষপর্য্যন্ত তাঁকে লজ্জিত হয়ে স্বীকার করতে হয়েছে,—

তোমায় চিনি বলে আমি করেছি গরব
লোকের মাঝে।
মোর আঁকা পটে দেখেছে তোমায়
অনেকে অনেক সাজে।

কিন্তু এ দেখা যে অতি ক্ষণিকের, অতি অস্পষ্ট দর্শন; তাই আজ লজ্জিত হলেও স্বীকার করতে হচ্ছে নিজের অজ্ঞতা। কিন্তু একেবারে অজ্ঞতা কি?—

তোমায় চিনিনা জানিনা একথা বলো তো
কেমনে বলি?
ক্ষণেক্ষণে তুমি উঁকি মারি চাও,
ক্ষণেক্ষণে যাও ছলি।

তবে এই ক্ষণিক মিলন ও দীর্ঘ বিরহের মধ্যেই সাধনার আনন্দ এবং সার্থকতা। তিনি দেখা দিয়ে মুখ লুকান, তাইতো মানুষ আবার তাঁকে চায়* এবং পেতে চেষ্টা করে। তিনি যে আছেন, তিনি যে আকাঙ্ক্ষার বস্তু তা তাঁকে না দেখলে কি করে বোঝা যাবে। তাই তিনি আগাম দেখা দিয়ে ভক্তের হৃদয় দুলিয়ে দিয়ে যান। ভক্ত তখন তাঁর পিছে পিছে ছোটে। আর তখনই কভু বা আশায় কভু নিরাশায় তার প্রাণে বিচিত্র সুর খেলতে থাকে। কখনও দেখে তিনি নাই তাই ত্রিভুবন অন্ধকার—নন্দপুর চন্দ্রাবিনা বৃন্দাবন অন্ধকার, আবার কখনও দেখে তিনি তমালে, যমুনার জলে মেঘের কালোয়, আঁধারের

* ফরাসী মিষ্টিক পাশকালও বলেছেন, ভগবানের সাক্ষাৎ না পেলে কখনও তুমি ভগবানের সন্ধান করতে না।

আলোয় মিলিয়ে রয়েছেন. তিনি সত্যই বৃন্দাবন ছেড়ে একপাদও দূরে যান নি। তাইতো রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন,

তোমায় নূতন করে পাবো বলে হারাই ক্ষণেক্ষণ
ও মোর ভালোবাসার ধন।

এই পাওয়া আর হারানোই তো গানের উৎস। এবং সত্যিকারের কবির গান এই উৎস থেকেই ঝরে পড়ে—এই তার প্রকৃত অর্থ।

কবি যত কথা কহে আপনার গানে
নানা জনে নানা অর্থ লয় তার টানি,
তোমা পানে ধায় তার শেষ অর্থ খানি।

রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীরই কবি—অন্ততঃ তাঁর উচ্চতম কবিতাগুলিতে এবং শ্রেষ্ঠতম কবিকর্মে ও অভীপ্সায়।

রাজা নাটক

রবীন্দ্রনাথের সাধনার শেষ ফল "রাজা" নাটকখানি। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক রাজ্যের তিনি যা কিছু পেয়েছেন বা বুঝেছেন তা সমস্তই এই নাটকের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য্যের পূজারী। সাধক হয়েও তাই তিনি সুন্দরের সাধনা করেছেন। তাঁর ঈশ্বর সুন্দর।

ওগো সুন্দর মম গৃহে আজি
পরম উৎসব রাতি।……
সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে
সোণার বরণ পারিজাত লয়ে হাতে।……
হে মোর সুন্দর যেতে যেতে
পথের প্রমোদে মেতে
কারা সবে তব গায়ে ধূলা দিয়ে যায়।……
সুন্দর তুমি চক্ষু ভরিয়া
এনেছ অশ্রুজল।……

সত্য ও শিব রবীন্দ্রনাথের নিকট সুন্দরের মূর্ত্তিতেই আবির্ভূত হয়েছিলেন।

অন্ততঃ তিনি তাদের সুন্দর রূপেই কল্পনা করেছেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যেই দেখেছেন সত্যের প্রকাশ।

জ্যোৎস্না নিশীথে পূর্ণ শশীতে
দেখেছি তোমার ঘোমটা খসিতে।

কিন্তু সত্য যে শুধু সুন্দর নয় সে যে ভয়ঙ্করও। শিবের যে রুদ্রমূর্ত্তি আছে এ কথা জীবনপথে অগ্রসর হলে বেশিদিন না জেনে থাকা যায় না। তাই একদিন প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডব দেখে কবি প্রকৃতিকে চিনলেন।—

জন্মেছি তোমার মাঝে ক্ষণিকের তরে,
অসীম প্রকৃতি। সরল বিশ্বাস ভরে
তবু তোরে গৃহ বলে মাতা বলে মানি।
আজ সন্ধ্যাবেলা তোর নখদন্ত হানি
প্রচণ্ড পিশাচরূপে ছুটিয়া গর্জিয়া
আপনার মাতৃবেশ শূন্যে বিসর্জিয়া
কুটি কুটি ছিন্ন করি, বৈশাখের ঝড়ে
ধেয়ে এলি ভয়ংকরী ধূলি পক্ষ 'পরে,
তৃণসম করিবারে প্রাণ উৎপাটন।

তখন আর বক্ষে বাঁশি শোনার কান রইল না। রুদ্রের তাণ্ডব দেখে প্রাণ আর্ত্ত হয়ে উঠল। কে ঐ ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপ?—

সভয়ে শুধাই আজি, হে মহাভীষণ,
অনন্ত আকাশপথ রুধি চারিধারে
কে তুমি সহস্র বাহু ঘিরেছ আমারে?

(চৈতালি—অজ্ঞাতবিশ্ব)

অর্জ্জুনের বিশ্বরূপদর্শন কবির মনে পড়েছিল নিশ্চয়, সহস্রবাহু কথাটা তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

আবার দেখুন "ভয়ের দুরাশা" কবিতায় কবি বলছেন,

জননী জননী বলে ডাকি তোরে ত্রাসে
যদি জননীর স্নেহ মনে তোর আসে
শুনি আর্তস্বর। যদি ব্যাঘ্রিনীর মতো
অকস্মাৎ ভুলে গিয়ে হিংসা লোভ যত
মানব পুত্রেরে কর স্নেহের লেহন।

নখর লুকায়ে ফেলি পরিপূর্ণ স্তন
যদি দাও মুখে তুলি, চিত্রাঙ্কিত বুকে
যদি ঘুমাইতে দাও মাথা রাখি সুখে।
এমনি দুরাশা।

তখন বিশ্বের সত্যকে বলছেন, দেখতে পাচ্ছেন ভয়ংকররূপে—

আছ তুমি লক্ষ কোটি
গ্রহ তারা চন্দ্র সূর্য্য গগনে প্রকটি
হে মহামহিম। তুলি তব বজ্র মুঠি
তুমি যদি ধর আজি বিকট ভ্রূকুটি,
আমি ক্ষীণ ক্ষুদ্রপ্রাণ কোথা পড়ে আছি,
মা বলিয়া ভুলাইব তোমারে পিশাচী।

(চৈতালি—ভয়ের দুরাশা)

মনে পড়ে একজন ইংরাজ সমালোচকের ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সমালোচনা। তিনি বলেছেন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ইউরোপের সাজানো বাগানে বসে মনে করতেন প্রকৃতির ক্রোড়ে বসে আছেন। আর ভাবতেন, আঃ প্রকৃতি কি সুন্দর, কি মধুর তার মাতৃস্নেহ! কিন্তু হত যদি আফ্রিকা বা হিমালয়ের জঙ্গল, হাত জোড় করে প্রকৃতি মার সৌন্দর্য দেখতে দেখতে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ দেখতে পেতেন Tennyson-এর দেখা মূর্তি Nature red in tooth and claw—রক্তদন্তিকা ও রক্তনখরা ভয়ঙ্করী মূর্তি।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের এই সত্যকে শিব এবং সুন্দর ছাড়া রুদ্র ও অসুন্দররূপে দেখার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। তিনি বয়সে বড় হয়েছেন, অভিজ্ঞতায় বড় হয়েছেন, জ্ঞানেও। সুতরাং অপরিপক্ক মতগুলো কিছু কিছু বদলাবেন বৈকি প্রয়োজনমত। তাই দেখতে পাই রাজার প্রথম দৃশ্যেই সত্য যে সুন্দর নয় তার স্বীকৃতি।

রাজাকে দেখতে কেমন রাণী সুদর্শনার এই প্রশ্নের উত্তরে সুরঙ্গমা বলছে—

"আমি সত্যি বলছি রাণী, ভালো করে বলতে পারব না। তিনি কি সুন্দর? না, লোকে যাকে সুন্দর বলে তিনি তা নন।

সুদর্শনা। বলিস কী? সুন্দর নন?

সুরঙ্গমা। না রাণীমা। সুন্দর বললে তাঁকে ছোটো করে বলা হবে।"

সুদর্শনা। তোর সব কথা ওই একরকম। কিছু বোঝা যায় না।

সুরঙ্গমা। কি করব মা, সব কথা তো বোঝান যায় না। বাপের বাড়ীতে অল্পবয়সে অনেক পুরুষ দেখেছি, তাদের সুন্দর বলতুম। তারা আমার দিন-রাত্রিকে আমার সুখ-দুঃখকে কী নাচন নাচিয়ে বেড়িয়েছিল সে আজও ভুলতে পারি নি। আমাদের রাজা কি তাদের মতো সুন্দর! কখখনো না।

সুদর্শনা। সুন্দর নয়?

সুরঙ্গমা। হাঁ। তাই বলব—সুন্দর নয়।...

তবে কি রকম তিনি? কি সম্পর্ক তাঁর মানুষের এবং মানুষের জগতের সাথে? এই সব প্রশ্নের উত্তর আছে রাজা নাটকে।

রবীন্দ্রনাথ ভগবানকে রাজা বলে সম্বোধন করেছেন অনেক জায়গায়। যেমন—

যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু,
আমার দ্বার ভেঙ্গে তুমি এসো মোর প্রাণে—
তুমি ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।

যদি কোনদিন তোমার আসনে
আর কাহারেও বসাই যতনে
চির দিবসের হে **রাজা** আমার তুমি ফিরিয়া যেয়ো না তবু।...

রাজভয় কার লাগি হে **রাজন**,
তুমি যার বিরাজো অন্তরে।......
তব সিংহাসনের আসন হতে এলে তুমি নেমে—

তাই তো তুমি **রাজার রাজা** হয়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি'
ফিরছ কত মনোহরণ বেশে
প্রভু, নিত্য আছ জাগি।......

আর ঈশ্বর মানেই তো রাজা। ভগবান জগতের ঈশ্বর, সকলের রাজা। তিনি কিন্তু থাকেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। অপ্রকাশ হয়েও তিনি জগত চালাচ্ছেন। তাই কেউ কেউ বলে থাকে ভগবান বলে কেউ নেই। পুরুত

বামুনের দল ওই নামটা করে নিজেদের রুজি রোজগার নির্বাহ করে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও একদিন এদের নিন্দে করেছেন।—

তারা তোমার নামে বাটের মাঝে
মাশুল লয় যে ধরি,
দেখি শেষে ঘাটে এসে
নাইকো পারের কড়ি।
তারা তোমার কাজের ভাণে
নাশ করে গো ধনে প্রাণে,
সামান্য যা আছে আমার—
লয় তা অপহরি।

কিন্তু হলে কি হবে। এ রাজ্য যে অরাজক নয় তা বুঝতে আর কতদিন লাগবে? রবীন্দ্রনাথও বুঝতেন এবং বুঝলেন।

ঈশ্বরের রাজ্য এইভাবেই চলে। তাঁকে কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু তাঁর নামে পুরোহিত-গুরুরা সকলকে চালান। তাঁর অস্তিত্ব যারা অনুভব করে তারাও তাঁকে দেখতে পায় না। রাণী স্বয়ং তার দেখা পান অন্ধকার ঘরে। তার ইচ্ছা রাজাকে দেখবেন। নিশ্চয়ই তিনি অসামান্য রূপবান্।

উৎসব হচ্ছে রাজার নামে। কিন্তু সেখানেও তাঁর দেখা নাই। দেখতে সুন্দর সুবর্ণ রূপের জোরে রাজা বলে চলে গেল। ধরাও পড়ল নকল বলে কারও কারও কাছে। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। রাণী স্বয়ং মালা পাঠালেন সুন্দর দেহধারী সুবর্ণকে।

একমাত্র দাসী সুরঙ্গমা রাজাকে জানে। সে পরিষ্কার রাখে তাঁর অন্ধকার ঘরখানি। কথা কয় তাঁর সাথে, জানে তাঁর স্বভাব। বোঝে তাঁর ব্যবহার। রাণীকে সে যথাসাধ্য বোঝায়।

কাঞ্চীরাজ শক্তিমান সামন্ত রাজা। রাজদর্শন তারও আকাঙ্ক্ষা। রাজাকে আত্মপ্রকাশে বাধ্য করার অভিপ্রায়ে এবং কিছুটা রাণী সুদর্শনার লোভেও বটে তার সৈন্যরা দেয় রাজধানীতে আগুন লাগিয়ে। সেই আগুনে পুড়ে মরে মিথ্যা রাজার মুখোস। রাণী ফিরে যান প্রাসাদে। বুঝতে পারেন ভুল। সেই সময় দেখা হয় রাজার সাথে! কী ভয়ঙ্কর কালো! কী ভীষণ মূর্ত্তি!

রাজা। কেমন দেখলে রাণী?

সুদর্শনা। ভয়ানক, সে ভয়ানক। সে আমার স্মরণ করতেও ভয় হয়। কালো, কালো, তুমি কালো। আমি কেবল মুহূর্তের জন্য চেয়েছিলুম। তোমার মুখের ওপর আগুনের আভা লেগেছিল —আমার মনে হল ধূমকেতু যে-আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মতো তুমি কালো—তখনই চোখ বুজে ফেললুম, আর চাইতে পারলুম না। ঝড়ের মেঘের মতো কালো—কূলশূন্য সমুদ্রের মত কালো, তারই তুফানের উপরে সন্ধ্যার রক্তিমা।

বিজ্ঞানও বলে তাই। মহাকাশ অনন্ত অন্ধকার। তার মাঝে মাঝে তারার দীপ জ্বালা। সূর্য্যও একটা তারা। সেই তারার আলোতে দিনে পৃথিবী একরকম দেখায়। রাত্রে দেখা যায় জগতের সত্যরূপ্। রবীন্দ্রনাথ জানতেন সব।—

কহিলেন বসুন্ধরা, দিনের আলোকে
আমি ছাড়া আরা কিছু পড়িত না চোখে।
রাত্রে আমি লুপ্ত যবে, শূন্যে দিল দেখা
অনন্ত এ জগতের জ্যোতির্ম্ময়ী লেখা।

হে অনন্ত কালো, ভীরু এ দীপের আলো,
তারি ছোটো ভয় করিবারে জয় অগণ্য তারা জ্বালো।

অন্ধকার ঘরটি নিশ্চয়ই মানুষের অন্তর-হৃদয়। সেখানেই রাজার আসা-যাওয়া। তবে তাঁর আগমন টের পাওয়া যায়। অন্ততঃ সুরঙ্গমা পায়। গন্ধও পাওয়া যায়।

সুরঙ্গমা। ওই যে মা একটা হাওয়া আসছে।

সুদর্শনা। হাওয়া? কোথায় হাওয়া?

সুরঙ্গমা। ওই যে গন্ধ পাচ্ছ না?

সুদর্শনা। না, কই গন্ধ পাচ্ছি নে তো।

সুরঙ্গমা। বড় দরজাটা খুলেছে—তিনি আসছেন, ভিতরে আসছেন।

সুদর্শনা। তুই কেমন করে টের পাস?

সুরঙ্গমা। কী জানি মা। আমার মনে হয় যেন আমার বুকের ভিতরে পায়ের শব্দ পাচ্ছি। আমি তাঁর এই অন্ধকার ঘরের সেবিকা

কিনা তাই আমার একটা বোধ জন্মে গেছে—আমার বোঝবার জন্যে কিছুই দেখবার দরকার হয় না।

অন্ধের বোধশক্তির মতই। অন্তরের রাজ্যে এই বোধশক্তির উপরই নির্ভর করতে হয়।

পাঠক সুরঙ্গমার কথার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের—

বক্ষ সহসা উঠিয়াছে দুলি
অকারণে আঁখি উঠেছে আকুলি
বুঝেছি হৃদয়ে, ফেলেছো চরণ চকিতে—

এই কথাগুলির সাদৃশ্য লক্ষ্য করবেন। মূলে অনুভূতি একই।

কিন্তু এই অন্তরের পথে না গিয়ে রাণী সুদর্শনা চাইলেন বাহিরের আলোতে রাজাকে দেখতে।

"তুমি আমাকে আলোয় দেখা দিচ্ছনা কেন ?"

রাজা। আলোয় তুমি হাজার হাজার জিনিষের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে দেখতে চাও ? এই গভীর অন্ধকারে আমি তোমার একমাত্র হয়ে থাকিনা কেন ?

সুদর্শনা। সবাই তোমাকে দেখতে পায় আমি রাণী হয়ে পাবো না ?

রাজা। কে বললে দেখতে পায় ? মূঢ় যারা তারা মনে করে দেখতে পাচ্ছি।

এইখানে পাঠক স্মরণ করুন গীতার অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীতনুমাশ্রিতা।

সুদর্শনা অবশ্য ছাড়বার পাত্রী নন। তিনি বললেন,

"তা হোক আমাকে দেখা দিতেই হবে।

রাজা। সহ্য করতে পারবে না—কষ্ট হবে।"

সুদর্শনা। সহ্য হবে না—তুমি বল কী! তুমি যে কত সুন্দর কত আশ্চর্য তা এই অন্ধকারেই বুঝতে পারি, আর আলোতে বুঝতে পারব না ? যখন তোমার বীণা বাজে তখন আমার হয় যে, আমার নিজেকে সেই বীণার গান বলে মনে হয়। তোমার ওই সুগন্ধ উত্তরীয়টা যখন আমার গায়ে এসে ঠেকে তখন আমার মনে হয়, আমার সমস্ত অঙ্গটা বাতাসে ঘন আনন্দের সঙ্গে মিলে গেল। তোমাকে দেখলে আমি সইতে পারবো না এ কী কথা!

পাঠক বুঝতে পারবেন বৈষ্ণব সাধকদের রাধা যেমন সাধকের প্রাণ, রাণী সুরঙ্গমাও তেমনি সুন্দরের উপাসক রবীন্দ্রনাথ। তবে তিনি সত্য-সন্ধানী। এই সন্ধানেই তার বিপদ। তার ধারণা রূপের জগতের মধ্যে বা জগতের সৌন্দর্য্যের মধ্যেই তিনি ঈশ্বরকে লাভ করবেন। তিনি ঈশ্বরকে সুন্দর করেই কল্পনা করে বসে আছেন। তাই রাজা যখন জিজ্ঞাসা করলেন,

"আমার কোনোরূপ কি তোমার মনে আসে না?" তিনি উত্তর দিলেন, "এক রকম করে আসে বৈ কি! নইলে বাঁচবো কী করে?"

রাজা। কী রকম দেখেছ?

সুদর্শনা। সে তো একরকম নয়। নববর্ষার দিনে জলভরা মেঘে আকাশের শেষ প্রান্তে জলের রেখা যখন নিবিড় হয়ে ওঠে, তখন বসে বসে মনে করি আমার রাজার রূপটি বুঝি এই রকম—এমনি নেমে আসা, এমনি ঢেকে-দেওয়া, এমনি চোখ-জুড়ানো, এমনি হৃদয়-ভরানো, চোখের পল্লবটি এমনি ছায়ামাখা, মুখের হাসিটি এমনি গভীরতার মধ্যে ডুবেথাকা। আবার শরৎ কালে আকাশের পর্দা যখন দূরে উড়ে চলে যায় তখন মনে হয় তুমি স্নান করে তোমার শেফালিবনের পথ দিয়ে চলেছ। তোমার গলায় কুন্দ ফুলের মালা। তোমার বুকে শ্বেত-চন্দনের ছাপ, তোমার মাথায় হাল্‌কা শাদা কাপড়ের উষ্ণীষ, তোমার চোখের দৃষ্টি দিগন্তের পারে—তখন মনে হয়, তুমি আমার পথিক বন্ধু। তোমার সঙ্গে যদি চলতে পারি তা হলে দিগন্তে সোনার সিংহদ্বার খুলে যাবে, শুভ্রতার ভিতর মহলে প্রবেশ করব। আর যদি না পারি তবে এই বাতায়নের ধারে বসে কোন্ এক অনেক-দূরের জন্যে দীর্ঘনিশ্বাস উঠতে থাকবে। কেবলই দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি অজ্ঞাত বনের পথশ্রেণী আর অনাঘ্রাত ফুলের গন্ধের জন্যে বুকের ভেতরটা কেঁদে কেঁদে ঝুরে ঝুরে মরবে। আর বসন্তকালে এই যে সমস্ত বন রঙে রঙিন, এখন আমি তোমাকে দেখতে পাই কানে কুণ্ডল হাতে অঙ্গদ, গায়ে বাসন্তী রঙের উত্তরীয়, হাতে অশোকের মঞ্জরী। তালে তালে তোমার বীণার সব কটি সোনার তার উতলা।

পাঠক গীতাঞ্জলির অনেক গান এই বর্ণনায় পাবেন।

আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মত নীরব ওহে সবার দিঠি এড়ায়ে এলে।…

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।…

গীতাঞ্জলীর কবি ও রাণী সুদর্শনা একই ব্যক্তি।

এতো গেল ভক্তের চোখে ভগবান্। এবার ভগবানের চোখে ভক্তের দিকটাও দেখুন। সুদর্শনা রাজাকে জিজ্ঞাসা করছেন, তুমি আমাকে "কী দেখ?" রাজা বললেন, "দেখতে পাই যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার আমার আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার।

পাঠক মনে করুন, "আনন্দাদ্ধিব খল্বিমানি ভূতানি জয়ন্তে।" সৃষ্টি লীলার আনন্দ বা আনন্দের লীলা।

রাজার কথা শুনে সুদর্শনা বলছেন, "আমার এত রূপ, তোমার কাছে যখন শুনি বুক ভরে ওঠে; কিন্তু ভালো করে প্রত্যয় হয় না; নিজের মধ্যে তো দেখতে পাইনে।

এখানে মনে করুন রবীন্দ্রনাথের প্রণয় প্রশ্ন,'ও আমার চিরভক্ত এ কি সত্য—।'

রাজা উত্তরে বললেন, "নিজের আয়নায় দেখা যায় না—ছোটো হয়ে যায়। আমার চিত্তের মধ্যে যদি দেখতে পাও তো দেখবে সে কতো বড়ো। আমার হৃদয়ে তুমি যে আমার দ্বিতীয়, তুমি সেখানে কি শুধু তুমি।

এই তো রাধাতত্ত্ব। রাধার গৌরব তো তাঁরই দেওয়া,—হামারি গরব তুঁহু বাড়ায়লি অবটুটায়ব কে? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন রাধার এ অহং কার? না, তাঁর।

শ্যামের বাঁশিতো এই বলেই তাকে ডেকে ডেকে মুগ্ধ করেছে। তাই তো কূল ছেড়ে তাকে অকূলে ভাসতে হয়। আর সেই বাঁশির ডাকের কথাই এখানে রাণী সুদর্শনা বলছেন রাজাকে,—"বলো বলো এমনি করে বলো। আমার কাছে তোমার কথা গানের মতো বোধ হচ্ছে,—যেন অনাদিকালের গান, যেন জন্মজন্মান্তর শুনে এসেছি। সে কি তুমিই শুনিয়েছ, আর আমাকেই শুনিয়েছ? না, যাকে শুনিয়েছ সে আমার চেয়ে অনেক বড়ো, অনেক সুন্দর, —তোমার গানে সেই আলোক সুন্দরীকে দেখতে পাই—সে কি আমার মধ্যে না তোমার মধ্যে?..."

তারপর রাজা যে উৎসব করলেন সেটা বসন্তোৎসব। যেখানে পঞ্চমে বাঁশি বাজবে, ফুলের কেশরে ফাগ উড়বে, জ্যোৎস্নায় ছায়ায় গলাগলি হবে"—সেই দক্ষিণের কুঞ্জবনে রাজার দেখা পাবেন রাণী সুদর্শনা।

বৈষ্ণবপ্রভাব যে এখানে কতখানি তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

অভিমানের কথা আবার শুনুন। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, সুদর্শনা দুর্বৃত্তের হাত থেকে রক্ষা পেল। কিন্তু রাজা তাকে নিতে এলেন না। সুদর্শনা অপেক্ষায় অধীর। সুরঙ্গমা জানে তার রাজা জোর করে নেন না। তাঁর কাছে যেতে হয়, যেতে হয় সব অভিমান তেজে। সুরঙ্গমা বলল, "এবার একেবারে হার মেনে তাঁর কাছে যাও তাহলে আর লজ্জা থাকবে না।

সুদর্শনা। স্বীকার তো করতেই হবে চিরদিনের মত আমার হার হয়েছে—কিন্তু এতদিন গর্ব করে তাঁর কাছে সকলের চেয়ে বেশি আদরের দাবি করে এসেছি কিনা, সেটা একেবারে ছেড়ে দিতে পারছিনে। সবাই যে বলত আমার অনেক রূপ, অনেক গুণ, সবাই বলত আমার উপরে রাজার অনুগ্রহের অন্ত নেই—সেই জন্যই তো সকলের সামনে আমার হৃদয় নত হতে এত লজ্জা বোধ করছে।

সুরঙ্গমা। অভিমান না ঘুচলে তো লজ্জাও ঘুচবে না।

সুদর্শনা। তাঁর কাছ থেকে আদর পাবার ইচ্ছা যে কিছুতে মন থেকে ঘুচতে চায় না।

সুরঙ্গমা। সব ঘুচবে রাণীমা। কেবল একটি ইচ্ছা থাকবে, নিজেকে নিবেদন করবার ইচ্ছা।

সুদর্শনা। সেই আঁধার ঘরের ইচ্ছা—দেখা নয়, শোনা নয়, চাওয়া নয়, কেবল গভীরের মধ্যে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া। সুরঙ্গমা, সেই আশীর্ব্বাদ কর যেন—

পাঠক স্মরণ করুন—

আমি কানু অনুরাগে এ দেহ সঁপিনু তিল তুলসী দিয়া।

এ আত্মনিবেদন শ্রীরাধার—বৈষ্ণবের।

এদিকে কাঞ্চীরাজও পথে বেরিয়েছেন। দেখে ঠাকুরদা বললেন, "এ কী কাঞ্চীরাজ তুমি পথে যে।"

কাঞ্চী। তোমার রাজা আমায় পথেই বের করেছে।

ঠাকুরদা। ওই তো তার স্বভাব।

কাঞ্চী। তারপর আর নিজের দেখা নেই।

ঠাকুরদা। সেও তার এক কৌতুক।

কাঞ্চী। কিন্তু আমাকে এমন করে আর কতদিন এড়াবে? যখন কিছুতেই তাকে রাজা বলে মানতেই চাই নি তখন কোথা থেকে কালবৈশাখীর মতো এসে এক মুহূর্তে আমার ধ্বজা পতাকা ভেঙে উড়িয়ে ছারখার করে দিলে, আর আজ তার কাছে হার মানবার জন্যে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি তার আর দেখাই নেই।

ঠাকুরদা। তা হ'ক যে যত বড়ো রাজাই হ'ক হারমানার কাছে তাকে হার মানতেই হবে। কিন্তু রাজন্, রাত্রে বেড়িয়েছ যে?

কাঞ্চী। ওই লজ্জাটুকু এখনও ছাড়তে পারিনি। কাঞ্চীর রাজা থালায় মুকুট সাজিয়ে তোমার রাজার মন্দির খুঁজে বেড়াচ্ছেন এই যদি দিনের আলোয় লোকে দেখে তা হলে যে তারা হাসবে।

ঠাকুরদা। লোকের ওই দশা বটে। যা দেখে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায়—তাই দেখে বাঁদররা হাসে।

আর রাণী সুদর্শনাও পথে বেরিয়েছেন।

সুদর্শনা। বেঁচেছি, বেঁচেছি সুরঙ্গমা, হার মেনে তবে বেঁচেছি ওরে বাপ্‌রে কী কঠিন অভিমান। কিছুতেই গলতে চায় না। আমার রাজা কেন আমার কাছে আসতে যাবে—আমিই তার কাছে যাবো এই কথাটা কিছুতেই মনকে বলাতে পারছিলুম না। সমস্ত রাতটা সেই জানালায় পড়ে ধুলোয় লুটিয়ে কেঁদেছি—দক্ষিণের হাওয়া বুকের বেদনার মতো হুহু করে বয়েছে, আর কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর অন্ধকারে বউকথাকও চার পহর রাত কেবলই ডেকেছে—সে যেন অন্ধকারের কান্না।

সুরঙ্গমা। আহা কালকের রাতটা মনে হয়েছিল যেন কিছুতেই আর পোহাতে চায় না।

সুদর্শনা। কিন্তু বললে বিশ্বাস করবিনে তারই মধ্যে বারবার আমার মনে হচ্ছিল কোথায় তার বীণা বাজছিল। যে নিষ্ঠুর, তার কঠিন হাতে কি অমন মিনতির সুর বাজে। বাইরের লোক আমার অসম্মানটাই দেখে গেল, কিন্তু গোপন রাত্রের সেই সুরটা আমার হৃদয় ছাড়া আর তো কেউ শুনল না। সে বীণা তুই কি শুনেছিলি সুরঙ্গমা? না সে আমার স্বপ্ন?

সুরঙ্গমা। সেই বীণা শুনব বলেই তো তোমার কাছে কাছে আছি। অভিমান গলানো সুর বাজবে জেনেই কান পেতে পড়েছিলুম।

আর শুনুন সুন্দরের উপাসক রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্য্যন্ত কি হল।—অর্থাৎ

সুদর্শনার। কাঞ্চীরাজের মাথায় রাজছত্র ধরে দণ্ডায়মান সুবর্ণকে দেখে রাণী বললেন,

"ওই সুন্দরেও মন ভোলে! আমার এ পাপ-চোখকে কী দিয়ে ধুলে এর গ্লানি চলে যাবে?

সুরঙ্গমা। সেই কালোর মধ্যে ডুবিয়ে ধুতে হবে। সেই আমার রাজার সকল-রূপ-ডোবানো রূপের মধ্যে। রূপের কালি যা কিছু চোখে লেগেছে সব যাবে।"

"রূপের কালি যা কিছু চোখে লেগেছে"—সৌন্দর্য্যের উপাসকের এই শেষ স্বীকারোক্তি। এমন কি সৌন্দর্য্যের এই উপাসনাকে সুদর্শনা ব্যভিচার বলেও স্বীকার করেছেন। যৌবনের সৌন্দর্য্য শিকারী কবি পরিণত বয়সে রূপের মোহ কাটিয়ে উঠেছেন। আলোর পরে কালোর সন্ধান পেয়েছেন। কৃষ্ণকথায় মন ভরে আছে।

রবীন্দ্রনাথের এই দশা দেখে কি আমাদেরও হাসি পায় না? তা ঠাকুরদার কথা মনে করুন। আমাদের স্বভাব যাবে কোথায়?

সুদর্শনা। তার পণটাই রইল—পথে বের করলে তবে ছাড়লে। মিলন হলে এই কথাটাই তাকে বলব যে, আমিই এসেছি, তোমার আসার অপেক্ষা করিনি। বলব চোখের জল ফেলতে ফেলতে এসেছি—কঠিন পথ ভাঙতে ভাঙতে এসেছি। এ-গর্ব আমি ছাড়ব না।

সুরঙ্গমা। কিন্তু সে-গর্বও তোমার টিঁকবে না। সে যে তোমারও আগে এসেছিল নইলে তোমাকে বের করে কার সাধ্য।*

সুদর্শনা। তা হয়তো এসেছিল—আভাস পেয়েছিলুম কিন্তু বিশ্বাস করতে পারিনি। যতক্ষণ অভিমান করে বসেছিলুম ততক্ষণ মনে হয়েছিল সেও আমাকে ছেড়ে গিয়েছে—অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে যখনই রাস্তায় বেড়িয়ে পড়লুম তখনই মনে হল সেও বেড়িয়ে এসেছে, রাস্তা থেকেই তাকে পাওয়া শুরু করেছি। এখন আমার মনে আর কেনো ভাবনা নেই। তার জন্যে এতো যে দুঃখ এই দুঃখই আমাকে তার সঙ্গ দিচ্ছে—এত কষ্টের রাস্তা আমার পায়ের তলায় যেন সুরে সুরে বেজে উঠছে—এ যেন আমার বীণা—আমার দুঃখের বীণা এরই বেদনার গানে তিনি এই কঠিন পাথরে এই শুকনো ধুলোয় আপনি বেরিয়ে এসেছেন—আমার হাত ধরেছেন—সেই আমার অন্ধকার ঘরের মধ্যে যেমন

* ফরাসী কবি পাশকালেরও এই মত।

করে হাত ধরতেন—হঠাৎ চমকে উঠে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত—এও সেই রকম। কে বললে, তিনি নেই? সুরঙ্গমা, তুই কি বুঝতে পারছিসনে তিনি লুকিয়ে এসেছেন?

হোলী উৎসবের প্রথম দিন রং দেয়, পরের দিন দেয় কাদা। রবীন্দ্রনাথ তাকে ধুলোতে রূপান্তরিত করেছেন এবং তারও একটা সুন্দর অর্থ বার করেছেন ঐশ্বর্য্যের অভিমানের পরে ভক্ত দাসত্ব অবলম্বন করলেন! লোকে তখন উপহাসের ধুলি দিতে লাগল তার গায়ে। সুদর্শনার দীনবেশ দেখে ঠাকুরদা বললেন, "শত্রু পক্ষ তোমার এদশা দেখে পরিহাস করবে সেইটে আমাদের অসহ্য হয়। বৈষ্ণব কবিতায় "বৈরি হাসান" মনে করুন।

সুদর্শনা। শত্রুপক্ষের পরিহাস অক্ষয় হোক—তারা আমার গায়ে ধুলো দিক। আজকের দিনের অভিসারে সেই ধুলোই আমার অঙ্গবাস।

এর উত্তরে ঠাকুরদা বললেন, গিয়ে দেখব তার গায়েও ধুলো মাখা। তাকে বুঝি কেউ ছাড়ে মনে করেছ? যে পায় তার গায়ে মুঠো মুঠো ধুলো দেয় যে—সে ধুলো সে ঝেড়েও ফেলে না।

পাঠক স্মরণ করুন ভক্তের কিন্তু তখন ভারি রাগ হয়—মনে করুন—

হে সুন্দর,
যেতে যেতে পথের প্রমোদ মেতে
কারা সবে তব গায়ে ধুলো দিয়ে যায়
আমার অন্তর করে হায় হায়।
কেঁদে বলি, হে মোর সুন্দর
আজ তুমি হও দণ্ড ধর
করহ বিচার।

কিন্তু সে প্রসঙ্গ থাক! বৈষ্ণবের শেষ সাধনার ছবি দেখুন। বিভুমিলন—রাই মিলন।

সুদর্শনা। প্রভু, 'যে আদর কেড়ে নিয়েছ সে আদর আর ফিরিয়ে দিয়ো না; আমি তোমার চরণের দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দাও।

রাজা। আমাকে সইতে পারবে?

সুদর্শনা। পারব রাজা পারব। আমার প্রমোদবনে আমার রাণীর ঘরে তোমাকে দেখতে চেয়েছিলুম বলেই তোমাকে এমন বিরূপ দেখেছিলুম—সেখানে

তোমার দাসের অধম দাসকেও তোমার চেয়ে চোখে সুন্দর ঠেকে। তোমাকে তেমন করে দেখবার তৃষ্ণা আমার ঘুচে গেছে—তুমি সুন্দর নও, প্রভু, সুন্দর নও, তুমি অনুপম।

রাজা। তোমারই মধ্যে আমার উপমা আছে।

সুদর্শনা। যদি থাকে তো সেও অনুপম। আমার মধ্যে তোমার প্রেম আছে সেই প্রেমেই তোমার ছায়া পড়ে, সেই খানেই তুমি আপনার রূপ আপনি দেখতে পাও—সে আমার নয়, সে তোমার।

রাজা। আজ এই অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম—এখানকার লীলা শেষ হল। এস, এবার আমার সঙ্গে এস, বাইরে চলে এস—আলোয়।

সুদর্শনা। যাবার আগে আমার অন্ধকারের প্রভুকে আমার নিষ্ঠুরকে আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নিই।

এই মিলন সেই—বাসর ঘরের দুয়ারে করালে পূজার অর্ঘ্য বিরচন।

কোন বাল্যে তিনি ভানুসিংহের পদাবলী লিখেছিলেন, আর তার অপরিণত ভাবুকতায় লজ্জিত হয়ে একদিন স্বীকার করেছিলেন বৈষ্ণবের তত্ত্বজ্ঞান তাঁর ছিলনা তখন। আর সেই স্বীকারোক্তিকে স্থানকালের বন্ধন থেকে মুক্ত করে নিয়ে তাঁর সমালোচকেরা আজও বলে বেড়াচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবের ভাবধারা বা তত্ত্ব গ্রহণ করতে পারেন নাই। ঐ স্বীকারোক্তির পরে রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি তাঁর কাব্য থেকেই সংগ্রহ করে দিচ্ছি।

প্রভাতে যখন শঙ্খ উঠেছিল বাজি
তোমার প্রাঙ্গণ তলে, ভরি লয়ে সাজি
চলেছিল নরনারী তেয়াগিয়া ঘর
নবীন শিশির সিক্ত গুঞ্জন মুখর
স্নিগ্ধ বনপথ দিয়ে। আমি অন্য মনে
সঘন পল্লব পুঞ্জ ছায়াকুঞ্জ বনে
ছিনু শুয়ে তৃণাস্তীর্ণ তরঙ্গিনীতীরে
বিহঙ্গের কলগীতে সুমন্দ সমীরে।

অর্গাৎ সেই অপরিণত বয়সে অন্যেরা বৈষ্ণব ভক্তি নিয়ে লিখলেও রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের পূজায় অংশ গ্রহণ করেন নাই। এতবড় ভুল! তারপর জীবনশেষে যখন তারও ভক্তি কুসুমরাজি ফুটল—তিনিও তখন সেগুলো তুলে ডালা ভরে তাঁর পূজায়

পাঠিয়েদিলেন। তখন মনে এই বলে আত্মপ্রসাদ এল—যে ভুলটা তার ভালর জন্যেই হয়েছিল।—

আজ ভাবি ভালো হয়েছিল মোর ভুল
তখন কুসুমগুলি আছিল মুকুল—
হেরো তারা সারাদিনে ফুটিতেছে আজি
অপরাহ্নে ভরিলাম এ পূজার সাজি।

(নৈবেদ্য—৩৮)

যত মত তত পথ

আরও দুটো বড়ো জিনিষ আছে এ নাটকে। রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের যত মত তত পথ বাক্যটি স্বীকার করে নিয়েছেন এর মধ্যে।

২ নং দৃশ্য—**পথ**—পড়ুন।

প্রথম পাঠক। ওগো মশায়।

প্রহরী। কেন গো ?

দ্বিতীয়। রাস্তা কোথায় ? আমরা বিদেশী, আমাদের রাস্তা বলে দাও।

প্রহরী। কিসের রাস্তা ?

তৃতীয়। ওই যে শুনেছি আজ কিসের উৎসব হবে। কোন্ দিকে যাওয়া যাবে।

প্রহরী। এখানে সবই রাস্তা। যেদিক দিয়ে যাবে ঠিক পৌঁছোবে। সামনে চলে যাও।

[প্রস্থান [

কিন্তু এতবড়ো একটা বিরাট সত্যকে গ্রহণ করেও রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই দৃশ্যেই তাঁর চিরকালের অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেন নি। সেটা প্রাচীন রক্ষণশীলতাকে আঘাত করার লোভ। কবে তা মরে ভূত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তবু নাট্যকার তার সমাহিত শবদেহ কবর থেকে উদ্ধার করে ক্রমওয়েলের শবদেহের মত ফাঁসিতে লটকালেন।

ভবদত্ত। আমাদের তো এই খোলা রাস্তার দেশে এসে অবধি খেয়ে শুয়ে সুখ নেই—দিনরাত গা ঘিন্‌ঘিন্ করছে। কে আসছে কে যাচ্ছে তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই—রাম রাম।

কৌণ্ডিল্য।...আমাদের গুষ্ঠিতে এমন কখনো হয়নি। আমার বাবাকে তো

জান—কতবড়ো মহাত্মা লোক ছিল—শাস্ত্রমতে ঠিক উনপঞ্চাশ হাত মেপে গণ্ডি কেটে তার মধ্যেই সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দিলে—একদিনের জন্যেও তার বাইরে পা ফেলেনি। মৃত্যুর পর কথা উঠল ওই উনপঞ্চাশ হাতের মধ্যেই তো দাহ করতে হয়; সে এক বিষম মুসকিল; শেষকালে শাস্ত্রী বিধান দিলেন যে, উনপঞ্চাশে যে দুটো অঙ্ক আছে তার বাইরে যাবার জো নেই, অতএব ওই চার নয় উনপঞ্চাশকে উলটে নিয়ে নয় চার চুরানব্বই করে দাও—তবেই তো তাকে বাড়ির বাইরে পোড়াতে পারি। নইলে ঘরেই দাহ করতে হত। বাবা, এত আঁটাআঁটি! একি যে সে দেশ পেয়েছ।

আবার ভণ্ডঅবতারের বিরুদ্ধে বিদ্রূপবান নিক্ষেপও আছে। যারা মিথ্যে দেবতার পূজা করে। সেই ইহুদি-ইস্‌লাম-ক্রীশ্চান-মার্কা।

কাঞ্চী। দেখহে ভণ্ডরাজ, আমার কেবলই মনে হচ্ছে আমরা মিথ্যে ভয়ে ভয়ে চলেছি, এদেশে রাজা নেই।

রাজবেশী। সেই অরাজকতা দূর করবার জন্যেই তো আমার চেষ্টা। সাধারণ লোকের জন্য সত্য হোক মিথ্যে হোক একটা রাজা চাই—নইলে অনিষ্ঠ ঘটে।

কাঞ্চী। হে সাধু, লোকহিতের জন্য তোমার এই আশ্চর্য্য ত্যাগ স্বীকার আমাদের সকলেরই পক্ষে একটা দৃষ্টান্ত। ভাবছি যে এই হিতকার্য্যটা নিজেই করব।

এই রসিকতাটুকু না থাকলে নাটকের কোন অঙ্গ বা মর্য্যাদা হানির সম্ভাবনা ছিলনা।

আর দু'নম্বর হল রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন। অবশ্য তিনি এবং তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বেদান্তেরই উপাসক ছিলেন। শাস্ত্র বলতে সেই বেদান্তই বুঝতে হবে।

যে (সুবর্ণ) রাস্তা দিয়ে সকলের চোখ ধাঁদিয়ে গেল সে-ই রাজা, কুম্ভের মুখে এই কথা শুনে ঠাকুরদা বললেন, "সেই জন্যেই তো সন্দেহ। কবে আমার রাজা রাস্তার লোকের চোখ ধাঁদিয়ে বেড়ায়। এমন উৎপাত তো কোনদিন করে না!

কুম্ভ। তা আজকে যদি মর্জি হয়ে থাকে বলা যায় কী!

ঠাকুরদা। বলা যায় রে বলা যায়—আমার রাজার মর্জি বরাবর ঠিক আছে—ঘড়ি ঘড়ি বদলায় না।

শাস্ত্রও অভ্রান্ত। ফ্যাশানের মত তা পালটায় না। সেই পুরাতন কথা—তুমি আছো, আমি আছি, সত্য আছে স্থির।

সুদর্শনার প্রশ্ন ও উত্তর

সমগ্র নাটকটিকে একটি রূপক হিসেবে দেখা যায়। এটা সাধনজীবনের—বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথেরই সাধনার ইতিহাস। সাধক হিসেবে তার অভিমান তিনি বৃন্দাবনের রাধা রাণী। অন্ধকারের রাজা তারই স্বামী। অন্যেরা দাসী হতে পারে তিনি রাণী। কিন্তু এত পেয়েও তার শান্তি নাই। অন্তরে ছিল দুর্বলতা—রূপের তৃষা। ঈশ্বরকে চাইলেন সুন্দররূপে। তাই সুন্দরকেই ঈশ্বরের প্রাপ্য দিলেন। তারপর ভুল ভাঙলো। অভিমান চোখের জলে গলে গেল। রাণী দাস্য গ্রহণ করে শান্তি পেলেন। সাধক ভগবানকে সুন্দরের চেয়ে বেশি বলে জানতে পারলেন। সুন্দরের উপাসনা তার কাছে ব্যভিচার বলেই প্রতিভাত হল। আর এই সাধনার সহায় হলেন শাস্ত্র ও শাস্ত্রবিদ গুরু। দাসী সুরঙ্গমা আর রাজার বন্ধু ঠাকুরদা দু'জনই এই গুরুর কাজ করলেন রাণীর সাধনায়।

কিন্তু নাটকের পরিসমাপ্তি যেখানে হল সেখানে একটু ফাঁক থেকে গেল। সাধনাটা ভালই হল—গোলমাল হল সিদ্ধি নিয়ে। জিজ্ঞাসাটা অনুযায়ী সমাধান হল না। প্রথম দৃশ্যে অন্ধকার ঘরে সেই রাণী সুদর্শনার জিজ্ঞাসা স্মরণ করুন।..."তুমি আমাকে যেমন করে দেখছ তাই একবার এক নিমেষের জন্য আমাকে দেখিয়ে দাওনা! তোমার কাছে অন্ধকার বলে কি কিছুই নেই? সেই জন্যেই তো তোমাকে কেমন আমার ভয় করে। এই যে কঠিন কালো লোহার মতো অন্ধকার, যা আমার উপর ঘুমের মতো মূর্চ্ছার মতো মৃত্যুর মতো, তোমার দিকে তার কিছুই নেই। তবে এ জায়গায় তোমার সঙ্গে আমি কেমন করে মিলব? না, না, হবে না মিলন, হবে না। এখানে নয়, এখানে নয়। যেখানে আমি গাছপালা পশুপাখি মাটি পাথর সমস্ত দেখছি সেইখানেই তোমাকে দেখব।"

সুদর্শনার দুঃখ অন্ধকার ঘরে সে নিজে দেখতে পায় না কিন্তু তার রাজা দেখতে পান। কী করে তা সম্ভব হয়। তার প্রার্থনা হওয়া উচিত আমিও অন্ধকারেই তোমার ম৺ দেখতে পাবো। অন্ধকার আমার চোখেও আর অন্ধকার থাকবে না। তবে তো অন্ধকারের রাজার সঙ্গে সুদর্শনার মিলন হতে পারে। সুতরাং নাটকের শেষে এই অন্ধকারেরই আলোতে রূপান্তের দেখানো উচিত ছিল। অধ্যাত্ম সাধনার সিদ্ধিও তো তাই-ই। মানুষের ঈশ্বরত্ব লাভ। তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। তাঁর মধ্যে পরিনির্বাণ। সোঽহম্ তত্ত্বের

উপলব্ধি। আমার সে-তে পরিণতি। কিন্তু এই উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের হয় নাই। তাই নাটকে এ-পরিণতি সম্ভব হল না। সুদর্শনার এ প্রশ্ন-প্রশ্নই থেকে গেল। উত্তর পেল না সে।

দিবসের শেষ সূর্য্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
পশ্চিম সাগর তীরে—
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়,
... ...
পেল না উত্তর।

বরং রাজা তাঁর অন্ধকার ঘরের লীলা শেষ করে দিয়ে রাণীকে নিয়ে বাইরে চলে এলেন আলোয়।

রবীন্দ্রনাথ যা বলতে চাইলেন সে হচ্ছে এই যে সুদর্শনা এবার সর্বত্র রাজাকে দেখতে পাবেন—শুধু হৃদয়ের অন্ধকার গুহায় নয়। সেই ঠাকুরদা যেমন দেখতেন।

"ফাঁকা! আমাদের দেশের রাজা এক জায়গায় দেখা যায় না বলেই তো সমস্ত রাজ্যটা একেবারে রাজায় ঠাশা হয়ে রয়েছে—তাকে বল ফাঁকা। সে যে আমাদের সবাইকেই রাজা করে দিয়েছে।...

অবশ্য এই সবাইকে রাজা করে দেওয়া সুদর্শনার প্রশ্নের অর্থে নয়। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা আছে বলে যে-বোধ এ সেই অর্থে। যদিও ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই সব হয়,—তবুও সবাই মনে করে তার নিজের ইচ্ছায়ই সে চলছে।

সুদর্শনা ঈশ্বরের সঙ্গে মিশে গেল না। তার মুক্তিও হল না। ব্রহ্মনির্বাণ বা ঈশ্বর নির্বাণ বা পরিনির্বাণ রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার বাইরে।

তিনি বার বার তাই একথা স্বীকারও করে গেছেন। কেবল "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়—" বা "কবির বয়স" কবিতাতেই নয়, আরও অনেক জায়গায়। তিনি কবি, জীবনের কবি। সাধনসঙ্গীত অর্থাৎ কেবলমাত্র ঈশ্বরীয় গান রচনা তার কর্ম নয়। উৎসর্গের ৬ নম্বর কবিতায় তিনি বলছেন—

স্থান ভেদে তব গান মূর্তি নব নব
সখাশনে হাস্যোচ্ছ্বাস সেও গান তব,
প্রিয়াসনে প্রিয়ালাপ শিশু সনে খেলা,
জগতে যেথায় যত আনন্দের মেলা,

সর্বত্র তোমার গান বিচিত্র গৌরবে
আপনি ধ্বনিতে থাকে সরবে নীরবে।
আকাশে তারকা ফুটে ফুলবনে ফুল,
খনিতে মানিক থাকে হয় নাকো ভুল,
তেমনি আপনি তুমি যেখানে যে গান
রেখেছে, কবিও যেন রাখে তার মান।

আবার সাত নম্বর কবিতায় এই কথাটিই বলছেন—নতুন পরিবেশে, তাঁর পক্ষে এমন তুচ্ছ গান লেখা উচিত নয় বলে যারা অভিযোগ করেছেন তাদের অভিযোগের উত্তরে।

নানা গান গেয়ে ফিরি নানা লোকালয়;
হেরি সে মত্ততা মোর বৃদ্ধ আসি কয়—
তাঁর ভৃত্য হয়ে তোর একী চপলতা।
কেন হাস্য পরিহাস, প্রণয়ের কথা,
কেন ঘরে ঘরে ফিরি তুচ্ছ গীত রসে
ভুলাস্ এ সংসারের সহস্র অলসে।
দিয়েছি উত্তর তাঁরে—ও গো পক্ক কেশ,
আমার বীণায় বাজে তাঁহারি আদেশ।
যে আনন্দে, যে অনন্ত চিত্ত বেদনায়
ধ্বনিত মানব প্রাণ, আমার বীণায়
দিয়েছেন তারি সুর,—সে তাঁহারি দান,
সাধ্য নাই নষ্ট করি সে বিচিত্র গান।
তব আজ্ঞা রক্ষা করি নাই সে ক্ষমতা,
সাধ্য নাই তাঁর আজ্ঞা করিতে অন্যথা।

এমন সময় এসেছে যখন তিনি বুঝতে পেরেছেন শান্তিনিকেতনের গুরুদেব সাজা তাঁর পক্ষে আর উচিত নয়। সে পরিচয় মিথ্যে হয়ে গেছে।—

শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা মুক্তি কারে কই,
আমি তো সাধক নই, আমি গুরু নই।
আমি কবি, আছি
ধরণীর অতি কাছাকাছি
এ পারের খেয়ার ঘাটায়।

সম্মুখে প্রাণের নদী জোয়ার ভাঁটায়
নিত্য বহে নিয়ে ছায়া আলো···

অন্যান্য সাধকদের কথা চিন্তা করে নিজের সম্বন্ধে যে সত্যটি অনুভব করেছেন প্রণামে তা ফুটে উঠেছে।—

কত যাত্রী গেল কত পথে
দুর্লভ ধনের লাগি অভ্রভেদী দুর্গম পর্বতে
দুস্তর সাগর উত্তরিয়া। শুধু মোর রাত্রিদিন,
শুধু মোর, আনমনে পথচলা হ'ল অর্থহীন।
গভীরের স্পর্শ চেয়ে ফিরিয়াছি, তার বেশি কিছু
হয়নি সঞ্চয় করা, অধরার গেছি পিছু পিছু।

এই যে দোটানা—একদিকে সংসারের বিচিত্ররূপ অপর দিকে সংসারাতীত অরূপ এই দুয়ের মাঝখানে পড়ে—রবীন্দ্রনাথও নাস্তানাবুদ হয়েছেন। এমন কি গীতাঞ্জলির মধ্যেই জীবনদেবতার চরণে কবির এ-বিষয়ে স্বীকারোক্তি রয়েছে।—

জড়িয়ে গেছে সরু মোটা
দুটো তারে,
জীবন বীণা ঠিক সুরে তাই
বাজে নারে।
এই বেসুরো জটিলতায়,
পরাণ আমার মরে ব্যথায়,
হঠাৎ আমার গান থেমে যায়,
বারে বারে।
জীবন বীণা ঠিক সুরে আর
বাজে না রে।
এই বেদনা বইতে আমি
পারি না যে,
তোমার সভার পথে এসে
মরি লাজে।

তোমার যারা গুণী আছে
বসতে নারি তাদের কাছে
দাঁড়িয়ে থাকি সবার পাছে
বাহির দ্বারে।
জীবন বীণা ঠিক সুরে আজ,
বাজে না রে।

অধ্যাত্মানুভূতি ও বহির্জগতের আকর্ষণ এমন করে মিশে আছে রবীন্দ্রনাথের চেতনায় যে তিনি আধ্যাত্মিক বিষয়ে রচনায় হাত দিয়ে লজ্জায় পড়েছেন। বৈষ্ণব মহাজনগণ কিম্বা রামপ্রসাদকমলাকান্তের সঙ্গে তিনি এক পংক্তির অধ্যাত্ম সঙ্গীতকার হতে পারেন না। পূজামণ্ডপের দুয়ার বাহিরে তাঁর স্থান। উপরের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই একথা বলছেন এর চেয়ে বেশি কঠোর সমালোচনা অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়।

আর অধ্যাত্ম সঙ্গীতের জগতে তাঁর কাজ যে অসম্পূর্ণ থেকে গেল সেকথাও তিনি লুকোননি।

আমার যে-গান গাইতে আসা
আমার হয়নি সে-গান গাওয়া,
আমার কেবলি সুর সাধা
আমার কেবল গাইতে চাওয়া।

শ্রদ্ধেয় নলিনীকান্ত গুপ্তের ভাষায় সত্যই বলা যায়—"রবীন্দ্রনাথে—তাঁর জীবনে, তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে, বিশেষভাবে তাঁর কাব্যে—রূপ নিয়েছে যে জিনিষটি তা'হল আমরা যাকে বলি আস্পৃহা, অভীপ্সা—অন্তঃপুরুষের এক ঊর্ধ্বমুখী আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা। সাধারণের মোটা ভাষায় তাকে বলা যায় ভগবানের দিকে টান, দার্শনিকের পবিভাষায় তার নাম আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা।"

গীতার পরিভাষায় তিনি সেই চার জাতের ঈশ্বর অন্বেষীর মধ্যে জিজ্ঞাসু পদবাচ্য। আর সত্য ও ধর্মের জিজ্ঞাসার শেষ নাই। যারা ঈশ্বরের পার্শ্বে অবস্থান করেন তারাও তাঁকে সবটা জানেন না। তাঁকে জেনেছি বলে লোকের কাছে গরব করলে কি হ'বে, শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার করতেই হবে তুমি এখনও আমার অজানা। সখা মনে করে যা হাসিঠাট্টা করেছি, সব ক্ষমা কর। দেবতারা যার অন্ত পায় না আমি তার অন্ত পাব কি! তাই জিজ্ঞাসুর ভগবান চিরকাল জিজ্ঞাস্যই হয়ে থাকেন। কিন্তু যোগীর কথা আলাদা। তিনি

রবীন্দ্রনাথ যে বৈরাগ্য-সাধন এড়িয়ে গেলেন সেই সাধনা করেই ধ্যানাসনে বসে ব্রহ্মৈকাত্মানুভূতি লাভ করেন। তিনি শিব হয়ে যান। আবার শিব এবং হিমালয় অভেদ। সুতরাং যোগী স্থানুত্ব লাভ করেন। যোগী তাই হিমালয় আর জিজ্ঞাসু সমুদ্র। এদের পার্থক্য রবীন্দ্রনাথই সুন্দর করে নির্দেশ করেছেন।

হে সমুদ্র, চিরকাল কী তোমার ভাষা ?
সমুদ্র কহিল মোর অনন্ত জিজ্ঞাসা।
কিসের স্তব্ধতা তব, ওহে গিরিবর,
হিমাদ্রি কহিল মোর চিত্ত নিরুত্তর।

জাতীয় কবি ও রবীন্দ্রনাথ

জাতীয় কবি ও জাতীয় মানস

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত তার সমালোচনায় বলেছেন—"ইংরাজীর পক্ষে শেক্সপীয়ার যেমন, জর্ম্মনের পক্ষে গ্যেটে যেমন, রুশের পক্ষে টলস্টয় যেমন, অথবা ইতালীয়ের পক্ষে দান্তে যেমন এবং আরো অতীতে লাতিনের পক্ষে ভার্জ্জিল যা, ও গ্রীকের পক্ষে হোমর যা, কিম্বা আমাদের দেশে উত্তরকালীন সংস্কৃতের পক্ষে কালিদাস যা, বাংলার পক্ষে রবীন্দ্রনাথও তাই।" এক কথায় বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথ বাংলার জাতীয় কবি। অবশ্য নলিনীকান্তবাবু জাতীয় কবি কথাটা ব্যবহার করেন নি। বরং তিনি এইসব জাতীয় কবিদের Keats-এর অনুসরণে আপন আপন ভাষার ও সাহিত্যের রাজা বা রাজচক্রবর্ত্তী বলেছেন। নলিনীবাবুর মতে তারা প্রথমত এক একটি অপক্ক অপরিপূর্ণ গ্রাম্য ভাবাপন্ন ভাষা ও সাহিত্যকে পূর্ণবয়স্ক সার্বভৌমিক বিশ্বসাহিত্যে রূপায়িত করেছেন। দ্বিতীয়ত তারা একটা বিশেষ ভাষা ও সাহিত্যের অন্তঃশক্তিকে, তার মর্ম্মগত প্রতিভাকে উদঘাটিত করে ধরেছেন, অর্থাৎ একটি জাতের স্বধর্ম যা, তার শিক্ষাদীক্ষার মূলতন্ত্র যা, তাকে ব্যক্ত করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই দ্বিতীয় গুণটি নিশ্চয়ই জাতীয় কবির গুণ এবং এ কাজ যিনি করেন তিনি নিশ্চয়ই জাতীয় কবি। সুতরাং ননিলীবাবু রবীন্দ্রনাথকে জাতীয় কবি বলেছেন বললে ভুল হবে না। তা ছাড়া নলীনীবাবুকে এর জন্য কৃতিত্ব বা দায়িত্ব দেবারও

কিছু দরকার নেই। বাংলায় এমন কে আছেন যিনি রবীন্দ্রনাথকে বাংলার তথা ভারতেরও জাতীয় কবি বলতে দ্বিধাবোধ করবেন? তবে এই অসংশয়তা বাঙ্গালীর জাতীয়-বোধের ও জাতীয় অভিমানেরই নিদর্শন মাত্র। ওটা বিচার-সহ বা বিচার সাপেক্ষ নয়।

মনে রাখবেন জাতীয় কবি হতে হলে জাতির যা স্বধর্ম্ম তার শিক্ষা-দীক্ষা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইহকাল পরকালের আদর্শকে ফুটিয়ে তোলা চাই। এই কাজই তো হবে তার মর্মগত প্রতিভার উদ্‌ঘাটন। জাতীয় কবির মধ্যে একটা জাতীয় প্রতিনিধিত্ব ও জাতীয় নেতৃত্বের ভাব আছে। জাতীয় কবি জাতির একজন হবেন। তার আশা আকাঙ্ক্ষা ইহকাল পরকালের আদর্শ জনগণেরও আশাআকাঙ্ক্ষা ইহকাল পরকালের আদর্শ হওয়া চাই। তিনি প্রধান—তিনি নেতা—তিনি রাজা—কিন্তু তিনি সকলের প্রতিনিধি, সকলের প্রতীক। জনগণের চেয়ে বেশি অগ্রসর হলে তিনি গণপ্রতিনিধিত্ব হারিয়ে ফেলবেন। তার আর জাতীয় কবি হওয়া হবে না। মহম্মদ তোঘলক যেমন তার উন্নততর অর্থনীতি বোধ নিয়ে প্রজার নিকট পাগল বলে প্রতিপন্ন হয়েছিলেন, জাতীয় কবি জাতীয় মানসকে বেশিদূর পেছনে ফেলে গেলে তিনিও জাতিকর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে জাতীয় কবির আসন হারিয়ে ফেলবেন। জাতীয় কবিকে রামচন্দ্রের মত অনগ্রসর প্রজার মনোরঞ্জনের জন্য নির্দোষ জেনেও সীতাকে পরিত্যাগ করতে হবে। তিনি যে-বুদ্ধির অধিকারী তা দিয়ে সীতার নির্দ্দোষিতা বোঝা যায়, কিন্তু রাজ্যের সাধারণ প্রজার বুদ্ধি যে স্তরের তা দিয়ে ওটা বোঝা শক্ত। সুতরাং রাজা বা বিচারক জনগণের সাধারণ বুদ্ধি অনুসারে ভালোমন্দের যে মান নির্দিষ্ট হয়েছে অর্থাৎ দেশের যা আইন সেই অনুসারেই বিচার করবেন। তিনি আইন প্রণয়ন বা পরিবর্তন করতে পারবেন না। পরিবর্ত্তন যদি কাম্য হয় তবে সেকথা তিনি দুঃখের সহিত বুঝিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু বিচারক হিসেবে তার হাত বাঁধা। তাই তো দেখি বাল্মিকী, কৃত্তিবাস ও অন্যান্য রামায়ণ লেখকেরা তীব্র ভাষায় সীতার প্রতি অবিচারের প্রতিবাদ জানিয়েও আবার অবনত মস্তকে তা মেনেও নিয়েছেন। পরবর্তীকালে যে সেই প্রতিবাদ এমন তীব্র হয়ে উঠেছে যে কোন কোন অত্যুৎসাহী পাঠক এই অপরাধে রামচন্দ্রকে তাঁর মনুষ্যত্বের সু-উচ্চ আসন থেকে রূঢ় হস্তে অপসারিত করে দিতেও কুণ্ঠা বোধ করেছেন না এটা প্রাচীন রামায়ণ লেখকদের সেই নম্রপ্রতিবাদেরই ফলস্বরূপ। তারা জীবনে জনগণের অভিমত মেনে নিয়েও

পরবর্ত্তীকালে তা পরিবর্তিত করে দেবার ব্যবস্থা করে গেছেন। জাতীয় কবি এইভাবেই জাতীর মানসকে প্রভাবিত করবেন, তাঁর উপর বলাৎকার করে নয়, বা তার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে নয়। জাতীয় মানসের অপূর্ণতা, দোষত্রুটি জাতীয় কবির তথা জাতির দুঃখের বিষয়। সম্ভব হলে তা দূর করতে হবে কিন্তু তাই বলে সেই দোষে জাতিত্যাগ করা চলবে না। যিনি করবেন তিনি পর হয়ে যাবেন, হবেন বিজাতীয়। তিনি অধিক অগ্রসর, উন্নততর হতে পারেন, তিনি জাতির একজন নহেন। জাতীয় কবির এত বড় দায়।

এই দায় মেনে নিয়েছিলেন বলে বাল্মিকী ব্যাস প্রাচীন ভারতের এবং কৃত্তিবাস কাশীদাস বঙ্গের জাতীয় কবি। বাংলাদেশের যুগল রাজচক্রবর্ত্তী এই কৃত্তিবাস ও কাশীরাম। রামায়ণ ও মহাভারত বাংলার জাতীয় কাব্য। তাইতো বলি যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে। আর ভারতের বেলা যা সত্য-রামায়ণের বেলাও তাই। যুগ যুগ ধরে বাঙালী কামনা করেছে রামের মত পুত্র, লক্ষ্মণের মত ভাই, সীতার মত স্ত্রী, হনুমানের মত ভক্ত। বাংলার ঘরে ঘরে ছেলে জন্মালেই রাম-লক্ষ্মণ, মেয়ে সীতা সাবিত্রী। ছোটবেলায় দেখেছি পাড়াগাঁয়ে বিয়ে ঠিক হয়ে গেলে কদিন তার প্রস্তুতি উপলক্ষ্যে মেয়েদের গান হত। একটা লাইন মনে আছে "রামের বিয়ের কালেতে..."। আপনার আমার ছেলের বিয়ে রামের বিয়ে স্মরণ করে হত। রামায়ণের জীবন আমরা যাপন করেছি বা করতে চেষ্টা করেছি।

মৃত্যুর পরে রামায়ণ গান তো অবশ্য কর্তব্য ছিল। রামায়ণ ছিল জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমগ্র জীবনের প্রতীক বা রূপক বা কাঠামো। ঐ ছাঁচে সমাজের সকলের জীবন গড়ে নেওয়া হত বা নেবার চেষ্টা ছিল।

বলতে পারেন বাঙ্গালীর কোন উৎসব এখন রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া হয়? সত্যি কথা। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্থান কোথায়? উৎসবের দরজায়। পূজা মণ্ডপের বাইরে যেমন মুসলমান ঢুলির স্থান। তার বাজনা না হলে পূজা চলে না কিন্তু মন্দিরে প্রবেশের তার অধিকার নাই। তার ছোঁয়ায় পূজা পণ্ড হয়। রবীন্দ্র-সঙ্গীতও বাঙালীর দুর্গা পূজা সরস্বতী পূজা বা কালীপূজায় সেই ঢুলির স্থান অধিকার করে থাকে; পূজা মন্দিরে মন্ত্রস্থানীয় হল রামপ্রসাদী মালশী, কমলাকান্ত ও অন্যান্য কীর্ত্তনীয়াদের কীর্ত্তন। রবীন্দ্রনাথের সে আসরে স্থান নাই। তিনি সেখানে বড় জোর, নিমন্ত্রিত উপরওয়ালা সাহেব অতিথি। খাতির তাঁর যথেষ্ট, তবে সবটাই ছোঁয়া বাঁচিয়ে।

এই কি জাতীয় কবির যোগ্য সমাদর? বাংলার দুর্ভাগ্য তার এ যুগের দুই শ্রেষ্ঠ কবি ধর্ম্মত্যাগী। মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ। মধুসূধন খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে ইংরেজ কবি হবারই চেষ্টা করেছিলেন। Captive Lady লিখেও যখন কবিযশ তার করতলগত হল না, তখন তিনি তার ভুল বুঝতে পারলেন। তারপর এক শুভমুহূর্তে পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করে মাতৃকোষের রতনের রাজি নিয়ে শিল্পচর্চ্চা শুরু হল। খৃষ্টান হলেও তিনি মহাকাব্যের আদিতে বাণীবন্দনাটাও বাদ দিলেন না। অবশ্য এ বিষয়ে মিলটনের প্যারাডাইজলষ্টের Invocation to the Muse তার পথনির্দেশক হয়েছিল। তবে Milton যেমন Homer-এর গ্রীকদেবী Muse-কে Heavenly Muse বানিয়ে খৃষ্টীয় দেবি করে গিয়েছিলেন, মধুসূদনের হাতেও হিন্দু দেবদেবীর অনুরূপ বিকৃতি ঘটল, এবং Milton যেমন বিদ্রোহী Satan-কে Hero করে তুলেছিলেন Paradise Lost-এ, মধুসূদনও মেঘনাদ বধে রাবণকে Hero করে তুললেন। অবশ্য Milton যা করেছিলেন তা ছিল অনিচ্ছায়, শুধু বিদ্রোহীর চরিত্র আঁকতে গিয়ে Milton তাকে আপনার অজান্তেও বীরোচিত তেজস্বীতায় ভূষিত করে ফেলেছিলেন। কিন্তু মধুসূদন কতকটা খৃষ্টান ও মুসলমানসুলভ মনোবৃত্তিদ্বারা চালিত হয়ে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর দেবতাদের অপদেবতায় পরিণত করে ফেলেছেন, এবং ইহারই Corollary হিসাবে তাহাদের অপদেবতাকে দেবত্বে উন্নীত করেছেন। তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন, "I hate Rama and his rabble. The idea of Ravana elevates my character, Ravana was a grand fellow." —(গৌরদাসবাবুকে লিখিত পত্র থেকে।) এই বিজাতীয় মনোভাবের জন্যই তিনি বাংলায় তাঁর যোগ্য সম্মান-লাভ করতে পারেন নি। আর কত সামান্য কারণেই না তিনি স্বদেশের ধর্ম্মত্যাগ করেছিলেন। একটি শুভমুহূর্তে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রশ্নের উত্তরে তার এই সত্য উপলব্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়! পরমহংসদেব তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি ধর্ম্মত্যাগ করলেন কেন? উত্তরে বিনীত ভাবেই মধুসূদন স্বীকার করলেন "পেটের দায়ে।" একেবারে পেটের দায়ে অর্থাৎ অন্নাভাবে না হলেও নিছক শারীরিক বা বাহ্যিক কারণেই যে তিনি ধর্ম্মত্যাগ করেছিলেন ধর্ম্মের উৎকর্ষের জন্য নয় একথা অনস্বীকার্য্য। তার এই ধর্ম্মত্যাগের জন্য পরমহংসদেব অতিস্পষ্ট ভাষায় তাকে যে ভৎ´সনা করেছিলেন মধুসূদন. ইতিপূর্ব্বে এইরূপ ভৎ´সনার সম্মুখীন হলে হয়তো তার জীবনের গতিই পরিবর্ত্তিত হয়ে যেত।

পরমহংসদেব মধুসূদনকে নিষ্ঠুর সত্যটি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় শুনিয়ে দিলেন, পেটের জন্য যে ব্যক্তি ধর্ম্মত্যাগ করে সে অতি নীচ। এবং অতঃপর মধুসূদনের সমস্ত অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণ তার সঙ্গে আর বাক্যালাপ করলেন না। বললেন, কে যেন আমার জিভ্ টেনে ধরেছে, কথা বলতে দিচ্ছে না। পরমহংসদেবের কথা বাংলার তথা ভারতের অন্তরাত্মার বাণী। আমাদের জাতীয় চিত্ত এইভাবেই মধুসূদনকে গ্রহণ করেছিল। এবং অধুনা গুণীজনের গুণগ্রাহিতা সত্ত্বেও এতদধিক সমাদর মধুসূদন জাতীয় চিত্তে লাভ করবেন না কোনদিন। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তিকে বাদ দিলে মধুসূদনের কাব্যে গৌড় জনের কাব্যতৃষ্ণা কোনদিন মিটে নাই এবং মিটতে পারে না। তার সমাধির পাশে দাড়িয়ে বঙ্গ পথিকের করুণা ছাড়া আর কোন ভাবের উদ্রেক হয় না। প্রতিভার কি অপচয়! এই কথা ভাবতে ভাবতেই পথিক সেখান থেকে বিদায় নেন। জাতীয় কবির সম্মান মধুসূদনের ভাষাতেই দেই আমরা বাল্মিকী ও ব্যাস, কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসকে। "নমি আমি কবিগুরু তব পদাম্বুজে বাল্মিকী, হে ভারতের কবি চূড়ামণি", "কৃত্তিবাস ভারতের কীর্ত্তিবাস তুমি" আর "হে কাশী কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্"।

মধুসূদন তাঁর এই করুণ পরিণতি বুঝতে পেরেছিলেন। তারজন্য খেদ তার স্মৃতিলিপিতে ফুটে উঠেছে। তাঁর এই ব্যর্থতার অনুশোচনার প্রতিরূপ দেখতে পাই Cardinal Newman-এর মধ্যে। একজন মার্কিন পণ্ডিতের সমালোচনা মনে পরছে। Catholic মতবাদ গ্রহণ করে Newman Cardinal হলেন, কিন্তু তিনি ইংরেজ জাতির নেতৃত্ব হারালেন। পরবর্তী জীবনে তিনি পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত। লোকে দেখে, প্রশংসা করে, কিন্তু আপন বলে স্বীকার করে না; ভয়ে দূরে থাকে। এই দুর্ভাগ্যের জন্য তাঁর অশ্রুত দীর্ঘশ্বাসের অন্ত ছিল না। যার প্রতিভা জনসমুদ্রের কর্ণধার হবার জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল, মুষ্টিমেয় ক্যাথলিকের নেতৃত্ব নিয়ে সমুদ্র কক্ষের এক গুহার ভেতর বন্দী হয়ে থাকাতে তিনি আনন্দ বা তৃপ্তি লাভ করেন নি। জাতীয় কবি হবার জন্যই যার জন্ম হয়েছিল, বিজাতীয় হয়ে গিয়ে বড় কবি হয়েও তার মনে তৃপ্তি আসতে পারে না।

Newman-এর নামটা এসে ভালই হল। Newman শুধু Protestant থেকে Catholic হয়েছিলেন। খৃষ্টীয় মতবাদ ত্যাগ করেননি। তিনি পুরোপুরি ধর্মত্যাগী ছিলেন না। তবে ইংলণ্ডের বেশির ভাগ লোক

Protestant মতাবলম্বী, সুতরাং তাদের কাছে Newman বিদলীয়—বিজাতীয় না হলেও।

রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর কাছে ঐ রকম বিদলীয়। মধুসূদনের মত বিধর্মী বা বিজাতীয় নন। আদি ব্রাহ্ম সমাজের লোকেরা নিজেদের হিন্দু বলতে কুণ্ঠিত ছিলেন না, কিন্তু হিন্দুর যা বৈশিষ্ট্য সেই দেবদেবীর ও মূর্তিপূজার বিরোধী ও অবতারবাদে অবিশ্বাসী। বেদান্তের জ্ঞান ভাণ্ডার ও নিরাকার উপাসনা তাঁদের। একজন খৃষ্টান কি মুসলমানের পক্ষে হিন্দুর ধর্মমতের যেটুকু গ্রহণ করা সম্ভব ব্রাহ্মরাও সেইটুকুই নিলেন। সুতরাং মূল হিন্দুসমাজ থেকে এরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেনই। তবে অহিন্দু না হয়ে এরা হিন্দুরই আর একটা সম্প্রদায় হয়ে থাকলেন। তাতেই কিন্তু স্বজাতীয় জনগণের মূলকাণ্ডের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে গেল। এই বিচ্ছিন্নতা প্রতিভার স্ফুরণের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। সুতরাং অনেকটা প্রাণের তাগিদেই যেন রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা ত্যাগ করে বাংলার জাতীয় জীবনের প্রধান স্রোত থেকে দূরে গিয়ে শান্তি নিকেতনে আর একটা কলোনি সৃষ্টি করলেন। এই অনুকূল পরিবেশ না হলে সম্ভবত রবীন্দ্র প্রতিভা এমন সম্পূর্ণ হয়ে ফুটে উঠতে পারতো না। কলকাতায় বঙ্গ সমাজের অন্ততঃ পাশ কাটিয়ে চলাটাও প্রতি মুহূর্তে কবির আত্মসম্মানে আঘাত দিত। এক হয় তিনি ব্রাহ্মমত পরিত্যাগ করতেন না হয় কালাপাহাড়ী ভূমিকার অভিনয় করতে বাধ্য হতেন। বিসর্জনে দেবী মূর্তি ভঙ্গে যার সূচনা হয়েছিল কে জানে কোথায় তার হত শেষ। তাছাড়া জাতীর শিক্ষাদীক্ষা, তার মর্মগত আশা-আকাজ্ক্ষার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল ও ছিল সামান্যই। কবি আর সংস্কারক এক নহে। কবি প্রকাশ করবেন সুন্দর করে। যেখানে লোকে সৌন্দর্য্য দেখে নাই সেখানে কবি সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তুলবেন।

তিনি অসুন্দর জেনে ছুরি চালাবেন না। কাটাকুটি জোড়াতালি তার কাজ নয়। তিনি শল্যচিকিৎসক নন—তিনি স্রষ্টা। ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত রবীন্দ্রনাথ আদিতেই চিকিৎসকের ভূমিকায় জন্মলাভ করেন। সমাজের ব্যাধি মোচন তাঁর কাজ। যে দৃষ্টিতে মানুষ রবীন্দ্রনাথ দুঃখদৈন্য-ভুলে-ভরা পৃথিবীকে স্বর্গের চেয়ে সুন্দর দেখতে পেয়েছিলেন, যে ভাব থেকে তিনি লিখতে পেরেছিলেন,

স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
মর্ত্যে থাক সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত

প্রেমধারা, অশ্রুজলে চির শ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গ খণ্ডগুলি।

সে ভাব তাঁর বেশিদূর এগুল না, সে দৃষ্টি একটুমাত্র খুলেই আবার বন্ধ হয়ে গেল। যে কবি লিখলেন,—

ধরাতলে দীনতম ঘরে যদি জন্মে
প্রেয়সী আমার, সেবালিকা বক্ষে তার
রাখিবে সঞ্চয়করি সুধার ভাণ্ডার
আমারই লাগিয়া সযতনে। শিশুকালে
নদীকূলে শিবমূর্তি গড়িয়া সকালে
আমারে মাগিয়া লবে বর—

তিনিই শিবপূজায় আর সৌন্দর্য দেখতে পেলেন না। ভাষার খাতিরে যিনি আশ্রম বিদ্যালয়ের নাম দিলেন বিশ্বভারতী তিনিই আবার আশ্রমে সরস্বতী পূজা হতে দিলেন না। নিরুপায় ছাত্রদল তাঁহারই রোষ দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়িয়ে অদূরে উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে গিয়ে ভারতীর অর্চনা করল। সুতরাং যে দৃষ্টি দিয়ে জাতীয় কবি জাতীয় জীবনের গহন নিভৃতে যে অমৃত রসধারা নিত্য ঝরছে দেখতে পায় তার সন্ধান রবীন্দ্রনাথ পেলেন না। তাই তিনি সে জীবনের জয়গান ও রস সন্ধানও করতে পারলেন না। তিনি জাতীয় কবি হবেন কি করে? তিনি জাতির দোষই শুধু দেখলেন, ব্যঙ্গ করলেন, চাবুক মারলেন কিন্তু তার আনন্দ থেকে বঞ্চিতও হলেন। তাঁর চোখে 'দীঘে ছোট বহরে বড় বাঙালী সন্তান জনকতকে জটলা করে তক্তপোষে বসে।' তাঁর চোখে 'সাতকোটি সন্তানেরে মুগ্ধা বঙ্গজননী শুধু বাঙ্গালী করেই রেখেছেন, মানুষ করেন নি।' এ সত্য হলেও বড় নির্মম এ সমালোচনা। দরদ নাই এর মধ্যে। তাঁরই ভাষায় বাংলাদেশ তাঁকে বলতে পারতো "ফুলের মালা গাছি বিকাতে আসিয়াছি পরখ করে শুধু করে না স্নেহ।"

ইংরেজ কবি ব্রাউনিং এই অপরাধেই জাতীয় কবি হতে পারেন নি। তার চেয়ে কম ক্ষুরধার বুদ্ধি টেনিশন তাকে ছাড়িয়ে ইংরেজের জাতীয় চিত্ত জয় করলেন। ব্রাউনিং নির্য্যাতিত ইহুদি পুরোহিতের মুখ দিয়ে খৃষ্টানের কঠোর সমালোচনা করলেন, সেই যে এসেছিলে সুতোর মিস্ত্রির ছেলে, তুমিই যদি সেই হয়ে থাক? কিন্তু তা হলেও তোমার নাম নিয়ে যারা এত লুটপাট খুনোখুনি

অখৃষ্টীয় কাজ করছে তাদের খৃষ্টান বলে স্বীকার না করে আমরা তোমার মর্য্যাদা রক্ষাই করেছি। সুন্দর সমালোচনা। বুদ্ধি তারিফ করল; খৃষ্টান ইংরেজের অন্তরাত্মা খুসী হল না। কম বুদ্ধি টেনিশান সমালোচনা না করে গানে গল্পে ছোট বড় নানা আকারের কাব্যে মধ্যযুগীয় ও আধুনিক খৃষ্টানের আশা-আকাঙ্ক্ষা এমন কি কুসংস্কারগুলিরও সুন্দর ছবি আঁকলেন। পরম তৃপ্তিভরে খৃষ্টান ইংলণ্ড তা আপন অন্তরে গ্রহণ করল। টেনিশান হলেন Poet Laureate— ইংরেজের জাতীয় কবি। বুদ্ধিমান ব্রাউনিং তার বুদ্ধির পঙ্কে হাবুডুবু খেলেন চিরদিন। আর কবির লোকসানটা যে কেবল অনাদর বা অর্থাভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল তা নয়। সেই যেমন অপ্রিয় সত্য বলতে গিয়ে বেশির ভাগ সময়েই অপ্রিয়টা বলা হলেও সত্য যায় পালিয়ে, তেমনি বুদ্ধির কষাঘাত করতে গিয়ে অন্তরের গ্রহণ দুয়ার যায় বন্ধ হয়ে। ভ্রমটাকে রুখতে গিয়ে সত্যকেও বাইরে রাখা হয়। ফলে সংস্কারমনা কবি সমাজজীবনে একটু আধটু প্রশংসনীয় কিছু পেলেও তার সমগ্রের সৌন্দর্যটুকু ধরতে পারেন না। আর এই সামগ্রিক সৌন্দর্যবোধের অভাবেই তিনি জীবনের সামগ্রিক রূপের ছবিও আঁকতে পারেন না। সুতরাং তার পক্ষে মহাকাব্য লেখাও সম্ভব হয় না। আনন্দ টুকরো টুকরো হয়ে ছোট ছোট জিনিষের ভেতর দিয়ে ধরা দিলে অখণ্ডরূপে আর প্রতিভাত হয় না। তখন মহাকবির প্রতিভা গীতি কবির কাজ করেই আত্মপ্রসাদ লাভ করে। গীতিকবিতার তাতে যতই মান বাড়ুক, কবির মান তাতে বাড়ে না, তাই অনিবার্য কারণেই রবীন্দ্রনাথকে বলতে হয়েছিল—

আমি নাবব মহাকাব্য
সংরচনে ছিল মনে,
ঠেকল কখন তোমার কাঁকন
কিংকিনীতে,
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার-গীতে।

কবির কল্পনাটি গীতি কবিতার কাঁকণে ঠেকে ফেটে গিয়ে সহস্রগীতে পরিণত হল। রবীন্দ্রনাথ গীতি কবি হলেন। এত বড় কবি প্রতিভার আর মহাকাব্য লেখা হল না।

লিখবেন কি করে? জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত আনন্দময় জীবনের কোন ছবি কি ফুটেছিল তাঁর কল্পনায়? অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন এ দেশের লোকের পুত্রকামনার গভীরতা—দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অভীপ্সা? তারপর রামের শিক্ষা-দীক্ষা বিবাহ অভিষেক এমন কি দুঃখের উৎস পিতার বহুবিবাহ, দেশের শত্রু, ধর্মের শত্রু রাক্ষস বধ, যজ্ঞরক্ষা, অশ্বমেধ, এমন কি যুগ-ধর্মানুমোদিত নয় বলে শূদ্র তপস্বী শম্বুকের প্রাণদণ্ড দান? সীতার বসবাস, লক্ষ্মণ বর্জন! রবীন্দ্রনাথ বিচার করতেন শম্বুকনিধন ভয়ানক অপকর্ম হয়েছে, সীতার বনবাস অপৌরুষেয়, লক্ষ্মণবর্জনে অন্তরের ওপর কথার স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেবতা যে অন্তরের কথার ওপরও মুখের কথার দাম দেন। এ যে মন্ত্রোচ্চারণে বা জপে ধর্ম লাভের দেশ। এমতাবস্থায় রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় কবি হবেন কি করে! মহাকাব্য লিখবেন কি করে তিনি?

ব্রাহ্মধর্মের অবদান

এখানে একটা কথা পরিষ্কার করে বলে নেওয়া উচিত, আমার সমালোচনায় পাঠক যেন সনাতনী উগ্র হিন্দুসম্প্রদায়িকতার গন্ধ না পান। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম হয়ে কি হারিয়েছিলেন এবং তজ্জন্য দেশকে তিনি কি দিতে পারলেন না প্রবন্ধের প্রয়োজনে সেইটেই আমাকে দেখাতে হয়েছে। ব্রাহ্ম হয়ে তিনি কি পেয়েছিলেন এবং তদ্দরুন দেশকে কী বিশেষ বস্তু দিতে পেরেছেন এ প্রবন্ধে তা অপ্রয়োজনীয় বিধায় লেখার প্রয়োজন হয় নাই। আমি সে ইতিহাস জানি যে একদিন খৃষ্টান প্রচারকদের হাত থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্য ব্রাহ্ম মতবাদের প্রয়োজন হয়েছিল। ভারতবর্ষে আজও যে হিন্দুর প্রাচীন ধর্ম বেঁচে আছে ব্রাহ্মমতবাদ তার কারণ। এবং ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে ব্রাহ্ম মতের যা সারাংশ তা সমস্তই গ্রহণ করেছে। তাই আমি একদিন শ্রদ্ধেয় অমিয়কুমার সেন মহাশয়কে বলেছিলাম যে ব্রাহ্মমতবাদ তার স্বকার্যসিদ্ধ করে এবার লুপ্ত হতে বসেছে। এখন সব হিন্দুই ব্রাহ্ম—বিলেত গেলে আর জাত যায় না, অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ সব চলে। বহু দেবতার পূজা করেও হিন্দুরা এখন একেশ্বরবাদী। সুতরাং এখন আর কোন হিন্দুর ব্রাহ্ম হবার দরকার নেই। অমিয়বাবু সহাস্যে বললেন, তুমি তো ব্রাহ্মদের খুব বড় সার্টিফিকেট দিলে হে। এত বড় কাজ যদি হয়ে গিয়ে থাকে তবে তার চেয়ে গৌরবের আর কি আছে।

গৌরবের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু কাদের গৌরব! গৌরব সেই সব

প্রথম বিদ্রোহীদের যারা সমাজ ব্যবস্থা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করতে পেরেছিলেন। সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে হিন্দুর যে সব বুদ্ধিমান সন্তান খৃষ্টান হয়েছিলেন তাদের ধর্মত্যাগও ব্যর্থ হয় নি। তাদের মত আর কেহ যাতে খৃষ্টান না হয়েও ইংরেজের শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন সেইজন্যই রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতির ব্রাহ্ম মতবাদ। আবার ব্রাহ্ম না হয়েও যাতে ঐ সমস্ত সুযোগ গ্রহণ করা যায় তজ্জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের উদার আধুনিক মতবাদ। রামমোহনে যা শুরু হয়েছিল বিবেকানন্দে তা সম্পূর্ণ হল। স্মৃতির বিধানের ওপর বিধির বিধান জয়ী হল। হিন্দু তার গৃহের গণ্ডী ভেঙে বিশ্বের দরবারে আপন আসন গ্রহণ করল।

সব সত্য কথা, কিন্তু বিদ্রোহী হওয়ার অসুবিধাগুলিও তো মিথ্যে নয়। যদি তার ডক শুনে কেউ না আসে তবে শুধু প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে নিয়ে যে বিদ্রোহীকে একলাটিই চলতে হয়। তার সঙ্গী সাথী বা অনুচর অনুগামী থাকে না। সে নিঃসঙ্গ অসামাজিক হয়ে পড়ে। সমাজের নেতৃপদ তার অধিগম্য হবে কি করে? তাই তো সম্পূর্ণ ভাবে হিন্দু না হলে হিন্দুর জাতীয় কবি হওয়া যায় না। বিদ্রোহী খৃষ্ট নব ধর্মের প্রবর্তন করতে পারেন কিন্তু প্রাচীন জুডিয়ায় তাঁর স্থান হয় না।

আজকের বিদ্রোহী আগামী কালের শহীদ হয়, কিন্তু আজ ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে কন্টক মুকুট পরা ছাড়া তার পাওয়ার আর কিছু থাকে না। রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ এঁরা সকলেই তাই জাতিচ্যুত বিধর্মী। লোকালয় ছেড়ে বনবাসী। বোলপুরে শান্তিনিকেতন স্থাপন সত্যই মহর্ষি ও রবীন্দ্রনাথের বনগমন। রাজনীতি সমাজসংস্কার এসব যতই বড় বা সৎকর্ম হোক কবিকর্ম কদাপি নয়।

জাতীয় কবি ও মহাকাব্য

এবার জাতীয় কবি ও মহাকাব্যের সম্পর্কটা নির্ণয় করলেই এ প্রবন্ধের বক্তব্যটা মোটামুটি বোঝা যাবে।

জাতীয় কবি ও মহাকাব্যের সম্পর্ক বুঝতে হলে আগে মহাকাব্যটা কি পদার্থ সে বিষয়ে মন ঠিক করে নিতে হবে।

বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনা দ্বারা দীর্ঘকাল যাবৎ মহাকাব্যের লক্ষণ-সমূহ

আবিষ্কারের চেষ্টা হয়েছে। বিশ্লেষণের নিপুণতা বা দুর্বলতার ওপরই ঐ সকল আবিষ্কারের গুণ বা দোষ নির্ভর করে। রামায়ণ, মহাভারত ইলিয়াড অডিসি প্রভৃতি মহাকাব্যের বিশ্লেষণ দ্বারা প্রথম প্রথম সমালোচকগণ মনে করতেন, বুঝি হনুমানের লেজ, ঘটোৎকচের বিশাল বপু এ্যাখিলিশ ও হেকটরের একাকী অজস্র লোকের বল ধারণ এই সব অতি মানুষী ব্যাপারই মহাকাব্যের প্রাণ। প্রাচীন বা আদিম সমাজের শিশুর মতন সরল বিশ্বাস ও কল্পনা প্রবণতার জন্য এই সব অসম্ভব কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এই সভ্যতার যুগে মানুষ তার ঐসব গালগল্প বিশ্বাসও করে না মহাকাব্যও আর নতুন করে লেখা হয় না। যে সমাজে মহাকাব্য সৃষ্টি হ'ত সে সমাজও নাই। মহাকাব্যও লেখা সম্ভব নয়। বিশেষ করে আচার্য্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী আমাদের দেশে এই রকম একটা মতবাদ চালু করে দিয়েছেন। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতেরা বিশ্লেষণের কাজটা আরও গভীর এবং সুণিপুন ভাবে চালিয়ে যে সমাধানে পৌঁছেছেন সেটা হচ্ছে এই রকম—

প্রাচীন মহাকাব্যগুলি কোন ব্যাক্তি বিশেষের লেখা নয়! কোন জাতির মধ্যে যখন সর্বজন পূজ্য কোন বীর বা মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে তখন তাকে নিয়ে প্রথম প্রথম নানা লোক নানা গান কাহিনী আখ্যান প্রভৃতি রচনা করেছেন। এইগুলো উপযুক্ত সময়ে ও উপযুক্ত পরিবেশে গাওয়া হত। কালক্রমে ওগুলোর সংখ্যা যখন বিরাট হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন কোন প্রতিভাবান কবি ওগুলো সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে অর্থাৎ বেছে বেছে কতকগুলি বিছিন্ন টুকরোকে জুড়ে দিয়ে এবং জোড়াগুলো কিঞ্চিৎ ঘসে মেজে তাদের একটি সামগ্রিক ঐকিক রূপ দিতেন। এই সামগ্রিক রূপটিই পরে মহাকাব্য নামে পরিচিত হত। যেমন রামায়ণের কথা ধরা যাক। মহাবীর রামচন্দ্র একজন সর্বজন পূজিত রাজা ছিলেন। তাঁহার জীবিত কালেই এবং তাঁহার মৃত্যুর পরেও বহু কবি তাঁহার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে গান বা কাহিনী রচনা করে থাকবেন। কেহ বিশ্বামিত্রের যজ্ঞরক্ষা, কেহ পরশুরাম দমন, কেহ বালি বধ, কেহ রাবণ বধ, কেহ বা তাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞ নিয়ে লিখেছিলেন। কেবল একজনই যে এর একটা বিষয় নিয়ে লিখেছিলেন তা নয়, হয়ত একটা বিষয় নিয়েই দশজন লিখেছেন। পরবর্ত্তীকালে এই বিচ্ছিন্ন লেখাগুলোকে সম্পাদনা করে বাল্মিকী একটা কাহিনীর ও ভাবের ঐক্য তাদের ওপর চাপিয়ে দিলেন। বাল্মিকীর সেই সম্পাদিত সংগ্রহ পুস্তকটিই হল রামায়ণ। ঠিক ব্যাস সম্বন্ধে যেমন কিম্বদন্তী আছে যে তিনি বেদ বিভাগ

বা সম্পাদনা করেছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন যে ব্যাসদেব বেদ সম্পাদনা করেছিলেন আর মহাভারত লিখেছিলেন একথাও সত্য নয়। মহাভারত নামক মহাকাব্যটিতেও ব্যাসের কৃতিত্ব এই সম্পাদনা কার্য্যেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং মহাকাব্য লিখতে হলে আগে দরকার দেশের মধ্যে এমন একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যাক্তির যাকে দীর্ঘকাল ধরে অবিসংবাদিত রূপে জাতি আদর্শ বলে মেনে নিয়েছে। এবং যার সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই বহুজনে বহু কথা লিখে ফেলেছেন এবং এখনও লিখছেন। এইরূপ জাতীয় বীরের অস্তিত্বের অভাবে (জাতীয়) মহাকাব্য অসম্ভব। ইংরেজ কবিরা তাই এ ব্যাপারে খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়েছিলেন। এমন কি Milton-ও তার মহাকাব্যের নায়ক খুঁজতে গিয়ে রাজা আর্থার ছাড়া আর কোনও নাম খুঁজে পেলেন না। তিনি তাই Arthur সম্বন্ধেই একখানা মহাকাব্য লিখবেন স্থির করেছিলেন। অবশ্য পরে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে এ মহাকাব্য লেখা আর তাঁর হয়ে ওঠেনি। এবং জীবন সায়াহ্নে যখন আবার কাব্য চর্চায় মনোনিবেশ করলেন তখন অখৃষ্টীয় বিধর্মী আর্থারের কাহিনী লিখতে আর তার ইচ্ছা গেল না। তিনি বরং আদি মানব Adam এবং মুক্তিদাতা যীশু সম্বন্ধেই দুই মহাকাব্য লিখে ফেললেন। Milton-এর Parsdise lost ও Paradise regained-কে তাই সমালোচকেরা খাঁটি মহাকাব্য বলে না। ওগুলো নকল মহাকাব্য—নকল মুক্তার মত artificial. প্রাচীন মহাকাব্যের সঙ্গে আধুনিক মহাকাব্যের পার্থক্য এইখানে।

আমাদের মধুসূদন কিন্তু এ ভুল করেন নি তিনি খৃষ্টান হলেও স্বদেশী হিন্দু রামায়ণ থেকেই তাঁর মেঘনাদ বধের আখ্যান ভাগ গ্রহণ করলেন। কিন্তু তাঁর ভুল হল অন্যদিকে। তিনি ভাবলেন পুরনো বোতলে নোতুন মদ চালান করবেন। রামায়ণের বিষয়বস্তু নিয়ে রাবনায়ণ লিখবেন। শিল্প বা কাব্য হিসেবে তাই মেঘনাদ বধ যতই বড় হোক মহাকাব্য হিসেবে সে রামায়ণের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসবার যোগ্য বিবেচিত হল না। মেঘনাদ বধ থেকে জাতি অমিত্রাক্ষর ছন্দ ভিন্ন অন্য কিছুই গ্রহণ করল না।

আর মহাকাব্যের যা প্রাণ জাতীয় জীবনের সেই সামগ্রিক ও সর্বাঙ্গীন ছবি অঙ্কন তো মধুসূদনের সাধ্যাতীতই ছিল। পরের দুয়ারে ভিক্ষা করে ভিক্ষা না পেয়ে অমিতব্যায়ীপুত্র পিতৃগৃহে ফিরে এলো মাতৃকোষে রত্নরাজির লোভে, কিন্তু ওই রত্ন-লোভ ছাড়া পিতৃগৃহের ওপর তার আর কোন আকর্ষণই ছিল না। যদি তার অর্থাভাব না হত তবে সে বিদেশেই আনন্দে জীবন কাটিয়ে দিত। তার

কাছে বিদেশের সবই ভাল শুধু ওখানে পশুর রক্ষণ ও পশুর খাদ্য গ্রহণেই তার আপত্তি। স্বদেশে ফিরে ও তাই তার মন পড়ে রইল বিদেশের রাজ দরবারে। সে মাতৃগৃহের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করবে কি করে ? যে মধুস্দন বাঙালীর জীবনে কুশিক্ষা কুসংস্কার ভিন্ন আর কিছু আছে মনেই করতে পারতেন না, জীবন সঙ্গীনীরূপে যিনি স্বদেশিনী কাহাকেও গ্রহণ করতে পারলেন না, সেই মধুস্দন দেশীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা আদর্শের কবি হবেন কি করে ? বিজাতীয় মহাকাব্য লিখে জাতীয় কবি হওয়া অসম্ভব।

জীবনের সামগ্রিক ছবি আঁকতে একটা সামগ্রিক দৃষ্টি ভঙ্গীর প্রয়োজন। সেটা এক বিরাট প্রতিভার পরিচয়। সাধারণ লোক জীবনের ছোটখাট টুকরো টাকরা সত্য নিয়েই সন্তুষ্ট। তারা বন দেখতে পান না দেখেন নানা গাছ। গাছগুলো ছাড়াও যে বন বলে একটা পদার্থ আছে সেটা শুধু দর্শকের বুদ্ধিতে। সে বুদ্ধি খুব বড় জিনিষ। সকলের থাকে না। জীবনে ভাল খুজলে দু'চারটে ভাল জিনিষ চোখে পড়ে না এমন দুর্ভাগ্য ব্যক্তির সংখ্যা খুব বেশী নয়। কিন্তু জীবনকে ভাল বা সুন্দর বলে গ্রহণ করতে গিয়ে দু'চারটে অসুন্দর জিনিষ চোখে পড়বেনা এমন নির্বোধের সংখাও খুব বেশি না হবারই কথা। তবে এই ভাল মন্দের জমাখরচ মিটিয়ে সর্বসাকুল্যে জীবনকে সুন্দর মনে করতে পারেন এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। এরাই মহাকবি তবে মহাকবিত্ব করিত্বের মতই শুধু কোন ভাব বিশেষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সেই ভাবের প্রকাশের মধ্যে। যিনি কাব্যে ওই সমগ্রজীবনের সামগ্রিক ছবিটি সুন্দর করে এঁকে দিতে পারবেন তিনিই মহাকবি। সেই কাব্যই মহাকাব্য। তাতে হনুমানের লেজ আর ঘটোৎকচের দেহের বিস্তার অপ্রাসঙ্গিক, অবান্তর মাত্র। আর জীবনের এই সামগ্রিকরূপ দেখার লোভ সর্বকালের ও সার্বজনিক। যে জীবন আমরা যাপন করছি তার একটা সামগ্রিক রূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা আমাদের সকলের অন্তরেই বিরাজ করছে। প্রাচীন কালে মহাকাব্য মানুষের এই আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করতো বর্তমানে প্রত্যেকেই স্বকীয় প্রচেষ্টায় এই অভাব পূর্ণ করেন। যেমন ধরুন ঊনবিংশ শতাব্দীতেও যখন ঘরে ঘরে নিত্য রামায়ণ মহাভারত পাঠ প্রচলিত ছিল তখন পাঠক তার মনের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে রামায়ণ মহাভারতের অংশবিশেষ পাঠ করে তৃপ্তি লাভ করতেন। শোকের দিনে লক্ষ্মণ শক্তিশেল, অভিমন্যু বধ, আনন্দের দিনে রামের বিয়ে, উৎসবের দিনে অশ্বমেধ, রাজসূয়, ইত্যাদি ভাগে ঐ দুই মহাকাব্য পড়া হত। একজন বিরাট পুরুষ সাধু আমাকে

বলেছিলেন যে সম্রাট পঞ্চম জর্জের দিল্লী দরবারের দিন তিনি মহাভারতের রাজসূয় যজ্ঞের বর্ণনাটি অতি নিবিষ্ট মনে পাঠ করেছিলেন। যুধিষ্ঠিরের পরে এমন রাজসূয় আর ভারতে অনুষ্ঠিত হয় নাই। কল্পনায় তাই তাঁর ইন্দ্রপ্রস্থের ঐশ্বর্য্য দেখে নেবার আগ্রহ জন্মেছিল।

কিন্তু এ যুগে আমরা কি করি? রামায়ণ মহাভারত পড়ি না তবুও সমসাময়িক কাব্য, গল্প, নাটক প্রভৃতি থেকে আমার মনের অবস্থানুযায়ী লেখা বেছে নিয়ে পড়ি বইকি আমরাও। এই বেছে নেওয়া এবং পড়া মহাকাব্য সম্পাদনার নামান্তর বা রূপান্তর মাত্র। আধুনিক কালে আমরা যে যার মহাকবি। আমরা যে যার মহাকাব্য সম্পাদনা করে চলেছি জীবন ভোর। আর এ-ভাবেই এ জীবনটা ভালো কিম্বা মন্দ কিম্বা যাহোক একটা কিছু সে সম্বন্ধে আমাদের একটা বিশেষ ধারণা জন্মাচ্ছে। জীবনের যে সামগ্রিকরূপ আমার কালের কবি আমাকে দিতে পারেন নি আমি নিজেই চেষ্টা করে আমার সেই অভাব পূর্ণ করছি। কিন্তু মহাকাব্য আমার চাই-ই।

সুতরাং একথা বললে নিতান্ত অন্যায় বলা হবে না যে আজও যদি কোন কবি সরস্বতীর প্রসাদে জীবনের বিশ্বরূপ দর্শন করার জন্য সঞ্জয় দৃষ্টি লাভ করেন তবে তার অঙ্কিত জীবন আলেখ্য এই মহাকাশ ভ্রমণের যুগেও অনাদৃত হবে না। মহাকাব্যের যুগ গিয়েছে বলে অসার রোদন করার চেয়ে আমরা বরং আশা করে থাকবো সেই মহাকবির যিনি যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষের জীবনের সর্বাঙ্গীন অনুভূতি থেকে তার সামগ্রিক রূপ কল্পনা করে আনন্দে অভিভূত হয়েছেন আর উদাত্ত কণ্ঠে সেই জীবনের জয়গান করেছেন। কলকারখানা, নির্বাচন, আনবিক বোমা, মহিলা মন্ত্রী, পুলিশ, সেনানী, প্রভৃতি নিয়েই আধুনিক জীবন। এরও কাব্য আছে। প্রকৃত কবির কাছে এও মন্দ লাগতো না।—বিদূষী এই আছেন যিনি আমার কালের বিনোদিনী, যদিও মহাকবির কল্পনাতে ছিল না তার ছবি। পয়েন বটে—জুতা মোজা, চলেন বটে—সোজা সোজা বলেন বটে—কথাবার্তা ভিন্নদেশীর চালে, তবু আঁখির কোণে সেই কটাক্ষ আজও বরং দিচ্ছে সাক্ষ্য যেমনটি ঠিক দেখা যেতো কালিদাসের কালে।—কিসের সাক্ষ্য না কাব্য লেখার দিন একেবারে ফুরিয়ে যায় নি তার। এদের নিয়েও বেশ কাব্য লেখা চলতে পারে। শুধু তারজন্য প্রয়োজন উপযুক্ত কবির।

মহাকাব্যের একটি যুগোপযোগী সংস্করণ হচ্ছে আধুনিক উপন্যাস বা নভেল। নভেলের পাঠক যে এত বেশি তার কারণ এইখানেই অনুসন্ধান করলে মিলবে।

নভেলে থাকে কোন একটি বিশেষ সমাজের ছবি, ইতিহাসও বলা চলে। ইহা স্থান কালে সীমাবদ্ধ। একটি উপন্যাসের গল্প মনে করুন। প্রেম বা বিয়ে নিয়েই তার কাহিনী। কিন্তু ওটা যেন উপলক্ষ্য মাত্র। এই উপলক্ষে লেখক আপনাকে দিচ্ছেন তার নায়ক-নায়িকার জীবনের ছবি। তাঁদের জন্ম, তাঁদের শিক্ষা, তাদের বাপ মা ও বংশের কাছে পাওয়া চারিত্রিক গুণ ও দোষাবলী, তাঁদের রাজনৈতিক ও সামাজিক আশা আকাঙ্ক্ষা মতবাদ. তাদের রুজিরোজগারের সুযোগ ও সুবিধা অসুবিধা, তাদের ইহকাল পরকালের চিন্তা ও এসম্বন্ধে বিশ্বাস অবিশ্বাস ইত্যাদি সব। এমন যে পাঠক যদি পুরুষ হন তবে তিনি নায়কের মধ্যে তারই নিজের একটি আদর্শ রূপ দেখতে পাবেন। আর নারী হলে পাবেন নায়িকার মধ্যে, আপনার কালের একখানা ভাল নভেল পড়লে আপনার কালের জীবন সম্বন্ধে আপনার সুন্দর অভিজ্ঞতা হবে। আপনার জীবনটা ভালো কিম্বা মন্দ কিম্বা যা হোক একটা কিছু তা আপনি বেশ পরিপূর্ণ-ভাবেই বুঝতে পারবেন। রামায়ণ পড়ে তৎকালীন অযোধ্যার জীবনের যেমন ছবি পান এ নভেল পড়ে এর সমসাময়িক এতে বর্ণিত সমাজেরও তেমনি ছবি এতে পাবেন। এক কথায় এই নভেলই এই সময়ের এখানকার মহাকাব্য।

তাই আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরকে বলতে ইচ্ছে করে যে মহাশয়, মহাকাব্যের যুগ যায় নি। এখনও প্রতিদিন মহাকাব্য লেখা হচ্ছে অজস্র অসংখ্য। লোকে পড়ছেও তা পরম আগ্রহে, ঠিক যেমন আগ্রহে আপনার ঠাকুরমা দিদিমারা পড়তেন রামায়ণ মহাভারত। রবীন্দ্রনাথ যেমন আধুনিকাদের দেখে বলেছেন।

মরব না ভাই, নিপুণিকা চতুরিকার শোকে—
তারা সবাই অন্য নামে আছেন মর্ত্য লোকে।—

আমরাও আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের আত্মাকে জানাতে পারি যে মহাকাব্যের অভাবে আমরা মরব না। মহাকাব্য এখনও মর্ত্যলোকে অন্য নামে বিরাজ করছে।

রবীন্দ্রনাথ যে জাতীয় কবি নন তার আর একটা অকাট্য প্রমাণ এই যে তাঁর লেখার অর্থ জাতীর ইতর-সাধারণের, এমন কি পণ্ডিতজনেরও বোধগম্য নয়। জাতীয় কবি জাতের প্রতিটি নরনারীর অন্তরের কথাকে ভাষা দেবেন। তার কাব্যে জনগণ তাদের নিজের অকথিত বাণীই শুনতে পাবে। তার অর্থ বুঝি না বলে বিলাপ করবে না। কবির এই সংজ্ঞাই তো রবীন্দ্রনাথ নিজে নির্দেশ করেছেন তাঁর 'কবির বয়স' নামক কবিতায়।—

কেশে আমার পাক ধরেছে বটে,
তাহার পানে নজর এত কেন ?
পাড়ায় যত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি এক বয়সী জেনো।
ওষ্ঠে কারো সরল সাদা হাসি
কারো হাসি আঁখির কোণে কোণে,
কারো অশ্রু উছলে পড়ে যায়—
কারো অশ্রু শুকোয় মনে মনে,
কেউবা থাকে ঘরের কোণে দোঁহে,
জগৎ মাঝে কেউবা হাঁকায় রথ,
কেউবা মরে একলা ঘরের শোকে
জনারণ্যে কেউবা হারায় পথ—
সবাই মোরে করেন ডাকাডাকি,
কখন শুনি পরকালের ডাক ?
সবার আমি সমান বয়সী যে
চুলে আমার যতই ধরুক পাক।

—পাড়ার অর্থাৎ দেশের ছেলে বুড়ো সকলের সুখ-দুঃখ কবিকে ডাকছে। তাই কবি বলছেন,—কে তাহাদের মনের কথা লয়ে
বীণার তারে তুলবে প্রতিধ্বনি।
আমি যদি ভবের কূলে বসে
পরকালের ভালোমন্দই গণি।

সুতরাং যিনি কবি—জনগণের কবি—জাতির কবি তিনি এমন কি বার্দ্ধক্যেও পরকাল চিন্তা করতে বসবেন না। জনগণের মনের কথা লয়ে বীণার তারে প্রতিধ্বনি তোলাই তার একমাত্র কাজ। এমন কবি নিশ্চয়ই এমন গান গাইবেন না যা পাড়ার কারও বোধগম্য হবে না। দেশের লোক হা-হুতাশ করে মরবে না রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা মানে কি? মানস সুন্দরী কে? অন্তর্য্যামী, ভারতভাগ্যবিধাতা, বিশ্বদেব—এসবই বা কারা? অথচ রবীন্দ্র সমালোচনা মানেই হচ্ছে এইসব প্রশ্নের আলোচনা। স্বতঃই জানতে ইচ্ছে করে রবীন্দ্রনাথ জেনে শুনেও এমন কাজ কেন করলেন। অবশ্য একটু বিশ্লেষণ করলেই এর কারণ বোঝা যাবে।

আমরা আগেই দেখেছি জাতির আত্মার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, অন্ততঃপক্ষে অতিশয় ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। আর সে-কথা তিনি নিজেও বুঝতেন। সুতরাং জাতীয় কবি হবার আকাঙ্ক্ষাও তাঁর ছিল না। তিনি বরং নতুন জাতি গড়তে চেয়েছিলেন ভবিষ্যতে। তিনি বর্তমানের কবি না হয়ে ভবিষ্যতের নবী হওয়াই বেছে নিয়েছিলেন। আর ইংরেজী রোমান্টিক কাব্যের প্রভাব পড়েছিল তাঁর মনে। এই রোমান্টিক কাব্যেরই একটি লক্ষণ ছিল স্বকীয় বিশিষ্টতা। রোমান্টিকের গর্ব, আমি নূতন, আমি আর কারো মতন নই। ভাবে, ভাষায়, অর্থে, ছন্দে—এই বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতো রোমান্টিক কবি। তাই তো দেখি ছন্দ নিয়ে পরখ-নিরিখ করতে করতে ইংরাজী কবিতা একদিন ছন্দোহীন হয়ে দাঁড়াল। এমন কি অর্থ নিয়ে লেখকের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলবার জন্যে একসময় লেখা প্রায় অর্থহীন হয়ে গেল। যেমন James Joyce-এর Ulysses. তার ভাষা Punctuation, Capital letter এমনকি syntax এবং Grammar-এরও বন্ধন ছাড়িয়ে গেল। লোকে পড়ে কিছুই বোঝে না সুতরাং পড়তেও চায় না। লেখক বললেন, অত সহজে আমার লেখা বোঝা যাবে না। সারাজীবন চেষ্টা কর তবে বুঝবে। পাঠকেরা মুচকি হেসে বইখানি সরিয়ে একপাশে রেখে দিল। তাদের জীবনের James Joyces-এর বই পড়া ছাড়া অন্য অর্থও আছে। এতটা বাড়াবাড়ি না হলেও দুর্বোধ্যতা রোমান্টিকদের একটা গর্বের জিনিষ। বৈশিষ্ট্যই তাদের স্বকীয় বিশিষ্টতা। রবীন্দ্রনাথও এই স্বকীয় বিশিষ্টতা অর্জন করার লোভ ছাড়তে পারেন নি। কাব্যে এ-অপরাধ যতটা না করেছেন, সমালোচনায় তা শতগুণ বাড়িয়ে তুলেছেন। জানি না আধুনিক বাংলা কবিতার দুর্বোধ্যতার জন্য রবীন্দ্রনাথ নিজেই কতটা দায়ী। তিনি অবশ্য এই দুর্বোধ্যতার বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবাদ করেছেন, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন, কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখলে বুঝতে পারতেন তার নিজের কাব্যই কতটা দুর্বোধ্য—ভাষায় না হলেও তত্ত্বে দুর্বোধ্য, অর্থে দুর্বোধ্য। তিনি না হয় অন্য মানুষের জ্ঞানের অনধিগম্য ভাবধারা পরিবেশন করে দুর্বোধ্য হয়েছিলেন, অপেক্ষাকৃত দুর্বল লেখক জ্ঞানের অংশ একেবারেই বর্জন করেও তো এই দুর্বোধ্যতা অর্জন করতে পারে। হয়েছেও তাই। বিধির বিধানে যে বৃক্ষ তিনি রোপণ করেছিলেন জীবন সায়াহ্নে তার ফলের তিক্ত স্বাদ কথঞ্চিৎ পরিমাণে তাঁকে নিজেকেও আস্বাদন করতে হয়েছিল। আহা "সে"-র লেখক রবীন্দ্রনাথকে যদি একথাটা কেউ সেদিন বলে দিতে পারত!

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

জাতীয় কবি হওয়ার পক্ষে রবীন্দ্রনাথের যে বাধা ছিল তা তিনি নিজেই বিশেষভাবে উপলব্ধি করে থাকবেন। এই উপলব্ধিই তাঁকে জাতীয়তার ক্ষেত্র থেকে আন্তর্জাতিকতার দিকে টেনে নেয়। ভারতবর্ষের অন্তর পুরুষকে না পেয়ে তিনি বিশ্বদেবের দেউলদ্বারে পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করেন। আর সেই বিশ্বদেবতার পূজায় তিনি ভারতকেও অনুপ্রাণিত করতে বাসনা করেন। সুদূর ভবিষ্যতে একদিন ভারতবর্ষও বিশ্বদেবতার জয় ঘোষণা করবে ইহাই তাঁহার আশা।—

নয়ন মুদিয়া হেরিনু জানি না—
কোন্ অনাগত বরষে
তব মঙ্গল শঙ্খ তুলিয়া
বাজায় ভারত হরষে।

নইলে ভারতবর্ষে তো আর জাতীয় বীরের অভাব ছিল না। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এমন বহু চরিত্র এখানে ছিলেন যারা নবতর মহাকাব্যের নায়ক হতে পারতেন। রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়েও এখানে বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য চৈতন্য ও রামকৃষ্ণ ছিলেন, রাজা হর্ষ, বিক্রমাদিত্য ও পৃথিরাজ, শিবাজী কিম্বা রাণা প্রতাপ ও প্রতাপাদিত্য ছিলেন, বাল্মিকী, ব্যাস, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র ছিলেন। আরও কত নাম করা যেতে পারে যাদের চরিত্র ঘিরে ভারতীয় জাতির জীবনের শিক্ষাদীক্ষা আশাকাঙ্ক্ষা আদর্শ মূর্ত হয়ে উঠতে পারত। মহাকাব্য লিখতে চাইলে রবীন্দ্রনাথকে মিল্টনের মত নায়কের অভাবে অসুবিধায় পড়তে হত না। এঁদের মধ্যে একমাত্র বাল্মিকীকে নিয়েই রবীন্দ্রনাথ কিছু লিখেছেন। তারও কারণ খুবই স্পষ্ট। ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি বাদ দিয়ে বাল্মিকীকে শুধু কবিরূপে দেখা যায়। তাঁর কবিত্বলাভও সামান্য একটা নাটিকার বা কবিতার বিষয়বস্তু হতে পারে। বাল্মিকী প্রতিভা এবং ভাষা ও ছন্দ তাই রবীন্দ্রনাথের লেখনী দিয়ে বেরিয়েছিল। এর বেশি ভারতবর্ষ তাঁর সেবা পায় নি।

ভারতবর্ষের বর্তমানের সঙ্গেই কবির মনের যোগ ছিল না, তবে ভবিষ্যৎ তিনি আপন আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তুলবেন আশা করতেন। আর তার অতীত—বৈদিক বা বৈদান্তিক অতীত ও রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার বস্তু ছিল। তাই হয় তিনি ভবিষ্যৎ ভারতের জয়গান গেয়েছেন না হয় অতীতের স্তুতি করেছেন,

কিন্তু বর্তমান ভারতের মর্মমূলে তিনি প্রবেশ করতে পারেন নি। বর্তমানকে তিনি দেখেছেন পথভ্রষ্ট বিচারবিমূঢ় পতিতরূপেই। তাই তো তার জন্যে কবির প্রার্থনা—

চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি...
যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশি
বিচারের স্রোতপথ ফেলে নাই গ্রাসি'—
পৌরুষেরে করে নি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত॥

অর্থাৎ কবির চক্ষে ভারত এমনি দেশ যেখানে (এখন) চিত্ত ভয়শূন্য নয়। মানুষের মাথা অবনত, জ্ঞান মুক্ত নয়...আচারের মরুবালুরাশি বিচারের স্রোত-পথ গ্রাস করে ফেলেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই দুরবস্থার নিরসণ করে, হে ভগবান, তুমি ভারতকে এতদ্বিপরীত উন্নত অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত কর। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ভারতের ভবিষ্যতের নবী হলেও বর্তমানের কবি হতে পারেন নি।

কবির অন্তরে এই যে দেশের সঙ্গে নিত্য বিরোধ ইহা এক পরম অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে। এর হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যই তিনি বিশ্বপ্রেমিক সেজে বসেন। তিনি তাঁর "কবি কাহিনী" সম্বন্ধে যে কয়েকটি নিষ্ঠুর সত্যকথা বলেছিলেন সাধারণভাবে তাঁর বিশ্বজনীনতা সম্বন্ধেও সেই কথা কটিই খাঁটে। কবি কাহিনী সমালোচনা করে তিনি বলেছিলেন, "ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে, তরুণ কবির পক্ষে এইটি খুব উপাদেয়, কারণ ইহা শুনিতে খুব বড় এবং বলিতে খুব সহজ।" (জীবনস্মৃতি)

প্রায় সমস্ত বিশ্বপ্রেমই এই ধরণের। Philanthropy সম্বন্ধে জনৈক ইংরেজ লেখক কি বলেছেন শুনুন।—

"There never was a time in which the simple and obvious duty of minding one's own business has been more generally neglected than the present. Charity—which

was anciently understood to consist in first securing the true interests of Self, and then attending to those of the neighbours, and thence extending, according to its opportunities, to the nation, and vanishing in the cosmopolitan circumference—tends now to begin and end in the circumference : the interests of nation, neighbour and self being regarded as matters of meritorious sacrifice in honour of that vague abstraction, universal beneficence. The simpleton who does not love himself well enough to confer upon that individual the first blessing of self-government—the head of a family who has not mind and character enough to order his own household with justice and affection comforts his conscience by thinking that he has at least the shoulders of an Atlas for the burthens of the world ; and flying from his refractory self and ungovernable private affairs, he takes his place, unquestioned by himself and others, among the guides and gurdians of mankind in general."

"বর্তমানকালের মতন আর কখনও নিজের চরকায় তেল দেওয়ার সহজ এবং সরল কর্তব্যটি এমন সর্বত্র উপেক্ষিত হয় নাই। Charity কথাটার প্রাচীন অর্থই ছিল প্রথমত নিজ নিজ সত্যিকারের স্বার্থ-সাধন, তৎপর যথাসম্ভব প্রতিবেশির স্বার্থসিদ্ধি করার চেষ্টা, এবং তারও পর স্বজাতির স্বার্থ দেখা এবং সর্বশেষে বিশ্বজনীন পরিধিতে বিলীন হওয়া। সেই Charity এখন পরিধিতেই আরম্ভ এবং পরিধিতিতেই বিলয় হইবার উপক্রম করিয়াছে। নিজের, প্রতিবেশির এবং জাতির স্বার্থ আজ বিশ্বজনীনতা নামক কাল্পনিক দেবতার চরণে বলি প্রদত্ত হইতেছে। ফলে যে নির্বোধ তার নিজেকেই এতটুকু ভালবাসে না যাতে করে সে সেই ব্যক্তিটির জন্য আত্মসংযম নামক জগতের সর্বপ্রথম আশির্বাদটি সংগ্রহ করিতে পারে, পরিবারের যে কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিটির এতটুকু মনের বা চরিত্রের জোর নাই যাতে করে পরিবারের কাজগুলি ন্যায় এবং স্নেহের সঙ্গে সম্পন্ন করিয়া পরিবারের কল্যাণ সাধন করিতে পারে, সে তাহার বিবেককে এই বলিয়া সান্ত্বনা দেয় যে এতৎসত্বেও তার স্কন্ধের শক্তি এত বিশাল যে এ্যাটলাস দৈত্যের মত সে সমস্ত পৃথিবীর ভার বহন করিতে সক্ষম। আর এইরূপেই সে নিজের অবাধ্য মন ও দুর্বহ পারিবারিক দায় এড়াইয়া সমগ্র মানবজাতির

পথি-প্রদর্শক ও অভিভাবকগণের অন্যতম হইয়া বসে। এবং ইহাতে সে নিজে এবং অন্য লোকেও অসঙ্গত কিছু দেখিতে পায় না।”

মনে পড়ে পরলোকগত রাজা ৺ শ্রীশচন্দ্র নন্দীর কথা। প্রথম ফজলুলহক মন্ত্রী সভায় তিনি বাংলার রাজস্ব মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন। তখন তার কাশীম-বাজারের জমিদারী Court of wards-এর হাতে। কোন কোন সংবাদ পত্র তাতে বিদ্রূপ করে লিখেছিলেন, Court-এর ward রাজা শ্রীশচন্দ নিশ্চিতই বাংলার উপযুক্ত রাজস্বমন্ত্রী। তিনি পৈতৃক জমিদারী চালাইবার অনুপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছেন বলিয়া Court of wards তাহার জমিদারীর পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এ হেন সুযোগ্য ব্যক্তির হাতে সমগ্র প্রদেশের রাজস্ব ব্যবস্থা ছাড়িয়া দিয়া হক সাহেব উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন। রাজস্বমন্ত্রী হইবার পক্ষে তাহার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি পাওয়া অসম্ভব।

এর উপরে আর টিপ্পনি নিষ্প্রয়োজন।

সৌখীন বিশ্বপ্রেমও Court-এর ward-এর রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হওয়ার মতই।

আমরাও যেন জাতীয় কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে না পেয়ে তাঁকে একটা বিশ্বকবির উচ্চতর মসনদ তৈরী করে দিয়ে বেঁচে গেছি। অবশ্য বহির্বিশ্ব আমাদের এই দাবী স্বীকার করেনি। সেদিনও শতবর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষে যে কয়জন বিদেশী আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন তারা এই বিশ্ব কবিত্বের দাবী অগ্রাহ্য করেছেন। বলেছেন, বহির্বিশ্ব রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি মনে করেনা কারণ তারা রবীন্দ্রনাথকে সামান্যই জানে। তাঁর অতি অল্প লেখার সঙ্গেই তারা পরিচিত। রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করিয়ে দিতে হলে চাই তাঁর সমস্ত ভাল লেখার অনুবাদ। এই অনুবাদের দায়িত্ব বাঙ্গালী জাতির। শুধু ইংরেজীর মারফৎই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের দরবারে স্বীকৃতি পেয়েছেন। যতগুলি সম্ভব বেশী বড় বড় ভাষায় তাঁর লেখার অনুবাদ করতে হবে তবে হয়তো একদিন বহির্বিশ্বও রবীন্দ্রনাথকে আপনার করে নিতে পারবে। ফাদার ফালোঁ এবং ডক্টর এয়ারনসন এই মতের সমর্থক।

বিশ্ব কবির মধ্যে শুধু জাতিগোষ্ঠীর নয় সর্বজনগ্রাহ্য ভাবধারা থাকা চাই। কিন্তু সেটাই সব নয়। সে ভাবধারার বিশ্বজনীন প্রচারও প্রয়োজন। এই বহুল প্রচারের পরই সেক্সপীয়ার বিশ্বকবি হয়েছেন, বলেছেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। সেদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বকবি হবার সময় এখনও আসেনি। আর সে

সময় এনে দেবার দায়িত্বও আমরা যে পালন করতে পারব তা মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের মতে সেক্সপীয়র যখন জন্মেছিলেন তখন তিনি ছিলেন একজন ইংরেজ। কবি হলেন প্রথমতঃ ইংলণ্ডেরই। কিন্তু এ যেন সেই সকালবেলাকার বালসূর্য, যতক্ষণ সে দিগন্তশায়ী ততক্ষণ সে স্থানবিশেষের। ধীরে ধীরে তার আকাশ যাত্রা এগিয়ে চলে, মধ্যাহ্ণে সে আকাশের এবং জগতের বিশ্ববিন্দুরূপে প্রচণ্ড জ্যোতিঃপুঞ্জ হয়ে বিরাজ করে। তখনই সে বিশ্বের। কবির জীবনে শতাব্দীগুলো যেন প্রহর। দুই শতাব্দীতে সেক্সপীয়রের কবি যশঃসূর্য মধ্যাহ্ণ-বিন্দু ছুঁতে পারল। তখন তিনি বিশ্বকবি হলেন।

যেদিন উদিলে তুমি, বিশ্বকবি, দূর সিন্ধুপারে,
ইংলণ্ডের দিক্‌প্রান্ত পেয়েছিল সেদিন তোমারে
আপন বক্ষের কাছে, ভেবেছিল বুঝি তারি তুমি
কেবল আপন ধন ; উজ্জ্বল লালাট তব চুমি'
রেখেছিল কিছুকাল অরণ্যশাখার বাহুজালে,
ঢেকেছিল কিছুকাল কুয়াসা-অঞ্চল অন্তরালে
বনপুষ্পবিকশিত তৃণঘন শিশির-উজ্জ্বল
পরীদের খেলার প্রাঙ্গনে।.........
... ...
তারপরে ধীরে ধীরে অনন্তের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে
দিগন্তের কোল ছাড়ি শতাব্দীর প্রহরে প্রহরে
উঠিয়াছে দীপ্ত জ্যোতি মধ্যাহ্ণের গগনের 'পরে ;
নিয়েছ আসন তব সকল দিকের কেন্দ্র-দেশে
বিশ্বচিত্ত উদ্ভাসিয়া ; তাই হেরো যুগান্তর শেষে
ভারত সমুদ্রতীরে কম্পমান শাখাপুঞ্জে আজি
নারিকেল কুঞ্জবনে জয়ধ্বনি উঠিতেছে বাজি'।

ইংরেজী গীতাঞ্জলির ভূমিকা লিখে দিয়ে আইরিশ কবি উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস্‌ রবীন্দ্রনাথকে বহির্বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তিনিও কবিকে ভারতীয় বলেই তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও স্বপ্নবিলাস এবং ভাবালুতাই ইয়েটস্‌ এবং ইউরোপকে মুগ্ধ করেছিল। ইউরোপীয় কবি হিসেবে তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে নোবেল প্রাইজ দেন নি।

আবার অন্তরের দিক দিয়েও রবীন্দ্রনাথ বর্তমান ভারতের মত বর্তমান ইউরোপকেও গ্রহণ করতে পারেন নি। সেখানেও তাঁর দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে। বিশ্বকে নিয়েও রবীন্দ্রনাথ তাই খুসী হতে পারেন নি। তারও বর্তমানকে পরিহার করে তিনি ভবিষ্যতের জয়গান করেছেন। বর্তমানের ইউরোপকে তিনি দেখেছেন—

জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ডুবাতে চাহে বলের বন্যায়।

আর—

চলিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বহি স্বার্থতরী গুপ্ত পর্বতের পানে।

ইউরোপের সৃষ্ট নগর সভ্যতাকে কবি করেছেন প্রত্যাখ্যান—

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লও যত লোষ্ট্র লৌহ কাষ্ঠ ও প্রস্তর,—
হে নব সভ্যতা। হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী—

বরং কবির মন কেঁদেছে প্রাচীন ভারতের আরণ্যক সভ্যতার জন্যই। সেই শান্ত সরল জীবনই তিনি ফিরে চেয়েছেন।—

দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়া রাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি। সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান,
নীবার ধান্যের মুষ্টি,—বল্কল বসন,
মগ্ন হয়ে আত্ম-মাঝে নিত্য আলোচন
মহা তত্ত্বগুলি।

তাই তার ভবিষ্যতকে কবি দেখেছেন ভারতের অতীতের সহিত সংযুক্ত। ভবিষ্যৎ ইউরোপের কণ্ঠে তিনি শুনেছেন অতীত ভারতের প্রণবধ্বনি।

ডুবায়ে ধরার রণহুঙ্কার,
ভেদি বণিকের ধনঝঙ্কার—
মহাকাশ তলে ওঠে ওঙ্কার
কোন বাধা নাহি মানি।

জাতীয় কবি না হতে পেরে বিশ্বকবি হতে যাওয়া নিজের এবং পরিবারের প্রতি কর্তব্য পালন না করে বিশ্বহিতৈষণারই মত।

রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথ

দূরের আকর্ষণ

পাঠক এই পর্য্যন্ত পড়ে বলে উঠবেন, বরীন্দ্রনাথ তা হলে জাতীয় কবি ও নন, আবার বিশ্বকবিও নন, তবে তিনি কি? আমি আপনার ক্ষুব্ধ সুর লক্ষ্য করছি। ভুল হবে না।

তিনি যে কি তা এই বিশ্লেষণের মধ্য থেকেই পাওয়া যাবে। তিনি একজন রোমান্টিক।

আমরা দেখেছি তিনি কি ভারতের কি বিশ্বের কাহারও বর্ত্তমানটাকে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি অতীতকে ভালবেসেছেন ভবিষ্যতকে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু বর্তমানকে দেখেছেন তাঁর শত্রুরূপে। বর্ত্তমানের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ। কাছের চেয়ে দূরের ওপর তাঁর আকর্ষণ, ঘরের চেয়ে বাইরের ও পরের। সত্যিই তিনি সুদূরের পিয়াশী। সুদূরের ব্যাকুল করা বাঁশীর সুরে তাঁর মন পাগল। চিরকালের রোমান্টিকের এই লক্ষণ। রোমান্টিক কল্পনার আর একটি প্রকাশ অতীত হয়ে একেবারে আদিম যুগের পানে আকর্ষণ। Noble Savage তাই রোমান্টিক কবির এক প্রিয় কল্পনা। Rousseau থেকে আরম্ভ করে সমস্ত রোমান্টিক কবিই এক সময়ে এই Noble Savage-এর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করেছেন। আমাদের রবীন্দ্রনাথও তা থেকে বাদ পড়েন নি। তাঁরও কণ্ঠে শুনতে পেয়েছি—

ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুইন,
চরণতলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন।
ছুটছে ঘোড়া, উড়ছে বালি
জীবনস্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয়তলে বহ্নি জ্বালি
চলেছে নিশিদিন;
বরশা হাতে ভরসা প্রাণে
সদাই নিরুদ্দেশ
মরুর ঝড় যেমন বহে
সকল বাধাহীন।

যে বেদুইন অসভ্যতার পায়ের চাপে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতভূমির কয়েক শতাব্দী অন্তরাত্মা খাঁচা ছাড়া হবার উপক্রম হয়েছিল, সেই বেদুইন দস্যুদেরই কী আদর্শ চিত্রই না ফুটে উঠেছে কবির দৃষ্টিতে।—

বিপদ মাঝে ঝাপায়ে পড়ে,
শোণিত উঠে ফুটে ;
সকল দেহে সকল মনে
জীবন জেগে উঠে।
অন্ধকারে, সূর্যালোতে,
সন্তরিয়া মৃত্যুস্রোতে
নৃত্যময় চিত্ত হতে
মত্ত হাসি টুটে,
বিশ্বমাঝে মহান যাহা সঙ্গী পরাণের—
ঝঞ্ঝামাঝে ধায় সে প্রাণসিন্ধু মাঝে লুটে।

রোমান্টিক Marloweও তৈমুরলঙ্গের সভ্যতাবিনাশী পাশব অভিযানের জয়গান করেছেন।

ইউরোপেও রোমান্টিক যুগটা একটা Revival বা অতীত যুগের পুনরুজ্জীবন নিয়ে শুরু হয়েছিল। রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পর পলাতক ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পণ্ডিতের দল ইউরোপের নানাস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে সেখানে অল্পে অল্পে প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য ও বিদ্যার চর্চা সুরু করেন। অতীতের এই প্রসাদ বা স্বাদ ইউরোপের দেশগুলির তৎকালীন বর্তমানকে বিস্বাদ করে দিয়ে তাদের মধ্যে গ্রীক ও রোমের প্রাচীন ঐতিহ্যের ভিত্তিতে নূতন জীবন ও সংস্কৃতি গড়ে তোলে। এলিজাবেথান ইংলণ্ড তাই গ্রীস ও রোমের দত্তক সন্তান। সেক্সপীয়ার সোফোক্লিস, ইসকাইলশ ও ইউরিপিডিশের উত্তরাধিকারী।

কিন্তু সেক্সপীয়ারের উদাহরণটা ভাল হল না। তিনি ইংলণ্ডে রোমান্টিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু তাঁর সময়ে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী আর রোমান্টিক নাই। রোমান্টিকদের মধ্যেও ক্লাসিক তৈরি হয়ে গেছে। বর্তমানের সঙ্গে বিরোধ এবং অতীতের প্রতি আকর্ষণ এই দুইটি জিনিষই সেক্সপীয়ারের নাই। সেক্সপীয়ার যা কিছু দূর ও বিজাতীয় সবই নিকট এবং জাতীয় করে নিয়েছিলেন। এমন যে সনেট, যার শারীরিক গঠন বা কাঠামোটাই

ইতালীয় বা বিজাতীয় তাকেও সেক্সপীয়ার ঢেলে ইংরেজ করে সাজালেন। পেট্রার্কান বা ইতালীয়ান সনেট থেকে সেক্সপীয়ারিয়ান বা ইংলিশ সনেট একেবারে আলাদা জিনিষ হয়ে দাঁড়াল। সেক্সপীয়ার সুদূরের পিয়াসী নন—তিনি বরং—**True to the kindred points of Heaven and Home**—দেশ ও বিদেশের মধ্যে যেখানে ঐক্য সেখানেই সেক্সপীয়ারের নিষ্ঠা।

ইংলণ্ডে রোমান্টিক যুগ সেক্সপীয়ারের বহু আগেই আরম্ভ হয়েছিল। বাংলায় রবীন্দ্রনাথ ও রোমান্টিক যুগ সমসাময়িক। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ থেকেই ব্রাহ্ম মতের আরম্ভ যে মত বা চিন্তা বর্তমানকে পরিত্যাগ করে অতীতের বৈদান্তিক মতবাদকে গ্রহণ করেছিল। সেই চিন্তা রবীন্দ্রনাথেই পূর্ণতা লাভ করে। ধর্মে, সাহিত্যে, শিল্পে, এমন কি সমাজ ব্যবস্থায়ও রবীন্দ্রনাথ অতীতের ভাণ্ডারে আদর্শের অনুসন্ধান করেন। তিনি নূতন যুগের অন্যতম প্রবর্তক। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে দ্বিতীয় রোমান্টিক যুগের মত মধ্যযুগের পুনরভ্যুত্থানকামী। ভানুসিংহের পদাবলী বাংলার মধ্যযুগ অর্থাৎ বৈষ্ণবযুগের পুনরুত্থানের নিদর্শন।

বৈষ্ণব সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন

আমার মনে হয় ভানুসিংহের পদাবলী এই দিক দিয়ে যথোচিতভাবে বিবেচিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের অপটু রচনাও অর্বাচীন জালিয়াতি হিসেবে কবির সঙ্গে আত্ম-পরিহাসে যোগ না দিয়ে, চ্যাটার্টনের মধ্যযুগের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সমতুল্য রবীন্দ্রনাথের পদাবলীও বাংলায় মধ্যযুগের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা রূপে দেখলে আমরা অনেক বেশি উপকৃত হতে পারতুম। প্রকৃতপক্ষে এই সময়েই বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য ইংরেজীশিক্ষিত অর্থাৎ নব্য বঙ্গ সমাজে প্রচলনের চেষ্টা হয়। এই সময়েই ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জগদ্বন্ধুভদ্র প্রথম বৈষ্ণবপদাবলী সম্পাদনা করেন। এই পুস্তকের নাম মহাজন পদাবলী। রবীন্দ্রনাথ এই বই পড়েছিলেন। এ বইয়ে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী ও টীকা এবং উভয় কবির সম্বন্ধে সমালোচনা ছিল। তারপর বের হয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্রের—"প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ" (১৮৭৪-৭৬)। ক্রমে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও একাজে হাত দেন। পরে বৈষ্ণব সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন কার্য যথাযথরূপেই সুসম্পন্ন হয়। জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লক্ষ্য করেছেন যে "আধুনিক যুগে মাইকেল মধুসূদন 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' (১৮৬১)

বৈষ্ণবভাবের কবিতা রচনা করেন সত্য কিন্তু ব্রজবুলি ভাষা তিনি প্রয়োগ করেন নাই। আমাদের মনে হয় আধুনিক কবিতায় সর্বপ্রথম ব্রজবুলি ভাষা ব্যবহার করেন বঙ্কিমচন্দ্র। মৃণালিনী উপন্যাসে যে তিনটি গান আছে তাহা এই মিশ্র ভাষায় রচিত।" সুতরাং ভানুসিংহের পদাবলী এই মধ্যযুগের পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টারই অন্তর্গত। এটা একটা ষোল আনা রোমান্টিক কর্ম।

বৈষ্ণব সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন যে শেষ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নি তারও বিশেষ কারণ ছিল। প্রথমত এ সাহিত্য যুগোপযোগী নয়। তা ছাড়া এতে শুধুমাত্র ভক্তিবাদ ও আধ্যাত্মিকতা ছাড়া আর কিছুই নাই। পশ্চিমের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রখর মধ্যাহ্ন জ্যোতির সামনে বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রদোষ আলোক লেখক ও পাঠক সমাজের চোখে নিতান্তই নিস্তেজ বলে মনে হয়ে থাকবে।

রবীন্দ্রনাথও যে আর বেশি বৈষ্ণবপদ রচনা করতে উৎসাহ বোধ করেন নি তার আরও একটা কারণ ছিল। সে হচ্ছে বৈষ্ণব যুগের স্বল্প ব্যবধান। রবীন্দ্রনাথ যে সময়ে তাঁর পদাবলী রচনা করেন তখনও বাংলার গ্রামে গ্রামে বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তন লোকের সর্বপ্রধান সাংস্কৃতিক কর্ম ও ধর্মীয় উৎসবাঙ্গ। কলিকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সম্বন্ধেও একথা অতি সত্য। এমন কি রবীন্দ্রনাথের নিজের পিতামহ দ্বারকানাথও ধর্মে বৈষ্ণব ছিলেন। সুতরাং পদাবলীর ভাষায় যে অতীতের আকর্ষণ ছিল তার ভাবে সেটা ছিল না। লেখকের মনে তা সৃষ্টির প্রেরণা জোগাতে পারে নি। পাঠকের প্রাণেও তা পারে নি অপরিচয়ের সাড়া আনতে। বরং কবির সমকালীন বস্তু হিসেবে কীর্তনের ওপর তাঁর একটা রোমান্টিক বিরাগই ছিল স্বাভাবিক। এই কীর্তন লীলাকেই ধিক্কার দিয়ে তিনি লিখেছিলেন—

যে ভক্তি তোমারে লয়ে, ধৈর্য্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহ্বল হয়, নৃত্যগীত গানে
ভাবোন্মাদ-মত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল-ফেন ভক্তি-মদ-ধারা
নাহি চাহি নাথ। (নৈবেদ্য—৪৫)

কৈশোরে যে এই উন্মত্ত ভাবরাশি কবির নিজের চিত্তও উদ্বেলিত করেছিল তার প্রমাণ রয়েছে এর পরের সনেটটিতে।—

মাতৃস্নেহ-বিগলিত স্তন্য-ক্ষীর-রস
পান করি' হাসে শিশু আনন্দে অলস,—

তেমনি বিহ্বল হর্ষে ভাবরস রাশি
কৈশোরে করেছি পান, বাজায়েছি বাঁশি
প্রমত্ত পঞ্চম স্বরে,.........
.........আজি সেই ভাবাবেশ
সেই বিহ্বলতা যদি হয়ে থাকে শেষ,
প্রকৃতির স্পর্শ মোহ গিয়ে থাকে দূরে,—
কোনো দুঃখ নাহি। পল্লী হতে রাজপুরে
এ বার এনেছ মোরে, দাও চিত্তে বল।
দেখাও সত্যের মূর্ত্তি কঠিন নির্মল।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য রস ততটা নয় যতটা বৈষ্ণব ভক্তি রসের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ। বৈষ্ণবের কোমল কানাই, মধুর গোপাল মূর্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহটা অনেক বেশি। কবি বরং 'সত্যের' 'কঠিন নির্মল মূর্তি' দেখবেন, যা পরে দেখলেন 'রাজা' নাটকে, অরূপরতনে। কঠোপনিষদের সত্য, নচিকেতার দর্শন।—

রোমান্টিকের বিদ্রোহ

বর্তমানের প্রতি বিরূপতা রোমান্টিকের চরিত্রকে 'বিদ্রোহী' রূপে ফুটিয়ে তোলে। সে যাহা কিছু আছে তাহারই প্রতি বিরূপ—ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ও শিল্প কিছুই তাহার কালাপাহাড়ী জেহাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না। অবশ্য নিছক ধ্বংশেই তার আনন্দ নাও হতে পারে। বড়ো আধার হলে, সৃষ্টির প্রেরণা এবং সামর্থ্যও থাকতে পার তার ভেতরে। বর্তমানের প্রতি বিমুখতা তাকে নিয়ে যায় এক কল্পলোকের সন্ধানে। তার চোখে জাগে এক ইউটোপিয়া বা আজবদেশ। সে জানে না সে দেশ কোথায় কিন্তু তবু সেখানে যাবার জন্যে তার প্রাণ চঞ্চল। অন্ধকারে তারই পথ খুঁজে মরে সে।

ঘরের ঠিকানা হল না গো
মন করে তবু যাই যাই।
ধ্রুবতারা তুমি যেথা জাগো
সে দিকের পথ চিনি নাই।

রোমান্টিকের এই বিদ্রোহী ভাবটা দেখতে পাই ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থ বায়রণ ও

শেলীর মধ্যে। শেলীর মধ্যে সব চেয়ে বেশি। আমাদের কাছে বিদ্রোহ কথাটার যে অর্থ সেই রাজনৈতিক বিদ্রোহ শেলিতেই সর্বাধিক। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও বিদ্রোহী হয়ে ফরাসী বিপ্লবে যোগ দিতে গিয়েছিলেন, বায়রণ গ্রীসের মুক্তি সংগ্রামে তো শহীদই হয়ে গেলেন। রুশোর সাম্য সৌভ্রাত্র স্বাধীনতার এঁরা সকলেই ছিলেন পূজারী। রাজনীতিবাদ দিয়ে যে সমাজ সেই সমাজের বিরুদ্ধেও ইঁহাদের বিদ্রোহের অন্ত ছিল না। ধর্ম, আচার-আচরণ বিবাহবিধি সব কিছুরই মধ্যে ওরা ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরোধী যা দেখতে পেয়েছেন তাকেই আঘাত করেছেন। শেলী নিরীশ্বরতার প্রয়োজন সম্বন্ধে পুস্তিকা লিখে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার বরণই করলেন। বিবাহবিধির অবমাননা করে দেশ ছেড়ে বিদেশে আশ্রয় নিলেন। নরনারীর সম্পর্ক ব্যাপারে বায়রণের ভূমিকা তো এক কলঙ্কের ইতিহাস হয়েই দাঁড়িয়েছিল। এমন কি পরবর্তী-কালের গোড়া সংরক্ষণশীল ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থও নাকি ফরাসী দেশে 'স্বাধীন' বিবাহ করে একটি কন্যার জনক হয়েছিলেন। সে কলঙ্কের ইতিহাস অবশ্য ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থের জীবিতকালে লোকচক্ষুর অন্তরালেই ছিল।

রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের এই বিদ্রোহের দিকটা ভাল করে বিশ্লেষণ করেছেন বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। তার "বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ" এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা গ্রন্থ। পরাধীন দেশে যৌবনে রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে না বা পাবার জন্যে ছটফট করে না এমন অপদার্থ লোক খুব কমই থাকে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক অর্থে বিদ্রোহী না হয়ে যেতেন কোথায়? আর এর সঙ্গে নিপীড়িতের জন্য বেদনাবোধ এবং তাদের দুর্দশা মোচনের প্রচেষ্টা ও রবীন্দ্রনাথে সবিশেষ পরিদৃষ্ট হয়।

কবি চরিত্রের এই দিকটা ভাল ফুটে উঠেছে সুধীর চন্দ্রকরের "**জনগণের রবীন্দ্রনাথে**"।

পরাধীন দেশে স্বাদেশিকতা ও রাজদ্রোহীতা একেবারে এক না হলেও পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। দেশের কল্যাণ কামনার প্রথম কথাই সেখানে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন। আর স্বাধীনতার যুদ্ধে সৈনিকের কাজের চেয়ে কবির কাজ কোন অংশেই লঘুতর তো নয়ই বরং অনেকাংশে অত্যধিক গুরুত্ব সম্পন্ন। পরাধীনতার চাপে মূঢ়, মুক, নিরাশাগ্রস্ত, দুর্বল, দরিদ্র জনগণকে উৎসাহ দেওয়া, যুদ্ধের জন্য তাদের প্রবুদ্ধ করা কবি, লেখক, নায়ক ও বক্তাদের কাজ।

এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা : এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।

যে ব্রত নিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, গোখেল, তিলক, গান্ধী—সেই ব্রতই হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রঙ্গলাল, রবীন্দ্রনাথ, গিরীশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও নজরুল এবং আরও কত কবি, ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। বক্তার চেয়ে বরং কবির একটা এই সুবিধে যে স্বাধীনতার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করে তুলতে তাদের মিটিং ডাকতে হয় না। বিশেষ দিনে বিশেষ স্থানে সেজন্য কাউকে সমবেত হতে হয় না, আর পুলিশের লাঠিও সেই সমবেত জনতার মস্তকে বর্ষিত হয়ে সে সভা পণ্ড করে দিতে পারে না। একা নির্জনে শুধু বই পড়েই দশটা সভার বক্তৃতা শোনার কাজ হয়ে যেতে পারে। আর সভায় শোভাযাত্রায় স্বদেশী গানই তো ছিল প্রেরণা। গানে মানুষকে যত সহজে মাতায় তেমন আর কিছুতেই নয়। তাই স্বদেশী গান আর স্বদেশী বক্তৃতার মধ্যে গানের দান স্বাধীনতা সংগ্রামে বেশি ছাড়া কম ছিল না। অবশ্য সভা শোভাযাত্রায় পুলিশের লাঠি খেয়ে এবং জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনে গানের ওপর মানুষের শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ বেড়ে যেত। তার শ্রোতা এবং পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি হত। এভাবেই গান ও কাজ পরস্পরের পরিপূরকের কাজ করত। কণিকায় রবীন্দ্রনাথ তাই তো লিখেছেন—

বাণী কহে—তোমারে যখন দেখি, কাজ,
আপনার শূন্যতায় বড়ো পাই লাজ।
কাজ শুনি কহে—অয়ি পরিপূর্ণা বাণী,
নিজেরে তোমার কাছে দীন বলে জানি।

বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে দিলেন জাতীয়সঙ্গীত—বন্দেমাতরম—আর সেই মাতৃবন্দনা গেয়েই স্বাধীনতার সৈনিক চললো প্রাণ দিতে। আনন্দমঠে বাংলার বিপ্লবী ছেলেরা তারও বেশি পেল—গুপ্তসমিতি গঠনের আদর্শ ও ইঙ্গিত। রাজপুত ও মারাঠার মুসলমানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে কত উপন্যাস নাটক ও কাহিনী রচিত হল যা থেকে ভবিষ্যতের স্বাধীনতার যোদ্ধগণ পেল দেশপ্রেমের প্রেরণা। আর নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধ তো আরও সরল ভাষায় ইংরেজ বিদ্বেষী। যুদ্ধাবসানে মোহনলালের খেদ বাংলার যুবকদের মুখে হাহাকারের মত শোনাতে লাগল। এ যেন স্বাধীনতা হারিয়ে বঙ্গজননীর আর্তনাদ।

কোথা যাও ? ফিরে চাও, সহস্র কিরণ,
বারেক ফিরিয়া চাহ, ওহে দিনমণি,
তুমি অস্তাচলে দেব করিলে গমন
আসিবে ভারতে চির বিষাদ রজনী।

প্রস্তুতি পর্বের এই পরিপেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের মত একজন উদার যুবক কি নিশ্চেষ্ট থাকতে পারেন ?

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবগোপাল মিত্র "স্বাদেশিকদের সভা" স্থাপন করেন। অতঃপর ইহাদেরই প্রচেষ্টায় "হিন্দুমেলা" স্থাপিত হয়। স্বদেশীয় শিল্পের উন্নতি, সাহিত্যের বিকাশ, সঙ্গীতের চর্চা প্রভৃতি এই মেলার উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এই মেলার প্রথম অধিবেশন বসে। দ্বিতীয় বার্ষিক সভায় গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বর্ণনায় আছে—"ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভাব যে, আমাদের সকল কার্য্যেই আমরা রাজপুরুষগণের সাহায্য যাচ্ঞা করি, ইহা সাধারণ লজ্জার বিষয়।······অতএব যাহাতে আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়, ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার উদ্দেশ্য।"

পাঠক এইখানে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজ স্মরণ করুন। সে প্রবন্ধ গণেন্দ্রনাথ বর্ণিত এই উদ্দেশ্যের বিস্তৃত রূপ ছাড়া আর কিছুই নহে। রবীন্দ্রনাথের লেখার গুণে সেটা এতবড় একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে রবীন্দ্রভক্ত অনেক বুদ্ধিমান লোক পর্য্যন্ত এই প্রবন্ধকে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তার পরিপূর্ণ বিকাশ বলে মনে করতেন। ১৯৪২-এর আগষ্ট বিপ্লবের ডামাডোলের মধ্যে জীবনীকার প্রভাতবাবু একদিন এই মর্মে এক প্রবন্ধ লিখে শান্তিনিকেতনে পাঠ করেন। উপস্থিত সকলেরই সহর্ষ অনুমোদন তিনি লাভ করেছিলেন প্রথমে, কিন্তু আপত্তি তুলেছিলাম আমি। আমি বলেছিলাম, রবীন্দ্রনাথ পরবর্তিকালে বুঝেছিলেন রাষ্ট্র ও সমাজের পার্থক্য আর চলবে না। আধুনিক কালে রাষ্ট্রই সমাজ। মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি তাই সামাজিক উন্নতির জন্য রাষ্ট্রশক্তি আয়ত্ত্ব করবার চেষ্টা করছেন এবং রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে তাঁদের সহায়ক। রবীন্দ্রনাথের অপরিণত চিন্তার ফলটা আপনারা তাঁর পাকা ফসল বলে বিশ্বের সামনে উপস্থিত করার অভ্যাসটা ত্যাগ করুন। ওতে কবির অসম্মানই করা হয়। প্রভাতবাবু খুব অসন্তুষ্টই হয়েছিলেন, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য

সফল হয়েছিল। আমি যতদূর জানি অতঃপর তিনি আর 'স্বদেশী সমাজের' আদর্শ প্রচার করার চেষ্টা করেন নি।

সে যাহা হোক, এই হিন্দুমেলা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়সেই—মাত্র সাড়ে তেরো—স্বদেশী কবিতা ও গান লিখতে আরম্ভ করেন। পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাহার বন্ধুদের 'সঞ্জীবনী সভার' সহিতও রবীন্দ্রনাথ সংযুক্ত হন। অবশ্য অর্বাচীন এই সভাটিতে কাজ কিছুই হয় নি। তবে রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজন মিটেছিল। স্বদেশী কবিতা লেখার জন্যে যেটুকু উৎসাহ প্রয়োজন তা তিনি এ সভা থেকে পেয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন—"সেই সভায় আমরা এমন একটি খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে, অহরহ উৎসাহে যেন আমরা উড়িয়া চলিতাম। লজ্জা ভয় সংকোচ আমাদের কিছুই ছিল না। এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো।"

একান্ত অনুকৃতি থেকে এই গানগুলি ক্রমে ক্রমে বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বদেশী গান হয়ে ওঠে। তা' ছাড়া প্রবন্ধ কাহিনী এমন কি বক্তৃতায়ও রবীন্দ্রনাথ হাত লাগাতে ছাড়েন নি। আর রাজনৈতিক সভাসমিতিতে গান গাওয়া তো ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের একটা মস্তবড় স্নবিধে। বন্দেমাতরমের সঙ্গে "জনগণ মন"-ও যে আমাদের জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হয়েছে তার পেছনে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ সাধনা।

কিন্তু স্বাদেশিকতার প্রচুর উত্তেজনা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ দেশের সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করেন নি। তাঁর নিজের উপযোগিতা সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিল। তিনি জানতেন স্বাধীনতা সংগ্রামে তার অবদান হবে এই গান। সুতরাং তদতিরিক্ত কিছু করতে চেষ্টা করেন নি। প্রবল উত্তেজনার মধ্যেও তাঁর বুদ্ধি ঠিক ছিল। সেই প্রেমে পড়ে De Quincey যেমন বলেছিলেন, I was only over the ears in love; my head was above it still. রবীন্দ্রনাথ ও স্বাদেশিকতায় মাত্র আকর্ণ নিমজ্জিত হয়েছিলেন। মস্তিষ্কটি তাঁর দিব্যি শুষ্ক খটখটেই ছিল। তিনি ফাঁসি, নির্বাসন বা জেলখানা থেকে দূরে দূরেই রেখেছিলেন নিজেকে। দেশেরও তাতে লাভই হয়েছে। ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, বারীন ঘোষের দলে না গিয়ে তিনি কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতির দল ভারি করেছেন।

তবে মাঝে মাঝে তাঁর এই সহজ পথ বেছে নেবার জন্য হয়ত নিজের ওপর

ধিক্কৃতি আসতো। এবার ফিরাও মোরে এই রকমই একটা মানসিক অবস্থায় রচিত।—

> সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শতকর্মে রত,
> তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মত
> মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ন তরুছায়ে
> দূর বনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্ত বায়ে
> সারাদিন বাজাইলি বাঁশি।

আর নিজের এই অলস ব্যসনের সামনে তিনি দেখতে পেলেন অন্যদের নিরলস কাজ। তাই নিজেকে ডাকলেন, "ওরে তুই ওঠ্ আজি।" এর পরের দেড় লাইনের মানে এই প্রসঙ্গেই বুঝতে হবে।—

> আগুন লেগেছে কোথা? কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি'
> জাগাতে জগৎ জনে।

এ আগুন বিদ্রোহের আগুন—বিপ্লবের বহ্নিশিখা। এ শঙ্খ ভবিষ্যৎ কুরুক্ষেত্রের পাঞ্চজন্য। ভারতবাসীকে জাগাবার জন্যই তা বেজে উঠেছে। স্বাধীনতার সংগ্রামের তরে যারা প্রস্তুত হতেছিল ঘরে ঘরে তাদের ডাক দিয়েছিল এই শংখ।

এর পরে আছে এই রণোদ্যমের কারণ। বন্দিনী দেশের কান্নায় গগনতল উদ্বেলিত, পরাধীনতার অপমান, বিদেশী শাসনের শোষণ, দুর্বলের উপর নিদারুণ অত্যাচার তিলে তিলে জাতের মর্মদলন করে দিচ্ছে। অজ্ঞ ভারতবাসী অসহায় ভাবে মুখের গ্রাসে বঞ্চিত হয়ে মৃত্যু বরণ করছে, কাকেও—এমন কি অদৃষ্টকেও এর জন্য দায়ী করছে না।

> কোন অন্ধ কারা মাঝে জর্জর বন্ধনে
> অনাথিনী মাগিছে সহায়। স্ফীতকায় অপমান
> অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি, করিতেছে পান
> লক্ষমুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস
> স্বার্থোদ্ধত অবিচার, সংকুচিত ভীত ক্রীতদাস
> লুকাইছে ছদ্মবেশে। ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
> মূক সবে, ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
> বেদনার করুণ কাহিনী; স্কন্ধে যত চাপে ভার

বহে চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার—
তারপরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
নাহি ভৎর্সে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দু'টি অন্ন খুঁটি কোনমতে কষ্টে ক্লিষ্টে প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে।

এই যে মূঢ় ম্লান মূকের দল এরা সমাজের শ্রেণীবিশেষ নয়। এরা সমগ্র ভারতীয় সমাজ। বিদেশী শাসনের শোষণে সকলেরই এক অবস্থা। শুধু যারা অপমানিত শ্রেণী তারা এ কবিতার উপজীব্য নয়। এদের জন্য কবি যা করতে পারেন সে হচ্ছে তার জন্ম হতে লব্ধ বীণাখানি বাজিয়ে তাদের দুঃখকে ভাষা দেওয়া, তাদের নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করা।—

সে বাঁশিতে শিখেছি যে সুর
তাহারি উল্লাসে যদি শীতশূন্য অবসাদপুর
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সংগীতে
কর্মহীন জীবনের একপ্রান্ত পারি তরঙ্গিতে
শুধু মুহূর্তের তরে—দুঃখ যদি পায় তার ভাষা,
সুপ্তি হতে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি—তবে ধন্য হবে মোর গান,
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্বাণ।

কিন্তু এ কবিতাটিতে একটু মানসিক গোঁজামিল আছে। স্বাভাবিকভাবে দেশের জন্য যে প্রাণোৎসর্গ ও তার মহিমা এবং সঙ্কল্পটা এই কবিতার পরিণতি হতে পারতো, খানিকটা আত্মরক্ষার তাগিদেই যেন কবি সেটাকে একটা বিশ্বপ্রেম ও ধর্মীয় আলখাল্লা পড়িয়ে দিয়েছেন। স্বাধীনতার সৈনিকরা কিন্তু এই ছদ্মবেশ ছাড়িয়েই এ কবিতার অর্থ গ্রহণ করেছে।

যাব অভিসারে
তার কাজে—জীবন সর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি।

এরপর কে সে। জানি না কে, চিনি নাই তারে—

কবির আইনের আওতায় না পড়ার চেষ্টামাত্র। তিনি যা জানেন স্বাধীনতার সৈনিকেরা তাতেই সন্তুষ্ট। তাতেই তাদের প্রয়োজন মিটেছিল।—তারা জানতো এই সে-টি তাদের আরাধ্য স্বাধীনতা বা মুক্তি।

শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পারে
ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি।

এরপর থেকে কতগুলো লাইন তো বিপ্লবীদের বাইবেলের মত হয়ে গিয়েছিল,—

যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সংকট-আবর্ত-মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষপাতি, মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সংগীতের মত। দহিয়াছে অগ্নিতারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্নতারে করেছে কুঠারে ;
সর্ব প্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোমহুতাশন।
হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম-অর্ঘ্য-উপহারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষপূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ। শুনিয়াছি, তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্নকন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিঁধিয়াছে পদতলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর, করিয়াছে তারে অবিশ্বাস
মূঢ় বিজ্ঞজনে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস

অতিপরিচিত অবজ্ঞায়—গেছে সে করিয়া ক্ষমা
নীরবে করুণনেত্রে, অন্তরে বহিয়া নিরুপমা
সৌন্দর্য-প্রতিমা। তারি পদে মানি সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ,
তাহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইছে দেশে।

শেষ দেড় ছত্রে কবি কি শেলীর কথা মনে করছিলেন?—শেলীই তো স্বাধীনতার কবিতা লিখে বোতলে পূরে সাগর জলে ভাসিয়ে দিতেন, ওরা পরাধীন দেশে গিয়ে নিপীড়িত জনগণকে মুক্তির প্রেরণা দেবে। ইহার পরের অংশটুকু সমস্তই ধূম্রজাল—Camouflage. সেই বলতে-সোজা শুনতে-বড় বিশ্বপ্রেম ও ঈশ্বরভক্তি।

দেখা গেল ফিরতে চেয়েও কবির আর ফেরা হল না। সেই বাঁশী বাজানোই তাঁর রয়ে গেল। শুধু সেই বাঁশীর সুরে ম্রিয়মান জাতির অবসন্নসুরে কিঞ্চিৎ আশার সঙ্গীত শোনাবার ভার নিয়েই তিনি শান্ত হলেন। বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ কবি রবীন্দ্রনাথই রয়ে গেলেন। কাগজ-কালির বিদ্রোহ তাঁর, কালি-কলমের বিপ্লব। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র থেকে সে বিপ্লব যেন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে সংক্রামিত হল। ফলে সমাজের দোষত্রুটি দর্শন এবং মোচনই এর পর থেকে তাঁর কর্ম হল। শিক্ষা, সামাজিক ন্যায়বিচার, জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা মোচন, স্ত্রী-স্বাধীনতা এই সব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিন্তা ও লেখনী নিযুক্ত করলেন।

রোমান্টিকের আত্মদর্শন

রোমান্টিকের আর একটি বৈশিষ্ট্য তার শিশুর মতন সরলতা ও বিস্মিত হবার শক্তি। ছোট শিশু—জগৎকে দেখে তার আনন্দ এবং বিস্ময়। নিজেকে দেখেও তেমনি বিস্ময়। রবীন্দ্রনাথ শিশুর জগদ্দর্শনের বিস্ময় এভাবে বর্ণনা করেছেন।—

শিশু পুষ্প চক্ষু মেলি হেরিল এ ধরা
সুন্দর শ্যামল স্নিগ্ধ গীতি-গন্ধ-ভরা,
বিশ্বজগতেরে ডাকি কহিল, হে প্রিয়,
আমি যত দিন থাকি তুমিও থাকিও।

তবে এ তো শুধু মোহের আশঙ্কা। কবিশিশু আর মুগ্ধ শিশুতে কিছু পার্থক্য আছে তো। 'শিশু' থেকে 'কবি শিশু' জ্ঞানে ও ভাবে যেমন অনেক বড়, কবিশিশুর জগত দর্শনে বিস্ময়ও তাই সাধারণ শিশুর চেয়ে অনেক বেশি। পদ্যে গদ্যে গানে কতরকম ভাবেই না রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। মনে পড়ছে গুপ্তধনের কথা। এ্যান্টি রোমান্টিক বার্ণার্ড শ বললেন, Let those who are poor sing in praise of poverty—যারা গরীব তারাই করুক দারিদ্র্যের জয়গান। তিনি Goldsmith-কে ঠাট্টা করে বললেন,

> How much of all that human hearts endure
> Factory Laws alone can cause or cure,
> (মানুষের দুঃখ কষ্টের কত বড় অংশ
> ফ্যাক্টরী আইন শুধু করে দিল ধ্বংশ।)

কারণ Goldsmith বলেছিলেন,

> How small of all that human hearts endure
> Kings or laws can cause or cure.
> (মানুষের দুঃখকষ্টের কত ছোট অংশ
> রাজা বা আইনে গড়ে, করে বা তা ধ্বংশ।)

ব্যাঙ্ক ব্যালান্স না বড় অঙ্কের হলে না কি জীবনে সৌন্দর্য থাকতেই পারে না। গুপ্তধন এই ব্যঙ্গেরই উত্তর।

রবীন্দ্রনাথ আগেই গেয়েছিলেন জীবনের বিস্ময়—

> না চাহিতে মোরে যা করেছ দান,
> আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ—
> দিনে দিনে মোরে লইতেছ, প্রভু,
> সে মহাদানেরই যোগ্য করে।

এবং গুপ্তধনে দেখালেন বসুন্ধরার গুপ্ত বস্তু বা ধন কোথায়। এক একদা-সম্পন্ন পরিবার গ্রামের প্রাচীন জমিদার বংশ অবস্থাবৈগুণ্যে দরিদ্র হয়ে পড়ল। তারপর অবস্থার উন্নতিকরার জন্য তিন পুরুষ চলল তাদের দেবী আরাধনা—আগের সম্পন্ন অবস্থা ফিরে পাবার জন্য। তিন পুরুষের সাধনায় মৃত্যুঞ্জয় পেল ধারাগোল গ্রামে গুপ্তধনের সন্ধান। কিন্তু বিধাতার চাতুরীতে

এই ধন এবং জীবন দুটোর মধ্যে বেছে নিতে বলা হল মৃত্যুঞ্জয়কে। সে প্রথম দুটোই চাইল—তারপর ধনকেই থাকলো আঁকড়ে। অন্ধকার স্বর্ণকারাগারে সোনার ডালাগুলো নিয়ে খেললো ছিনিমিনি। তারপর অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। দিবা অবসান হল। সন্ধ্যা এল পৃথিবীতে। মৃত্যুঞ্জয়ের মনে এলো বাহিরের সন্ধ্যার ছবি, তার ছড়ানো সোনা, রং, আলো, আর ভেতরের এই স্বর্ণকারাগার। তখন সে বুঝতে পারল ধরাতলে দীনতম হয়েও যদি সে আবার জীবনে ফিরে যেতে পারে তবে তা এ স্বর্ণকারাগারে বন্দীত্বের চেয়ে ভাল। তখন সে বেছে নিল দারিদ্র্য সহিতে জীবন—ঐশ্বর্য্যের কারাগারে মৃত্যু তার আর কাম্য রইল না। যে জীবনকে সেদিন অর্থাভাবে বিস্বাদ মনে করেছিল আজ অর্থের কারাগারে দাঁড়িয়ে সেই জীবনের স্বাদ সে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করল। রবীন্দ্রনাথ গানে যাকে ভগবানের মহাদান বলেছিলেন সেই আকাশ আলোক তনু মনপ্রাণের মূল্য তিনি এভাবে যাচাই করে দেখালেন।

শুধু বেঁচে থাকাই বিরাট কথা। এমন কি কবিযশও জীবনের তুল্য নয়। কালিদাস হওয়ার চেয়েও বেঁচে থাকা বড়।

কালিদাস তো নামেই আছেন,
আমিই আছি বেঁচে।—

এই চিন্তায় তিনি কালিদাসকেই হারিয়ে দিয়ে গর্বে নেচে বেড়ালেন।

কিন্তু এই যে আমি বেঁচে আছি শুধু বেঁচে থাকার মধ্যেই যদি এর মহিমা নিঃশেষ হয়ে যায় তবে কি আর সত্যিই এর বিশেষ মূল্য থাকে? রোমান্টিক আত্মার অভ্যন্তরে অন্ধ সন্ধান চালায়, খুঁজে বার করতে চায় আপন মহিমা। এবং প্রায়শঃই সে দেখে—পূর্ণ দার্শনিকের আত্মজ্ঞান লাভ না করলেও—তার আত্মা মহান ও মৃত্যুঞ্জয়ী। নিজেকে আবিষ্কার করে তার অপূর্ব আনন্দ।

রবীন্দ্রনাথের এই রোমান্টিক আত্মদর্শন হল "প্রভাতসঙ্গীতে"—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
জগৎ আসি হেথা করিছে কোলাকুলি।

আর সেই জগৎকে নিয়ে কবি নিজেকে দেখলেন—

উঠেছে মাথা ঘোর মেঘের মাঝখানে
আপনি আসি উষা শিয়রে বসি ধীরে,
অরুণ কর দিয়ে মুকুট দেন শিরে।

নিজের ডালা হতে কিরণমালা খুলি
দিতেছে রবি-দেব আমার ভালে তুলি।
ধূলির ধূলি আমি রয়েছি ধূলি 'পরে,
জেনেছি ভাই বলে জগৎ চরাচরে।

তারপর নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হল। প্রভাত পাখীর গানে তার প্রাণ জেগে উঠল। আর সে প্রাণের আবেগে—

থর থর করি কাঁপিছে ভূধর,
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে।

তারপর সেই নবজাগ্রত প্রাণে হৃদয় নির্ঝরে নূতন সঙ্কল্প এল—

আমি ঢালিব করুণা-ধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণ-কারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগলপারা।
কেশ এলাইয়, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া,
দিবরে পরাণ ঢালি।

আর শুধু পরাণ ঢেলে দিলেই হবে না, গানে কথায় হাসিতে যাত্রাপথ উচ্ছল করে দিতে হবে। সেই পরবর্তীকালে—'যে পথ দিয়া চলিয়া যাবো সবারে যাবো তুষি।—

শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খলখল, গেয়ে কলকল,
তালেতালে দিব তালি।
তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া,
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া,
গাহিয়া গাহিয়া গান,

কিন্তু এত দিয়েও যেন কবির প্রাণের ভাণ্ডার পূর্ণই থেকে যাবে।

যত দেব প্রাণ বহে যাবে প্রাণ
ফুরাবে না আর প্রাণ।
এত কথা আছে, এত গান আছে,
এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে এত সাধ আছে,
প্রাণ হয়ে আছে ভোর।

সত্যই এই যে আপনা মাঝারে আপনার প্রেম
তাহারও পাইনে তুল।

এই অতুলনীয় আপনাকেই সে বহির্বিশ্বে সব কিছুর মধ্যে দেখেছে। সকল কাব্যে নিজেরই কথা বলেছে, আর চিত্রে এঁকেছে নিজের ছবি। প্রকৃতির মধ্যে সে সন্ধান করেছে কেবল নিজের প্রকৃতির। রবীন্দ্রনাথ এইটেই বলেছেন সেই পরিচিত লাইনগুলিতে—

আকুল হইয়া বনে বনে ফিরি
কস্তুরি মৃগ সম
আপন গন্ধে মম।

রোমান্টিক কবির নায়ক তাই কবি স্বয়ং। তাইতো শুনি বায়রণই Don Juan, Child Harold। শেলি Prometheus, Skylark, West wind; কীটস্—Endymion, Apollonius, Lycius. রোন্টিকের আত্মরতি অপরিহার্য। আমাদের শাস্ত্রেও পাই ইহার সমর্থন। দেবতা ও পূজারী এক বা একাত্ম!

শ্রদ্ধাময়োঽয়ম্ পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।

আমি যাকে ভালবাসি সে ঠিক আমার মত। অন্ততঃ কোথাও তার সঙ্গে আমার খানিকটা মিল আছে। এ মতে সাহিত্য সৃষ্টি আত্মচরিত লেখারই নামান্তর মাত্র—কোথাও প্রকাশ্য, কোথাও প্রচ্ছন্ন।

রবীন্দ্রকাব্যের পাঠকেরাও জানেন রবীন্দ্রনাথ বাল্মিকী প্রতিভার বাল্মিকী, বিসর্জনের গোবিন্দমাণিক্য, রাজর্ষির বিলম্বন, মুক্তধারার ধনঞ্জয় বৈরাগী, অচল আয়তনের দাদাঠাকুর। রাজার ঠাকুরদা, চিরকুমার সভার অক্ষয়, ডাকঘরের অমল ও ঠাকুরদা। রক্তকরবীর বিশু, ঘরে বাইরের নিখিলেশ, গোরার গোরা

ও পরেশবাবু—চতুরঙ্গের জ্যাঠামশায় জগমোহন, চার অধ্যায়ের অতীন, এমনকি শেষের কবিতার—অমিত (এবং নিবারণ চক্রবর্তী)।

অন্ততঃ পক্ষে এই সব চরিত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব খানিকটা **projected** বা উৎক্ষিপ্ত হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

লেখার মধ্যে লেখকের এই প্রবেশ রোমান্টিক যুগেই প্রথম ঘটে। তার অবশ্য একটা বিশেষ কারণ ছিল। রোমান্টিকযুগটা ছিল গীতিকবিতার যুগ। এই গীতি কবিতাটা নিতান্তই কবির আপন কথা। গান প্রাণ থেকে আসে এবং প্রাণেরই কথা বলে। গীতিকবি তাই নিজের কথাই লিখতে অভ্যস্ত। নানান গীতে নানানভাবে সে নিজের মনোভাবই প্রকাশ করে এসেছে। তারপর গীতিকবিতা ভিন্ন অন্য ধরণের লেখায় হাত দিয়েও সে পূর্বের অভ্যাস ছাড়তে পারে না। তাই তার কাব্যে সে অকারণ নানাস্থানে আত্মপ্রকাশ করে বশে। এমন কি সবচেয়ে পরবশ সাহিত্য অর্থাৎ নাটকেও কখনও কখনও রোমান্টিক আত্মপ্রকাশ করে থাকে। অবশ্য এটা চরিত্রবিশেষের মধ্যে এবং অবস্থা বিশেষেই সম্ভব। সাধারণতঃ নায়ক বা প্রধান প্রধান চরিত্রের ওপরই লেখকের পক্ষপাত থাকে বলে তাদের ভেতরেই লেখকের আত্মপ্রকাশ ঘটে থাকে।

রোমান্টিকের বৈশিষ্ট্যবাদ

নিজেকে এতকরে ভালবাসার ফলে রোমান্টিক নিজেকে অন্যের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখতে চায়। সে অন্যের চেয়ে স্বতন্ত্র। অন্যের চেয়ে ভাল। জ্ঞানে গুণে প্রেমে। এই বৈশিষ্ট্য তাই রোমান্টিকের কাম্য। সে ভাষায় ছন্দে চিন্তায় এই বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে চায়। তাই তো যা কিছু তার চতুর্দিকে সব কিছুর বিরুদ্ধেই তার বিদ্রোহ। সে নিজের সমসাময়িক সমস্ত কিছুই ত্যাগ করে অতীত এবং ভবিষ্যতের দুয়ারে খুজে বেড়ায় নতুন নতুন কথা, ভাব, ছন্দ। **Romantic Revival** তাই মধ্যযুগীয় **knighthood** ও **chivalry**-কে ফিয়িয়ে আনলো তার সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথও এনেছিলেন বৈষ্ণব কাব্য ও তার ভাষা। কিন্তু ররীন্দ্রনাথ অতীতের পুনরুজ্জীবন করেই শান্ত হলেন না। তিনি ভবিষ্যতকেও টেনে আনলেন তাঁর সাহিত্য আসরে। অভিব্যক্তিবাদ জীববিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান এ সমস্তও তিনি কাব্যের কথায় বাঁধতে চেষ্টা করলেন। নানা দর্শন বিজ্ঞান মিলিয়ে তিনি সৃষ্টি করলেন জীবনদেবতা মানসসুন্দরী, অন্তর্যামী, ভারতভাগ্যবিধাতা, বিশ্বদেব ইত্যাদি। আর এ-সব

যাতে লোকে প্রচলিত বিশ্বাসের সঙ্গে মিলিয়ে না নেয় সে জন্য বার বার করে বলতে লাগলেন এদের বৈশিষ্ট্যের কথা।

এই বৈশিষ্ট্যবাদ আত্মরতিরই ফল স্বরূপ। রোমান্টিকের আত্মরতির কথা আমরা ইতিপূর্বেই আলোচন্য করেছি। সেই "আপনার মাঝে আপনার প্রেম তাহারো পাইনে তুল।" তারপর রোমান্টিক যখন বুঝতে পারেন জগতে যা' কিছু ভাল লেগেছে তা তার নিজের গুণেই কারণ ভালমন্দ বলে জগতে কিছু নাই। চিন্তাশীল মনের পটেই ভাল ও মন্দের উদ্ভব! **Shakespeare**-এর কথায়—"**There is nothing either good or bad but thinking makes it so.**" তারপর কবি হিসেবে সে দেখে অন্তেরা যেখানে আনন্দের বা সৌন্দর্য্যের সন্ধান পায়নি সে পেয়েছে তখনই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে ওঠে। তখন থেকে একটা নোতুন কিছু করার বা বলার জন্য তার ব্যাকুলতা আরম্ভ হয়। অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি।

আবার রোমান্টিকের প্রেমপ্রবণতা ও আমরা লক্ষ্য করেছি। প্রেমিকেরও ভাবটি বৈশিষ্ট্যমাখা। সে এথিওপেরমুখে ক্লিওপেট্রার রূপ দেখতে পায়। নিজের বৈশিষ্ট্যে সে ভরপূর। প্রেমিক দেখে সে প্রেমিকার প্রেমে দরিদ্র হয়েও সম্রাট।

তুমি মোরে করেছ সম্রাট, তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরব মুকুট। পুষ্পডোরে
সাজায়েছ কণ্ঠমোর, তব রাজটিকা
দীপিছে ললাট মাঝে মহিমার শিখা
অহর্নিশি।

প্রেমের অমরাবতী সৌন্দর্য্যের নন্দনভূমিতে সে দেখে—

সেথা আমি জ্যোতিষ্মান
অক্ষয় যৌবনময় দেবতা সমান,
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা,
সেথা মোরে অর্পিয়াছে আপন মহিমা
নিখিল প্রণয়ী; সেথা মোর সভাসদ
রবিচন্দ্র তারা, পরি নব পরিচ্ছদ
শুনায় আমারে তারা নব নব গান
নব অর্থ ভরা—চির সুহৃদ সমান
সর্ব চরাচর।

এই বৈশিষ্ট্যবাদ শেষ পর্য্যন্ত তার কাব্য ধর্ম জীবনকেও স্পর্শ করে। সে ভগবানকেও ডেকে বলে—

পাখীরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান
তার বেশি করে না সে দান।
আমারে দিয়েছ সুর,
আমি তার বেশি করি দান
আমি গাই গান।
... ...
আর সকলেরে তুমি দাও
শুধু মোর কাছে তুমি চাও।

আবার শুনুন—

জানি আমি মোর কাব্য ভাল বেসেছেন মোর বিধি,
ফিরে যে পেলেন তিনি দ্বিগুণ আপন দেওয়া নিধি।
তাঁর বসন্তের ফুল বাতাসে কেমন বলে বাণী
সে যে তিনি মোর গানে বারম্বার নিয়েছেন জানি।
আমি শুনায়েছি তাঁরে, শ্রাবণ রাত্রির বৃষ্টিধারা
কী অনাদি বিচ্ছেদের জাগায় বেদন সঙ্গীহারা।
যেদিন পূর্ণিমা রাতে পুষ্পিত শালের বনে বনে
শরীরী ছায়ার মতো একা ফিরি আপনার মনে
গুঞ্জরিয়া অসমাপ্ত সুর, শালের মঞ্জরী যত
কী যেন শুনিতে চাহে ব্যগ্রতায় করি শির নত,
ছায়াতে তিনিও সাথে ফেরেন নিঃশব্দ পদচারে,
বাঁশির উত্তর তাঁর আমার বাঁশিতে শুনিবারে।
যেদিন প্রিয়ার কালো চক্ষুর সজল করুণায়
রাত্রির প্রহর মাঝে অন্ধকারে নিবির ঘণায়
নিঃশব্দ বেদনা তার দুটি হাতে মোর হাত রাখি
স্তিমিত প্রদীপালোকে মুখে তার স্তব্ধ চেয়ে থাকি,
তখন আঁধারে বসি আকাশের তারকার মাঝে
অপেক্ষা করেন তিনি, শুনিতে কখন বীণা বাজে
যে-সুরে আপনি তিনি উন্মাদিনী অভিসারিণীরে
ডাকিছেন সর্বহারা মিলনের প্রলয় তিমিরে।

কবির অহঙ্কার আত্মপ্রীতি ও আত্মশ্লাঘার অপরূপ নিদর্শন। অবশ্য ভক্তসুলভ বিনয়ও এতে মিশ্রিত আছে। তবু রোমান্টিকের আত্মপ্রীতি ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যবিমুগ্ধতা এতে ভরা।

এই বিনয়ের মধ্যে অহঙ্কার কতদূর যেতে পারে দেখুন তা নিম্নের এই গান দুটিতে। তবে এ অহঙ্কার আরও উচ্চশ্রেণীর। এ সেই ভক্তির অহঙ্কার, ভক্তের অহঙ্কার, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—এ অহং কার? না তার। হামারি গরব তুঁহুঁ বাড়ায়লি অবটুটায়ব কে! রবীন্দ্রনাথ জেনে শুনেই অহঙ্কার করেছেন এবং রেখেছেন।—

আমি সকল গর্ব দূর করে দিব তোমার গর্ব ছাড়িব না,
সবারে ডাকিয়া দেখাব যেদিন পাব তব পদরেণুকণা।

তাই ভক্তির গর্বে তিনি শাস্ত্র এবং শাস্ত্রজ্ঞদের ভ্রান্ত বলতেও কুণ্ঠিত হলেন না।

ওদের কথায় ধাঁদা লাগে তোমার কথা আমি বুঝি,
তোমার আকাশ তোমার বাতাস এই তো সবই সোজাসুজি।

(গীতবিতান— ২৯০)

তোমার জ্ঞানী আমায় বলে কঠিন তিরস্কারে
পথ দিয়ে তুই আসিস নি যে ফিরে যারে।
ফেরার পন্থা বন্ধ করে আপনি বাঁধো বাহুর ডোরে
ওরা আমায় মিথ্যা ডাকে বারে বারে।

(ঐ ২৯১)

অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত অন্য সকলের চেয়ে ভিন্ন হবার বা নোতুন কিছু করার লোভ যদি ঘাড় থেকে না যায় তবে মানুষ উপহাসাস্পদও হয়ে উঠতে পারে। আমরা স্থানান্তরে দেখাব যে এই নোতুন কিছু করার লোভ থেকেই ছন্দের নূতনত্ব অর্থের নূতনত্ব ছাড়িয়ে শেষে অর্থবন্ধন ও ছন্দোবন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পর্য্যন্ত কারো কারো রচনায় এসে গেছে, আর তা সম্পূর্ণ যৌক্তিক পন্থাতেই।

প্রকৃতি প্রেম

রোমান্টিকের জগৎপ্রীতি প্রকৃতিপ্রেমরূপে রোমান্টিক কবিতায় প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা ও তাঁর প্রকৃতি-অনুরাগ সর্বজনস্বীকৃত। ধরিত্রী তাঁর কাছে মাতা।

আজকে খবর পেলেম খাঁটি
মা আমার ঐ দেশের মাটি,
অন্নেভরা শোভার নিকেতন,
অভ্রভেদি মন্দিরে তার
বেদি আছে প্রাণ দেবতার
ফুল দিয়ে তার নিত্য আরাধন ?

"অহল্যার প্রতি" কবিতায় কবি জীবধাত্রী জননীর মহাস্নেহের স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা করেন। অহল্যাকে তিনি প্রশ্ন করেন, যখন তুমি বৃহৎ পৃথ্বির সাথে এক দেহ হয়েছিলে

তখন কি জেনেছিলে তার মহাস্নেহ ?
ছিল কি পাষাণতলে অস্পষ্ট চেতনা;
জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা,
অনুভব করেছিলে স্বপনের মত
সুপ্ত আত্মা মাঝে ?

পরে এই সুখ দুঃখের স্বরূপ তিনি বিস্তারিত ভাবে বুঝিয়ে দিলেন।—

দিবারাত্রি অহরহ
লক্ষকোটি পরাণির মিলন, কলহ—
আনন্দ বিষাদ ক্ষুব্ধ ক্রন্দন, গর্জন,
অযুত পান্থের পদধ্বনি অনুক্ষণ,
পশিত কি অভিশাপ নিদ্রাভেদ ক'রে
কর্ণে তোর…………
বুঝিতে কি পেরেছিলে আপনার মনে
নিত্য নিদ্রাহীন ব্যথা মহাজননীর।

আর শুধু ব্যথাই নয় তার আনন্দের কথা ?

যেদিন বহিত নব বসন্ত সমীর
ধরণীর সর্বাঙ্গের পুলক প্রবাহ
স্পর্শ কি করিত তোরে ? জীবন-উৎসাহ
ছুটিত সহস্র পথে মরু দিগ্বিজয়ে
সহস্র আকারে।

যামিনী অসিত যবে মানবের গেহে
ধরণী লইত টানি শ্রান্ত তনুগুলি
আপনার বক্ষঃ 'পরে। দুঃখ শ্রম ভুলি
ঘুমাত অসংখ্য জীব—জাগিত আকাশ—
তাদের শিথিল অঙ্গ, সুষুপ্তি নিঃশ্বাস
বিভোর করিয়া দিত ধরণীর বুক।
মাতৃ অঙ্গে সেই কোটি জীব স্পর্শ সুখ,
কিছু তার পেয়েছিলে আপনার মাঝে?

তারপর পত্রপুষ্প জালের বিচিত্র যবনিকার অন্তরালে যে গোপন অন্তঃপুরে জননী বিরাজ করেন সেই চির রাত্রি সুশীতল বিস্মৃতি আলয়েই তো—

……অনন্তকাল ঘুমায় নির্ভয়ে
লক্ষ জীবনের ক্লান্তি ধূলির শয্যায়
নিমেষে নিমেষে যেথা ঝরে পড়ে যায়
দিবাতাপে শুষ্ক ফুল, দগ্ধ উল্কা তারা,
জীর্ণ কীর্তি, শ্রান্ত সুখ, দুঃখ দাহ হারা।

পৃথিবী জীবের জন্ম মরণের আশ্রয়, মাতৃগর্ভ ও সমাধি মন্দির, সমস্ত জীবনের সুখ দুঃখের লীলা ও আবাসস্থল। চেতনাময়ী, আর শুধু এই চেতনাময়ী বলেই নয়, শুধু প্রকৃতি হিসেবে কবির সমগ্র অন্তর তিনি অধিকার করে আছেন। তাঁর ইচ্ছা করে

সবলে আঁকড়ি ধরি এ বক্ষের কাছে
সমুদ্র মেখলা-পরা তব কটিদেশ;
প্রভাত রৌদ্রের মত অনন্ত অশেষ
ব্যাপ্ত হয়ে দিকে দিকে—অরণ্যে ভূধরে
কম্পমান পল্লবের হিল্লোলের 'পরে
করি নৃত্য সারাবেলা, করিয়া চুম্বন
প্রত্যেক কুসুমকলি, করি আলিঙ্গন
সঘন কোমল শ্যাম তৃণক্ষেত্রগুলি,
প্রত্যেক তরঙ্গ 'পরে সারাদিন দুলি,
আনন্দ দোলায়। রজনীতে চুপে চুপে

নিঃশব্দ চরণে বিশ্বব্যাপী নিদ্রারূপে
তোমার সমস্ত পশু পক্ষীর নয়নে
অঙ্গুলি বুলায়ে দিই, শয়নে শয়নে
নীড়ে নীড়ে গৃহে গৃহে গুহায় গুহায়
করিয়া প্রবেশ, বৃহৎ অঞ্চল প্রায়
আপনারে বিস্তারিয়া ঢাকি বিশ্বভূমি
সুগন্ধি আঁধারে।

তারপর দেখুন "কেন মধুর" কবিতায় প্রকৃতিতে এত রঙ রস গান আলোর আয়োজনের মধ্যে প্রকৃতির সেই মাতৃস্নেহ কেমন করে ফুটে উঠেছে।—

রঙিন খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে
তখনি বুঝিরে বাছা কেন যে প্রাতে
এত রং খেলে মেঘে, জলে রং ওঠে জেগে
কেন এত রং লেগে ফুলের পাতে,—

সেই রকম ছেলেকে গান গেয়ে নাচাতে নাচাতে মা বুঝতে পারেন—

পাতায় পাতায় বনে ধ্বনি এত কী কারণে,
ঢেউ বহে নিজ মনে তরল রবে।

আর গোপাল যখন মায়ের দেওয়া নবনীটুকু হাতে মুখে মেখে চুকে ঘুরে বেড়াতে থাকে—

তখন বুঝিতে পারি স্বাদু কেন নদীবারি,
ফল মধু রসে ভারি কিসের তরে।

তারপর মায়ের চুম্বনে যখন ছেলের মুখে হাসি ফুটে ওঠে মা বলেন,

তখনি জানি
আকাশ কিসের সুখে আলো দেয় মোর মুখে
বায়ু দিয়ে যায় বুকে অমৃত আনি।

প্রকৃতির সঙ্গে এর চেয়ে গভীরতর মধুরতর সম্পর্ক প্রকৃতির কবি ওয়ার্ডস-ওয়ার্থেও নাই।

প্রকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ শুধু মাতৃত্ব দেবীত্ব দিয়েই মহিমান্বিতা করেন নি। তার অন্তরে দিয়েছেন মাধুর্য্য সুধার ভাণ্ডার। কবির চোখে তাই ফুল সেই মাধুর্য্যের বিকাশ। তারার হৃদয়ে জ্বলে প্রেমের প্রদীপ।—

বনের ভালোবাসা আঁধারে বসি
কুসুমে আপনারে বিকাশে,
তারকা নিজ হিয়া তুলিছে উজলিয়া
আপন অলো দিয়া লিখাসে।

তাঁর চোখে সমুদ্র চিরচঞ্চল হাস্যমুখর শিশু যার প্রশ্নের আদি অন্ত নাই। আর পর্বত ধ্যান নিমগ্ন আত্মসমাহিত যোগী।

হে সমুদ্র, চিরকাল কী তোমার ভাষা ?
সমুদ্র কহিল, মোর অনন্ত জিজ্ঞাসা।
কিসের স্তব্ধতা তব, ওহে গিরিবর ?
হিমাদ্রি কহিল মোর চিত্ত নিরুত্তর।

সামান্য মানুষের ভয় দূর করবার জন্যে অসীম কালো ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তারারূপ অসংখ্য আলো প্রকৃতিই জ্বেলেছেন।

হে অনন্ত কালো, ভীরু এ দীপের আলো
তারি ছোট ভয়—করিবারে জয়
অগণ্য তারা জ্বালো।

মহাকালের চলার বর্ণনা এমন আর শুনেছেন ?

কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও ?
তারই রথ নিত্যই উধাও,
জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয় স্পন্দন
চক্রে পিষ্ঠ আঁধারের বক্ষফাটা তারার ক্রন্দন।

আবার দেখুন মহাকালের চিরপ্রবাহিনী স্রোত—

হে বিরাট নদী
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিশ্রান্ত অবিরল
চলে নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে,
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা ওঠে জেগে।

আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া ওঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হতে,
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্য্য চন্দ্র তারা যত
বুদবুদের মতো।

আর এই গতি মুহূর্তের জন্য বন্ধ হলেই মহা অনর্থ ঘটবে।

যদি তুমি মুহূর্তের তরে
ক্লান্তিভরে
দাঁড়াও থমকি
তখনি চমকি
উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্ব্বতে।

শুনতে কি পান ? তবু কি পান না ?

তৃণদল মাটির আকাশ পরে ঝাপটিছে ডানা
মাটির আঁধার নীচে কে জানে ঠিকানা
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।

শুধু ছবি দেখবেন রঙ-ঝরানো আকাশগলা রঙের গঙ্গাধারা ?

ঝলিতেছে জল তরল অনল
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল
দিগ্বধূ যেন ছল ছল চোখে অশ্রু আঁখি।

সৌন্দর্য্যের গভীর প্রশান্তি দেখুন—

শান্ত স্নিগ্ধ সুগম্ভীর নাহি কূল নাহি তীর
মৃত্যুসম নীল নীর স্থির বিরাজে।

আবার এই সৌন্দর্য্যের আগমন লক্ষ্য করুন—

এমনি করে কালো কাজল মেঘ জ্যৈষ্ঠ মাসে আসে ঈশান কোণে-
এমনি করে কালো কাজল ছায়া
আষাঢ় মাসে নামে তমাল বনে,
এমনি করে শ্রাবণ রজনীতে
হঠাৎ খুশি ঘনিয়ে আসে চিতে।

এবার আস্তে আস্তে ভয়ঙ্করের দিকে এগুবেন ?—

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা—
আঁধারে মলিন হলো, যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার।

তারপর দেখুন প্রকৃতির নিষ্ঠুর মূর্তি—

খল জল ছলভরা তুলি লক্ষ ফণা
ফুসিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের লালায়িত মুখ।

নিদাঘতপ্ত নিখিলের শোচনীয় মূর্তি দেখুন—

বৈশাখে সে বিধবার আবরণ খুলি
তপস্বিনী ধরণীরে সাজায় গৈরিকে।

অনাবৃষ্টির ছবি দেখুন—

আমার এ মানসের কানন কাঙাল
শীর্ণ শুষ্ক বাহু মেলি বহু দীর্ঘ কাল
আছে ক্রুদ্ধ ঊর্ধ্ব পানে চাহি।

আবার শুনুন—

দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি অতি দীর্ঘকাল
হে ইন্দ্র হৃদয়ে মম। দিক চক্রবাল
ভয়ঙ্কর শূন্য হেরি।
যদি ইচ্ছা হয় দেব আনো বজ্রনাদ
প্রলয়মুখর হিংস্র ঝটিকার সাথ,
পলে পলে বিদ্যুতের বক্র কশাঘাতে
সচকিত করো মোর দিক দিগন্তর।

আরো কত উদাহরণই না আপনার মনের কোনে ভীড় করে আসছে। নিশ্চয়ই এর পরে আর রবীন্দ্রনাথকে রোমান্টিকদের মতই প্রকৃতির কবি বললে অন্যায় করা হবে না।

কল্পনা

রোমান্টিক চরিত্রে প্রকৃতির পরেই কল্পনার স্থান। রোমান্টিক মন বাস্তবকে নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে তার ওপর মনের একটু রঙ চড়িয়ে

তাকে আরও সুন্দর করে তুলে সে আনন্দ পায়। রোমান্টিকের আঁকা ছবিতে বাস্তবের ওপর কল্পনার আলো ফেলা হয়—সেই আলোকে ওয়ার্ডস্‌ওয়া বলেছেন—the light that never was on sea or land, the consecration and the poet's dream. এই আলোকে ভালো বুঝতে হলে রবীন্দ্রনাথেরই সাহায্য নেওয়া দরকার। চৈতালির নারী কবিতা মনে করুন।

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী,
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হ'তে। বসি কবিগণ
সোনার উপমা সূত্রে বুনিছে বসন।
সঁপিয়া তোমার 'পরে নূতন মহিমা
অমর করিছে শিল্পী তোমরা প্রতিমা।

এ ছাড়া কতবর্ণ কত গন্ধ কত ভূষণেই না সাজানো পুরুষের প্রাণে নারীর মূর্তি। নারীর সব চেয়ে বড়ো সৌন্দর্য্য পুরুষের কামনা।

পড়েছে তোমার 'পরে প্রদীপ্ত বাসনা।
অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা।

সত্যদর্শী কবি তাই বলছেন যে নারীর সমস্তটুকু সৌন্দর্য্যের জন্য বাহাদুরা নারীর নয়, তা পুরুষের এই বাসনার আলোর।

আর শুধু নারী নয় রোমান্টিক জগতের সব কিছুকেই কল্পনার আলো ফেলে দেখেন। তাতেই দ্রষ্টব্যগুলি হয়ে ওঠে উজ্জ্বলতর, সুন্দরতর। কবি তাই সমস্ত জগতের বেলায় বলেছেন ভগবানকে উদ্দেশ্য করে !—

তুমি তো গড়েছ শুধু এ মাটির ধরণী তোমার
মিলাইয়া আলোকে আঁধার
দিয়েছ আমার 'পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার।

এই স্বর্গ রচনার যন্ত্র কবির কল্পনা। রবীন্দ্রনাথ তা জানতেন, তবে ইংলণ্ডের মত আমাদের দেশে রোমান্টিক যুগ আর ক্লাসিকাল যুগের পার্থক্য ছিল না বলে রবীন্দ্রনাথকে নীতিগতভাবে কল্পনাকে কাব্যে স্থান দিতে চেষ্টা করতে হয় নাই। কল্পনার স্থান কাব্যলক্ষ্মীর পাশে এ বিষয়ে এ দেশে দ্বিমত

নাই কোন দিন। রবীন্দ্রনাথ অবাধে তাই কল্পনাকে কাব্য লক্ষ্মীর দরবারে স্থান দিতে পেরেছেন। সতেরো বছর বয়সের লেখা একটা কবিতা দেখুন···

হে কবিতা—হে কল্পনা—
জাগাও—জাগাও দেবি উঠাও আমারে দীনহীন—
ঢাল এ হৃদয়মাঝে জ্বলন্ত অনলময় বল—
দাও দেবি সে ক্ষমতা—ওগো দেবি শিখাও সে মায়া—
যাহাতে জ্বলন্ত দগ্ধ নিরানন্দ মরু মাঝে থাকি—
হৃদয় উপরে পড়ে স্বরগের নন্দনের ছায়া—
হইতেছি অবসন্ন—বলহীন—চেতনারহিত—
অজ্ঞাত পৃথিবীতলে—অকর্মণ্য অনাথ অজ্ঞান
উঠাও—উঠাও মোরে করহ নূতন প্রাণদান।

—(রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড, ৭১ পৃঃ)

তা ছাড়া হিন্দু হিসেবে ধ্যানে কল্পনা, পূজায় কল্পনা, শ্রাদ্ধে কল্পনা, পিণ্ড-দানে কল্পনা—কল্পনা বাদ দিয়ে কোন কাজ করবার উপায় নেই। হৃদয়ে ইষ্টমূর্তি কল্পনা করে ধ্যান করুন, ঘটে দেবতার উপস্থিতি কল্পনা করে পূজা করুন, শ্রাদ্ধে পিতা বা মাতার আবাহন ও শ্রদ্ধাদত্ত দ্রব্যাদি গ্রহণ করা কল্পনা করে শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন করুন, পিণ্ডদানেও উদ্দিষ্ট আত্মার আগমন ও পিণ্ডগ্রহণ কল্পনা করুন—তবেই আপনার কৃত্যাদি সম্পন্ন হবে। সুতরাং বাঙ্গালী কবি কল্পনাকে বাদ দিয়ে চলবেন কি করে। কবিতা লিখতে তো কল্পনার সাহায্য লাগেই—কবিতায় কল্পনাকে সম্বোধন করে কত কথাই না বলা যায়। আর রবীন্দ্রনাথ ওপরের ঐ দৃষ্টান্ত ছাড়াই আরও কত জায়গায়ই না কত কি বলেছেন। তাঁর মানস সুন্দরী কবিতা কল্পনালতা।—

আজ কোনো কাজ নয়,—সব ছেড়ে দিয়ে
ছন্দোবদ্ধ গ্রন্থগীত, এসো তুমি প্রিয়ে,
কবিতা কল্পনালতা।

আর অত উদ্ধৃতির প্রয়োজন কি। কবি নিজেই বললেন,—

সংসারে মোর আছে কিছু ধন
বাকি সব ধন স্বপনে
নিভৃত স্বপনে।

—এই স্বপ্ন অবশ্য কল্পনা। এই স্বপ্ন কল্পনা বলেই পুরস্কারের কবি বলতে পেরেছেন—

অন্তর হতে আহরি বচন
আনন্দলোক করি বিরচন
গীতরস ধারা করি সিঞ্চন
সংসার ধুলিজালে।

অসীমকালের অন্তরে যে গান বাজে সেই গান তিনি তাঁর বাঁশীতে পুরে আনবেন। তারপর

ধরণীর শ্যামকর পুটখানি
ভরি দিব আমি সেই গীত আনি
বাতাসে মিলায়ে দিব এক বাণী
মধুর অর্থভরা।

আর জগতে যা কিছু সুন্দর সকলই এই গানের স্পর্শে সুন্দরতর হবে।

নবীন আষাঢ়ে রচি নব মায়া
এঁকে দিয়ে যাবো ঘনতর ছায়া,
করে দিয়ে যাব বসন্ত কায়া
বাসন্তী বাস পরা।
ধরণীর তলে গগনের গায়
সাগরের জলে অরণ্য ছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায়
রঙিন করিয়া দিব।
সংসার মাঝে কয়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর
তার পরে ছুটি নিব।
সুখ-হাসি আরো হবে উজ্জ্বল,
সুন্দর হবে নয়নের জল
স্নেহ সুধামাখা বাসগৃহতল
আরো আপনার হবে।

প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে
আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে,
আরেকটু স্নেহ শিশু মুখ 'পরে
শিশিরের মতো রবে।

কিন্তু এই কল্পনা অলসচিন্তা বিলাস্ বা আকাশকুসুম চয়ন নয়। অসম্ভবের মানসিক রচনাকে Keats বলেছেন Fancy, আর বাস্তবের অগ্রিম অনুভূতিকে তিনি বলেছেন Imagination. Idle fancy ছেলে ভুলানো ছড়ায় ব্যবহার করা যায়। সুকুমার রায়ের আবোল-তাবোল হাসজারু ইত্যাদির কথা ভাবুন। অথবা পুরস্কারের কবির স্ত্রীকে পরিহাসচ্ছলে রাজ পোষাক দেবার আদেশ মনে করুন।

যেতে যদি হয় দেরিতে কি কাজ,
ত্বরা করে তবে নিয়ে এসো সাজ—
হেম কুণ্ডল, মণিময় তাজ,
কেয়ুর কণক হার।
বলে দাও মোর সারথিরে ডেকে
ঘোড়া বেছে নেয় ভালো ভালো দেখে,
কিঙ্করগণ সাথে যাবে কে কে
আয়োজন করো তার।

কবি বা ঔপন্যাসিক যে চরিত্র সৃষ্টি করেন, জীবনের স্বপ্ন দেখেন, সেটা ভবিষ্যদ্দর্শন। Keats-এর কথায় ওটা Adam's dream, he awoke and found it true. এ্যাডাম স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে দেখলেন স্বপ্ন সত্য হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ এই দ্বিতীয় কার্যের জন্য কল্পনার ব্যবহার করেছেন। তার কল্পনা সত্যের জননী। এ বিষয়টি তাঁর ভাষা ও ছন্দে খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।—বাল্মীকি ক্রৌঞ্চীর শোকে কাতর হয়ে ব্যাধকে শাপ দিতে গিয়ে ছন্দ আবিষ্কার করে ফেলেছেন। তারপর ব্রহ্মালোকে ব্রহ্মা সেই ছন্দ শুণে নারদকে দূত করে পাঠালেন বাল্মিকীর কাছে। তাঁর জিজ্ঞাস্য—

এই ছন্দে গাথি লয়ে কোন দেবতার যশোগাথা,
স্বর্গের অমরে কবি মর্ত্যলোকে দিবে অমরতা?

বাল্মিকী কিন্তু এ প্রশ্নে খুশি হলেন না। তিনি বললেন,

দেবতার স্তব গীতি গাহিতেছে বিশ্বচরাচর।
..... বহ্নি ঊর্ধ্বে মেলিয়া অঙ্গুলি
ইঙ্গিতে করিছে স্তব। সমুদ্রতরঙ্গ বাহু তুলি
কী কহিছে স্বর্গজানে।......

শুধু

মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে
উড়িতে সে নাহি পারে সঙ্গীতের মতন স্বাধীন
ভাবের স্বাধীন রাজ্যে।

সেই অর্থভার হতে মুক্ত করে তাঁর কবিতা মানুষের ভাষাটাকে কিছু দূর নিয়ে যাবে এই তার ইচ্ছা। তা ছাড়া—

দেবতার স্তবগীতে দেবেরে মানব করি আনে
তুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দে গানে।

এই সঙ্কল্প নিয়ে তিনি নারদকে একজন উপযুক্ত নায়কের নাম করতে বললেন,

ভগবন্, ত্রিভুবন তোমাদের প্রত্যক্ষে বিরাজে,
কহ মোরে নাম কার অমর বীণারছন্দে বাজে।......

সব শুনে নারদ রামচন্দ্রের নাম করলেন।—

নারদ কহিলা ধীরে অযোধ্যার রঘুপতি রাম।

বাল্মিকী বললেন রামের নামতো আমিও জানি। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে সব কথা জানিনে তো। লিখবো কি করে?—পাছে সত্যভ্রষ্ট হই আমার মনে এই ভয় জাগে।

তখন নারদ তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন,—

সেই সত্য যা' রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি তব মনোভূমি
রামের জনম স্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেন,
এতবলি দেবদূত মিলাইল দূর স্বপ্ন হেন।

নারদের মুখ দিয়ে কল্পনার জয়গান করালেন রবীন্দ্রনাথ। আর কোন রোমান্টিক কবিই কল্পনাকে এর চেয়ে উচ্চতর স্থান দিতে পারেন নি। সুতরাং এ দিক দিয়েও রবীন্দ্রনাথ একজন খাঁটি রোমান্টিক।

মরণবিলাস

রোমান্টিক কবিদের আর একটা বৈশিষ্ট্য তাদের মরণবিলাস বা মৃত্যুর প্রেম। আগেই বলেছি রোমান্টিক কবি সরলতায় শিশুর মত। শিশু যাকে ভয় পায় তাকে ছেড়ে যেতে চায় না; ভয়ের জিনিষের ওপর শিশুর এক অকৃত্রিম আকর্ষণ। তাইতো জুজুবুড়ী বা রাক্ষসখোক্কস দেখতে শিশুদের যত ভয় তত উৎসাহ। বড় কুকুরটা ঘাউঘাউ করে তাড়া করলে শিশু পালাতে চেষ্টা করবে কিন্তু একটু গিয়েই আবার পিছন ফিরে তাকাবে। ভয়কে সে ভালও বাসে। Keats তাই বলতেন যে মৃত্যুর কথা ভেবে ভেবে অনেক সময় তিনি মৃত্যুকে অনেক প্রিয়নামে ডেকেছেন। রবীন্দ্রনাথের লেখায় মৃত্যুকে এই প্রিয়নামে ডাকার অভাব নেই। মনে করুন, মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান! এটা ভানু সিংহের পদাবলীর বালক কবির গান। এই বালকের চোখে দেখুন মরণের রূপ—

মেঘবরণ তুঝ, মেঘ জটাজুট,
রক্ত কমলকর, রক্ত অধরপুট
তাপবিমোচন করুন কোর তব
মৃত্যু অমৃত করে দান।

এই মরণকেই ডাকছেন রাধা প্রিয় সম্বোধনে—

ভুজপাশে তব লহ সম্বোধয়ি,
আঁখিপাত মঝু আসব মোদয়ি,
কোর-উপর তুঝ রোদয়ি রোদয়ি
নিদ ভরব সবদেহ।
তুঁহু নহি বিসরবি, তুঁহুঁ নহি ছোড়বি,
রাধা-হৃদয় তুঝ কবহুঁ ন তোড়বি,
হিয় হিয় রাখবি অনুদিন অনুখণ
অতুলন তোঁহার লেহ।

দূর থেকে বাঁশির সুরে মৃত্যু রাধা রাধা বলে ডাকছেন। শ্রীমতি তার বিরহ ঘোচাতে অনতি বিলম্বেই ছুটবেন মনস্থ করেছেন। প্রকৃতিতে ঝড়ের পূর্বাভাস। এরই মাঝে—

একলি যাওব তুঝ অভিসারে
যাক পিয়া তুঁহুঁ কি ভয় তাহারে,

ভয় বাধা সব অভয় মূরতি ধরি
পন্থ দেখায়ব মোর।

এ রকম বালক বয়সে কীটস্ শেলীও মৃত্যুকে এভাবে দেখতে বা ডাকতে পারেন নি।

তারপর দেখুন উৎসর্গের 'মরণ মিলন'।—

অত চুপি চুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও,
ওগো একি প্রণয়েরি ধরন।

হায় এমনি করে কি ওগো চোর,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
চোখে বিছাইয়া দিবে ঘুম ঘোর
করি হৃদিতলে অবতরণ।
তুমি এমনি কি ধীরে দিবে দোল
মোর অবশ বক্ষ শোনিতে।
কাণে বাজাবে ঘুমের কলরোল
তব কঙ্কিনী-রন রণিতে?

তারপর ভানুসিংহে যেমন রাধার কাছে মৃত্যু কৃষ্ণের বিকল্প হয়ে উঠেছিল, এ এ কবিতায় সে দেখাদিল গৌরীর বিবাহে শিবের ভূমিকায়। জীবাত্মা গৌরী, মৃত্যুশিব। দুয়ের মিলন, দুয়ের নিকট যতই প্রিয় হোক বাহিরে এমন কি কনের পিতামাতার নিকটও তা মহা অমঙ্গলরূপেই প্রতিভাত হয়।—

যবে বিবাহে চলিল বিলোচন
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
তাঁর কতোমতো ছিল আয়োজন,
ছিল কতশত উপকরণ।
তাঁর লটপট করে—বাঘছাল,
তাঁর বৃষ রহি রহি গরজে,
তাঁর বেষ্টন করি জটাজাল
যত ভুজঙ্গদল তরজে।

তাঁর ববম্ ববম্ বাজে গাল,
দোলে গলায় কপলাভরণ,
তাঁর বিষাণে ফুকারি উঠে তান
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

কিন্তু মৃত্যুর এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখেও 'আত্মা' আনন্দ উছল।

শুনি শ্মশানবাসীর কলকল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
সুখে গৌরীর আঁখি ছলছল
তাঁর কাঁপিছে নিচোলাবরণ।
তাঁর বাম আঁখি ফুরে থরথর
তাঁর হিয়া দুরু দুরু দুলিছে;
তাঁর পুলকিত তনু জরজর,
তার মন আপনারে ভুলিছে।

এদিকে পিতামাতা কিন্তু অমঙ্গল আশঙ্কায় রোদন আরম্ভ করেছেন।

তাঁর মাতা কাঁদে শিরে হানিকর
খেপা বরেরে করিতে বরণ
তাঁর পিতা মনে মানে পরমাদ
ওগো, মরণ, হে মোর মরণ।

নিজের জন্যে তাই কবি বলছেন যে সংসারের কাজে ব্যস্ততাবশত বা আরামে কি অবসাদে যদি তিনি মৃত্যুকে ভুলে থাকেন তবে মৃত্যু যেন তার নিজের সময় মত কবিকে ডাক দেন। তবে সেই ডাক শুনে তার সঙ্গে মিলনের জন্য সকল ফেলে ছুটে আসবেন।

যদি কাজে থাকি আমি গৃহমাঝ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
তুমি ভেঙে দিয়ো মোর সব কাজ—
কোরো সব লাজ অপহরণ।

অথবা যদি স্বপনে মিটায়ে সব সাধ
আমি শুয়ে থাকি সুখ শয়নে,
যদি হৃদয়ে জড়ায়ে অবসাদ
থাকি আধো জাগরূক নয়নে,

তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয় শ্বাস ভরণ—
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ.
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

আবার শুনুন উৎসর্গেরই আর একটি কবিতা—জন্ম ও মরণ। কবি বলছেন,এই তো সেদিন রিক্ত শূন্য হাতে কেবল মাত্র ক্রন্দন সম্বল করে পৃথিবীতে এলাম। আজ মানুষকে এত ভালবাসছি কি করে? সমস্ত প্রাণ সংসার দিয়েই পূর্ণ করেছি, ঈশ্বরের জন্যও অতি সামান্য স্থানই সে প্রাণে অবশিষ্ট আছে। কিন্তু তাই বলে এই পৃথিবীর প্রবাসেই চিরকাল থাকবো কেন? নব নব লোকে চলে যাবো—আর সেখানেও ঈশ্বরের ভালোবাসা এমনি করেই পাবো।—

কে চাহে সংকীর্ণ অন্ধ অমরতা কূপে
এক ধরাতল মাঝে শুধু একরূপে
বাঁচিয়া থাকিতে। নবনব মৃত্যুপথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে।

নৈবেদ্যে প্রায় এইরকমই সুর শুনেছি। এতদিন মৃত্যু কি তা জানা হয়নি। আজ মৃত্যুভয়ে কবির চোখ ছলছল করে উঠছে। দু'হাতে জীবনকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরছেন।—

মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর। আজি তার তরে
উঠিতেছি ক্ষণে ক্ষণে কাঁপি থরথরে
সংসারে বিদায় দিতে আঁখি ছলছলি
জীবন আঁকড়ি ধরি আপনার বলি
দুইভুজে।

কিন্তু ভয়কে জয় করতে বেশি সময় লাগল না। কবি নিজেকেই প্রশ্ন করছেন, মূর্খ তোমার ইচ্ছায় তুমি তো পৃথিবীকে ভালবাসনাই। কে পৃথিবীকে তোমার প্রিয় করে রেখেছেন? মৃত্যুর ক্ষণে সেই তাঁকেই দেখতে পাবে। জীবন যদি ভাল লেগে থাকে, মরণও মন্দ লাগবে না।

ওরে মূঢ় জীবন সংসার
কে করিয়া রেখেছিল এত আপনার
জনম মুহূর্ত হতে তোমার অজ্ঞাতে,

তোমার ইচ্ছার পূর্বে। মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার
মুহূর্তে চেনার মতো। জীবন আমার
এত ভালোবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয়।

সব শেষে কবির সেই পরমআত্মীয়তা বোধ মৃত্যুর সাথে। মৃত্যু আমাদের মাতা, এক একটি জীবন তার এক একটি স্তন। সন্তানকে স্তন্য দানের সময় জননী মাঝে মাঝে শিশুকে স্তন পরিবর্তন করান। ঐ পরিবর্তনের সময় শিশু বুঝি যা হারালাম তা আর পাব না ভেবে চীৎকার শব্দে কাঁদতে আরম্ভ করে। কিন্তু সে ক্ষণিকের সন্দেহ—ক্ষণিকের কান্না, ক্ষণপরেই স্তনান্তরে গিয়ে তার মোহ দূর হয়।—

স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে
মুহূর্তে আশ্বাস পায়, গিয়ে স্তনান্তরে॥

কণিকায়ও ঠিক এমনি কথা আছে -

দিনান্তের মুখ চুম্বি রাত্রি ধীরে কয়
আমি মৃত্যু তোর মাতা নাহি মোরে ভয়।
নব নব জন্ম দানে পুরাতন দিন
আমি তোরে করে দিই প্রত্যহ নবীন।

মৃত্যুকে শুধু অপরিহার্য্য বলে গ্রহণ করা নয়, মৃত্যুকে কবি দেখলেন জীবনের পরিপূর্ণতা রূপে,—

ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা,
মরণ, ওগো মরণ আমার, কও আমারে কথা।

এই শেষ পরিপূর্ণতার মধ্যেই তিনি দেখলেন মৃত্যুর মাধুরী—

পরাণ কহিছে ধীরে হে মৃত্যু মধুর,—
এই নীলাম্বর, একি তব অন্তঃপুর।
আজি মোর মনে হয় এ শ্যামলা ভূমি
জলে স্থলে লীলা আজি এই বরষার,
এই শান্তি, এ লাবণ্য সকলি তোমার।
মনে হয়, যেন তব মিলন বিহনে
অতিশয় ক্ষুদ্র আমি এ বিশ্ব ভুবনে।

তারপর মৃত্যুর এক করুণ প্রসন্ন মূর্তি ভেসে উঠল কবির চক্ষে। ভয় তাঁর ভেঙে গেল। বিশ্বজগতে সর্বত্রই তিনি মৃত্যুর সহিত মিলনের বাঁশীর সুর শুনতে পেলেন। প্রশান্ত করুণ চক্ষে, প্রসন্ন অধরে—

তুমি মোরে ডাকিতেছ সর্ব চরাচরে।
প্রথম মিলন ভীতি ভেঙেছে বধূর,—
তোমার বিরাট মূর্তি নিরখি মধুর।
সর্বত্র বিবাহ বাঁশী উঠিতেছে বাজি,
সর্বত্র তোমার ক্রোড় হেরিতেছি আজি।

মিস্‌টিসিজম্‌

রোমান্টিক কবিদের আর একটি বৈশিষ্ট্য তাদের মিস্‌টিসিজম্‌ বা রহস্যবাদ। রহস্য অর্থাৎ গোপন তথ্য। বাইরে থেকে আমরা যে জিনিষটি দেখছি তার ভেতরে যেন অন্য কিছু আছে। ডিটেকটিভের রহস্য নয়, বরং বলা যেতে পারে আধ্যাত্মিক রহস্য। তবে আধ্যাত্মিকতা পর্য্যন্ত না গেলেও চলবে। যেমন ধরুণ রবীন্দ্রনাথের 'প্রকাশ' কবিতা।—হাজার হাজার বছর কেটেছে কেহ তো কহে নি কথা। এ কবিতার আখ্যান ভাগ হচ্ছে এই যে সেই প্রাচীন জগতে যখন কেহ কাহাকেও সন্দেহ করতো না, তখন চকোরী চাঁদকে প্রেম নিবেদন করতো, ভ্রমর ফুলকে—নব মালতীকে, কমল সূর্য্যকে, সকলেই নির্ভয়ে নিজ নিজ প্রেমাস্পদের নিকট আপন আপন হৃদয়খানি মেলে ধরতে পারতো। তারপর এক কবি বোবার মত চুপি চুপি এইসব প্রেম-দেওয়া-নেওয়ার কাহিনী সংগ্রহ করতে লাগল। কিন্তু তাকে দেখে কারও সন্দেহই হল না। এমন কি—

বাসর ঘরের দুয়ার কখনও যদি বা যাইত খুলি,
শিয়রের দীপ নিভাইতে কেহ ছুড়িত না ফুল ধুলি।

তারপর সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ হয়ে গেলে একদিন সেই যে ছিল বোবর মত পরের কুৎসা রটাবার বেলা তারই মুখে না কত কথা ফুটলো। সে চীৎকার করে জগতকে জানিয়ে দিল—

নর নারী, শুন সবে,
কতকাল ধরে কী যে রহস্য ঘটিছে নিখিল ভবে
এ কথা কে কবে স্বপনে জানিত, আকাশের চাঁদ চাহি
পাণ্ডু কপোল কুমুদীর চোখে সারারাত নিদ নাহি।

উদয় অচলে অরুণ উঠিলে কমল ফুটে যে জলে।
এত কাল ধরে তাহার তত্ত্ব চাপা ছিল কোন ছলে।
এত যে মন্ত্র পড়িল ভ্রমর নব মালতীর কানে
বড়ো বড়ো যত পণ্ডিত জনা বুঝিল না তার মানে।
শুনিয়া তপন অস্তে নামিল সরমে গগন ভরি,
শুনিয়া চন্দ্র থমকি রহিল বনের আড়াল ধরি,
শুনে সরোবরে তখনি পদ্ম নয়ন মুদিল ত্বরা,
দখিন—বাতাস বলে গেল তারে সকলি পড়েছে ধরা।
শুনে 'ছি ছি' বলে শাখা নাড়ি নাড়ি শিহরি উঠিল লতা,
ভাবিল মুখর এখনি না জানি আরো কি রটাবে কথা?
ভ্রমর কহিল যুথীর সভায় যে ছিল বোবার মতো
পরের কুৎসা রটাবার বেলা তারো মুখ ফোটে কত!
শুনিয়া তখনি করতালি দিয়ে হেসে উঠে নরনারী—
যে যাহারে চায় ধরিয়া তাহায় দাঁড়াইল সারি সারি।
'হয়েছে প্রমাণ' 'হয়েছে প্রমাণ' হাসিয়া সবাই কহে—
'যে-কথা রটেছে একটি বর্ণ বানানো কাহারো নহে'।

প্রকৃতির অন্তরে যে প্রেমলীলা চলেছে নিরন্তর বাইরে থেকে তাকে ভ্রমর-গুঞ্জন ইত্যাদি পরিচিত ব্যাপার বলে মনে হলেও তার ভেতরে এক বিপুল রহস্য আছে। এই রহস্যেরই উদঘাটন প্রকাশ কবিতায়। তবে এমন সাধারণ ভাবে উদঘাটনের বা হাটে হাড়ি ভাঙার দরকার নাই। রহস্যবাদী সাধারণ সাধারণ জিনিষের মধ্যে অসাধারণের ইঙ্গিত দেখতে পান। এবং সামান্যতম ইসারা বা আভাসে সেই রহস্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইহারই নাম রহস্যবাদ। রোমান্টিক কাব্যে এই ধরণের রহস্যবাদ সাধারণতই দেখা যায়। ঐ প্রকাশ কবিতায়ই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে সেই প্রথম কবি কর্তৃক রহস্য ফাসের পর থেকে প্রকৃতি সাবধানী হয়ে গেছেন। এখন প্রকৃতির নিকেতনে স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না। শুধু কুজনে গুঞ্জনে আভাসে মনে হয় প্রকৃতির অন্তঃপুরে কী যেন গোপন লীলা একটা চলেছে।

হায় কবি হায় সে হতে প্রকৃতি হয়ে গেছে সাবধানী
মাথাটি ঘেরিয়া বুকের উপরে আঁচল দিয়েছে টানি।

যত ছলে আজ যত ঘুরে মরি জগতের পিছু পিছু
কোনোদিন কোনো গোপন খবর নূতন মেলে না কিছু।
শুধু গুঞ্জনে কূজনে গন্ধে সন্দেহ হয় মনে,
লুকানো কথার হাওয়া বহে যেন বন হতে উপবনে,
মনে হয় যেন আলোতে ছায়াতে রয়েছে কী ভাব ভরা,
হায়, কবি, হায় হাতে হাতে আর কিছুই পড়ে না ধরা।

প্রকাশ কবিতায় রহস্যবাদটুকু রহস্য বা লঘু তামাসা বা কৌতুকের মতই মনে হতে পারে। একটু যে কৌতুক ওর মধ্যে নেই তা আমিও বলব না। তবে এই রহস্যবাদই এই কবির ও শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ কবি কারণ তিনি সীমার মাঝে অসীমের স্বর শুনেছেন, পর্বতকে দেখেছেন যেন 'অগমের লাগি ওরা ধরণীর স্তম্ভিত ব্যাকুলতা,' ফুলকে দেখেন যেন—

বনের ভালোবাসা আঁধারে বসি
কুসুমে আপানারে বিকাশে।

তারাও তাই—

তারকা নিজ হিয়া তুলিছে উজলিয়া
আপন আলো দিয়া লিখা সে।

তাঁর "পুষ্প" নারীকে বলে,—

আজ সখি, বুঝিলাম আমি
সুন্দর আমাতে আছে থামি,
তোমাতে সে হল ভালবাসা।

তাঁর ফুল যায় প্রজাপতি হয়ে,—তাঁর প্রদীপ হয় জোনাকি।

এই ধরণের মিষ্টিসিজমকে আর রহস্য বাদ না বলে অতীন্দ্রিয়বাদ বললেই ভাল হয়। ইন্দ্রিয়ের সীমাকে অতিক্রমকরা জ্ঞানের কথা আছে এতে। ইন্দ্রিয়াতীগ রাজ্যের ব্যাপার। এমন কি বুদ্ধি দিয়েও অনেক সময়ে এর তথ্য সব বোঝা যায় না। যতো বাচা নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

সেথা নাহি যায় হাত, নাহি যায় বাণী। আর সেখান থেকে যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ। হাতে তুলে কাউকে কিছু দেওয়া চলে না। বুঝ নর যে জান সন্ধান। কবিও বলেছেন—

বন্ধু, তুমি সেথা হতে আপনি যা পাবে আপনার ভাবে
না চাহিতে না জানিতে সেই উপহার সেই তো তোমার।

এখানেই কবি মন অসীমের যাত্রী হয়ে ওঠে। সুরের ডানায় ভর করে অর্থের বন্ধন ফেলে সে উড়তে চায় সঙ্গীতের মতন স্বাধীন। তখনি সে বলে,

হাত দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই
গান দিয়ে সেই চরণ ছুঁয়ে যাই।

তারপর তিনি বুঝতে পারেন অন্ধকারে অস্ত রবির লিপি লেখা। এবং তারই অর্থ শেখার জন্য তাঁর মন কেঁদে মরে! এবং যেদিন এ অর্থ তিনি শেখেন তিনি দেখতে পান তার অজ্ঞাত কিছুই নাই, অন্ধকারও নাই। সকাল বেলায় যে সূর্য্য পৃথিবী বা সৃষ্টি প্রকাশ করে সে স্রষ্টাকেই রাখে লুকিয়ে তার আপন আড়ালে।

তুমি এতো আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে
কী উৎসবের লগনে।
সব আলো তার কেমন করে
ফেলো আমার মুখের পরে
আপনি থাকো আলোর পিছনে।

তখন সেই সকালের আলোতে স্রষ্টার মুখ এবং সৃষ্টির বুক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দিনের আলোতে পৃথিবী ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। কিন্তু সেই আলোর আড়ালে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আড়াল হলেও থাকে বই কি।

কহিলেন বসুন্ধরা, দিনের আলোকে।
আমি ছাড়া আর কিছু পড়িত না চোখে।
রাত্রে আমি লুপ্ত যবে শূন্যে দিল দেখা
অনন্ত-এ জগতের জ্যোতির্ম্ময়ী রেখা।

অন্ধকারে অস্ত রবির লিপিতে কি এই কথাই লেখা আছে। আমরা বুঝি উল্টো করে পড়ি বলে তার মানে বুঝি নে।—

বীপরীত মুখে তারে পড়েছিনু তাই।
বিশ্ব জোড়া সে লিপির অর্থ বুঝি নাই।

এই অতীন্দ্রিয়তার পরিণতি সাঙ্কেতিক নাটকে। অচলয়াতন, গুরু, রক্ত করবী, ডাকঘর, রাজা ইত্যাদি। জিজ্ঞাসু রবীন্দ্রনাথে আমরা তার সবিশেষ আলোচনা করেছি।

প্রেমপ্রবণতা

সর্বশেষে রোমান্টিকদের সর্বজনপরিচিত গুণ হচ্ছে প্রেমপ্রবণতা। এই গুণটি তাদের মধ্যে এত বেশি যে গম্ভীর প্রকৃতির লোকদের কাছে রোমান্টিক কথাটার মানেই দাঁড়িয়ে গেছে গ্যালান্ট অর্থাৎ নায়কভাবাপন্ন। মেয়েদের বেলায় ও এ কথাটার ব্যবহার হতে পারে তখন ওটার মানে হবে নায়িকাভাবাপন্ন। প্রেমে পড়বার জন্য যে তৈরী হয়েই আছে, যে কোন রকম একটা প্রেম না হলে যায় কিছুতেই চলে না। সেইজন্যে একজন সমালোচক বিদ্রূপ করে বলেছিলেন যে রোমান্টিকরা তাদের হৃদয় নামক অঙ্গটি যেন জামার হাতায় লাগিয়ে বেড়ায়। দুনিয়ার সর্বসাধারণের কাছে ঢেঁড়া পিটিয়ে দেওয়া আছে, এসো, আমায় দেখো। তার কাছে তার হৃদয়ের আকাজ্ক্ষা পবিত্র। সেই চণ্ডীদাসের মতন। সবার উপরে হৃদয় সত্য তাহার উপরে নাই। চণ্ডীদাস একটু ঘুরিয়ে হৃদয়ের জায়গায় মানুষ কথাটি লাগিয়ে এক ঢিলে দুই পাখী মেরে গেছেন মাত্র। নইলে তারও আসল যা বক্তব্য সে ছিল আকাজ্ক্ষার পবিত্রার কথাই। রামী ধোবানীকে তার চাই, সে চাওয়ার উপরে সমাজ বল, ধর্ম্ম বল, আর কিছু নাই। অবশ্য শেলী বায়রাণ এরা এই হৃদয়ের চাহিদা মেটাতে শেষ পর্য্যন্ত দেশ থেকে নির্বাসন গ্রহণ করতেই বাধ্য হয়েছিলেন। এ বিষয়ের আলোচনা অন্যত্র করা যাবে।

মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই যে রোমান্টিক কবি মনে করে প্রেমের চেয়ে বড়ো কিছু নাই। রামচন্দ্র রাজকর্তব্যে স্ত্রীকে ত্যাগ করেছিলেন, রোমান্টিক অষ্টম এডওয়ার্ড প্রেমিকার জন্য রাজ্য ত্যাগ করলেন। আর প্রেমের জন্য ত্যাগ না করলে তো গল্পই জমে না। রবীন্দ্রনাথের চোখেও প্রেমের এই ঝল্‌মলানি চমক্ লাগিয়ে দিয়েছিল। তিনি তাই 'প্রেমের অভিষেক' লিখে ফেললেন।—

> তুমি মোরে করেছ সম্রাট, তুমি মোরে
> পরায়েছে গৌরব মুকুট, পুষ্পডোরে
> সাজায়েছ কণ্ঠ মোর। তব রাজটিকা
> দীপিছে ললাট মাঝে মহিমার শিখা
> অহর্নিশি।

যদিও জগতে আমার স্থান অতি সাধারণ।

> হেথা আমি কেহ নহি,
> সহস্রের মাঝে একজন—সদা বহি
> সংসারের ক্ষুদ্রভার, কত অনুগ্রহ,

কত অবহেলা সহিতেছি অহরহ।
সেই শত সহস্রের পরিচয়হীন
প্রবাহ হইতে এই তুচ্ছ কর্মাধীন
মোরে তুমি লয়েছ তুলিয়া।

আর এই প্রেমেই প্রেমিকের সকল দৈন্য ঢেকে গেছে—

আমার সকল দৈন্য লাজ,
আমার ক্ষুদ্রতা যত, ঢাকিয়াছ আজ
তব রাজ আভরণে।

এই প্রেমের বলে প্রেমিক পেয়েছেন প্রেমের স্বর্গে স্থান যে স্বর্গে অনাদি কালের প্রেমিক-প্রেমিকারা অবস্থান করছেন।

প্রেমের অমরাবতী,
প্রদোষ-আলোকে যেথা দময়ন্তী সতী
বিহারে নলের সনে দীর্ঘ নিশ্বসিত
অরণ্যের বিষাদ মর্মরে ; বিকশিত
পুষ্প বীথিতলে শকুন্তলা আছে বসি,
করপদ্মতললীন ম্লান মুখশশী,
ধ্যানরতা ; পুরুরবা ফিরে অহরহ
বনে বনে, গীতস্বরে দুসঃহ বিরহ
বিস্তারিয়া বিশ্বমাঝে,.........
গিরিতটে শিলাতলে
কানে কানে প্রেমবার্তা কহিবার ছলে
সুভদ্রার লজ্জারুণ কুসুম কপোল
চুম্বিছে ফাল্গুনী ;...............
বাঁশরীর ব্যথাপূর্ণ তান
কুঞ্জে কুঞ্জে তরুচ্ছায়ে করিছে সন্ধান
হৃদয় সাথিরে—হাত ধরে মোরে তুমি
লয়ে গেছ সৌন্দর্যের সে নন্দনভূমি
অমৃত আলয়ে।

আর এই প্রেমের স্পর্শে কবি নিজেকে দেখতে পেলেন আর সাধারণ মানুষ বলে নয়। তার রোমান্টিক অহং বা ego বিরাট হয়ে ফুলে উঠল।

সেথা আমি জ্যোতিষ্মান
অক্ষয় যৌবনময় দেবতা সমান,
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা
সেথা মোরে অর্পিয়াছে আপন মহিমা
নিখিল প্রণয়ী ; সেথা মোর সভাসদ
রবি চন্দ্রতারা, পরি নব পরিচ্ছদ
শুনায় আমারে তারা নবনব গান
নব অর্থ ভরা ; চির সুহৃদ্ সমান
সর্ব চরাচর।

আমি আগেই রোমান্টিকের আত্মদর্শন ও তজ্জনিত বিস্ময়ের কথা বলেছি। নিজেকে জেনে, তার নিজের ভেতরটাকে আবিষ্কার করে রোমান্টিকের আত্মপ্রীতি ও আত্মপ্রত্যয় বেড়ে যায়। আবার এই নিজের ভেতরে সে প্রেমকেও দেখতে পায়। প্রেমিক বলেও তখন নিজের ওপর তার অস্পষ্ট শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। ফলে তার অহঙ্কার যায় স্ফীত হয়ে। একেই বলে রোমান্টিকের (Egotism) অহঙ্কার। অবশ্য অহঙ্ককারটা যে সব সময়েই মন্দ এমন কথা বলা যায় না। অহঙ্কার যেখানে আত্ম-সম্মানবোধরূপে জাগ্রত হয় সেখানে সে মানুষের অশেষ কল্যাণকারী হয়ে থাকে। আমি অমুক, আমি করব ছোট কাজ—এ ধারণা যেই প্রাণে আসে অমনি সে বেঁচে গেল।

এই প্রেম কিন্তু বিশ্বপ্রেম নয়—সবারে ভালোবাসা নয়। এ নিছক নর-নারীর যৌন আকর্ষণ। আপন তীব্রতায় সে আপনাকে যতই ছাপিয়ে উঠুক না কেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে এর স্বরূপ বর্ণনা করেছেন—

নিবিড় তিমির নিশা অসীম কান্তার,
লক্ষ দিকে লক্ষ জন হইতেছে পার।
অন্ধকারে অভিসার, কোন্ পথপানে
কার তরে পান্থ তাহা আপনি না জানে।
শুধু মনে হয় চির জীবনের সুখ
এখনি দিবেক দেখা লয়ে হাসি মুখ।

এ যেন প্রেমে-পড়ার প্রেমে পড়া। ভালবাসতেই হবে বলে ভালোবাসা। কে সেই ভালবাসার পাত্র জানি না। মন দেবো বলে বেরিয়েছি। যাকে

প্রথম দেখবো তাকেই তা করব নিবেদন। যাকে বলে প্রথম দর্শনে প্রেম (Love at first sight)। তবে আমার মনটা এজন্যে প্রস্তুত হওয়া চাই।—

কত স্পর্শ কত গন্ধ কত শব্দ গান,
কাছ দিয়া চলে যায় শিহরিয়া প্রাণ।
দৈবযোগে ঝলি যায় বিদ্যুতের আলো,
যারেই দেখিতে পাই তারে বাসি ভালো,
তাহারে ডাকিয়া বলি—ধন্য এ জীবন,
তোমারি লাগিয়া মোর এতেক ভ্রমণ,
অন্ধকারে আর সবে আসে যায় কাছে,
জানিতে পারিনে তারা আছে কি না আছে।

এ জৈব ভালোবাসার পার্থিব সীমা টানা আছে। এ দেওয়া-নেওয়ার অপেক্ষা রাখে। প্রত্যাখ্যানে মরমে মরে যায়। এর সার্থকতা পার্থিব মূল্য মানে। কিন্তু প্রেমকে অত বড় করে দেখলে তাকে সীমার মধ্যে ধরে রাখা দায়। নিজের যোগ্যতা বিচার না করেই অতি উচ্চে লক্ষ্য সন্ধান করলে যে বিপদ হতে পারে তা আর মনে থাকে না। তাই তো দেখি গুপ্ত প্রেমে রূপহীনা কুরূপা ভেতরের প্রেমের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, আর বাইরে প্রত্যাখ্যানের ভয়ে শুকিয়ে উঠছে।—

তবে পরাণে ভালোবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি, বিধি হে,
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া,
পূজিব তারে গিয়া কি দিয়ে।

লুকায়ে থাকি সদা পাছে সে দেখে,
ভালবাসিতে মরি শরমে।
রুধিয়া মনোদ্বার—প্রেমের কারাগার
রচেছি আপনার মরমে।

কিন্তু প্রেমিকের দুর্ভাগ্য গোড়াতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান নাও হতে পারে। নোতুনের মোহে অজ্ঞানের উদারতায় যা পাই তাই বিশ্বাস করে নিতে পারা যায়। তবে চিরকাল মনকে এখানে ধরে রাখা যায় কি? অর্থাৎ ভালোবাসা

ধোপে• টেকে তো ?—অনেক সময়েই টেকে না। তারপর আসে জোড়াতালির পালা—না হয় হাড়ি ভাঙার। যে-প্রেম একদিন মনে হয়েছিল—

অমরাবতী তেজে ধরায় এসেছে সে
তাহারো চেয়ে সে যে মহীয়ান।

তাকেই একদিন মনে হয় ভুল, শুধু ক্ষণিকের ভ্রান্তি। যত নিষ্ঠুরই হোক সে কথা—প্রাণে যতই আঘাত লাগুক—অস্বীকার করবার উপায় নেই। "ব্যক্ত প্রেমে" তাই এই ভুলের ফসল ফলতে দেখি—

ভুল করে এসেছিলে ? ভুলে ভালোবেসেছিলে ?
ভুল ভেঙে গেছে তাই যেতেছ চলিয়া।

তখন কত হিসেব—পাপ পুণ্যের—সুবিধা অসুবিধার। আর প্রেম বেহিসেবী প্রাণের আবেগ নয়।

এ কী নিদারুণ ভুল, নিখিল নিলয়ে
এত শত প্রাণ ফেলে ভুল করে কেন এলে
অভাগিনী রমণীর গোপন হৃদয়ে।
ভেবে দেখো, আনিয়াছ মোরে কোন্‌খানে—
শত লক্ষ আঁখি ভরা কৌতুকে কঠিন ধরা
চেয়ে রবে অনাবৃত কলঙ্কের পানে॥

তখনই প্রথম বোঝা যায় প্রেমের কবিতা পড়তে যত ভালো, প্রেম তত্তটা ভালো নাও হতে পারে, প্রেমিক-প্রেমিকার মনে ভালোবাসা যতই বড় হোক বাইরের জগতের কাছে সেটা সবটুকু সুন্দর নয়।

লুকানো প্রাণের প্রেম পবিত্র সে কত,
আঁধারে হৃদয়তলে মাণিকের মত জ্বলে,
আলোতে দেখায় কালো কলঙ্কের মতো।

জোড়াতালির কবিতাও রবীন্দ্রনাথ লিখতে ভোলেন নি। নারীর উক্তি ভালোবাসার ভাঁটার মুখে একদা-সোহাগিনীর অভিমান। সব কিছুই আজ বিস্বাদ ঠেকছে। ঐশ্বর্য্যের অন্ত নাই, বাহ্যিক আদর আপ্যায়ন সবই ঠিক আছে, নাই কেবল অন্তরের আকর্ষণ। মন তাই গুম্‌রে উঠছে অশান্ত ক্রন্দনে—

মিছে তর্ক—থাক্ তবে থাক্,
কেন কাঁদি বুঝিতে পার না ?

তর্কেতে বুঝিবে তা কি, এই মুছিলাম আঁখি,
এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভৎর্সনা।
আমি কি চেয়েছি পায়ে ধরে—
ওই তব আঁখি তুলে চাওয়া,
ওই কথা, ওই হাসি, ওই কাছে আসা-আসি,
অলক দুলায়ে দিয়ে হেসে চলে যাওয়া?

... ...

আছি যেন সোনার খাঁচায়।
একখানি পোষমানা প্রাণ—
এও কি বুঝাতে হয় প্রেম যদি নাই রয়—
হাসিয়ে সোহাগ করা শুধু অপমান?
জীবনের বসন্তে যাহারে
ভালোবেসেছিলে একদিন,
হায় হায় কী কুগ্রহ, তারে আজ অনুগ্রহ—
মিষ্ট কথা দিবে তারে গুটি দুই তিন।
অপবিত্র ও কর পরশ—
সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে,
মনে কি করেছ বঁধু ও হাসি এতোই মধু—
প্রেম না দিলেও চলে, শুধু হাসি দিলে॥

এই ভৎর্সনার উত্তরে পুরুষকে স্বীকার করতে হয়েছে তার অপরাধ। কিন্তু অপরাধী হয়েও সে সত্যকে বুঝতে পেরেছে। প্রথম মিলনের সে আগ্রহ চিরকাল থাকে না। প্রতিদিনের দেওয়া-নেওয়ায় প্রেম পুরানো হয়। তখন আর প্রেমিকাকে লক্ষ্মীর মত দানের আসনে বসিয়ে তার কাছে প্রেম ভিক্ষা করা যায় না। তখন সহজেই বোঝা যায়—আমি যেমন চাই তার কাছে তেমনি সেও আমার কাছে প্রার্থীই বটে। সে দেবী নয়, সে সামান্যা মানবী। তখন একদিনের পূজার আড়ম্বর মিথ্যা ছেলেখেলা বলে মনে হয়। তখন মনে হয় শুধু ভালোবেসে গেলেই ভালো ছিল—প্রতিদান পেয়েই সব খোয়ালাম।

কেন তুমি মূর্ত হয়ে এলে,
রহিলে না ধ্যান ধারণার।

সেই মায়া উপবন কোথা হল অদর্শন—
কেন হায় ঝাঁপ দিতে শুকালো পাথার ॥
... ...
তাই আর পারিনা সঁপিতে
সমস্ত এ বাহির অন্তর।
এ জগতে তোমা ছাড়া ছিল না তোমার বাড়া
তোমারে ছেড়েও আজ আছে চরাচর ॥

তাই ভাবের ঘরে চুরি আর না রেখে, না করে, পুরুষ নারীকে বলছে এসো সেই বাড়াবাড়িটা ভুলে সহজে সংসার-ধর্ম করি। দেবতার পূজা দেবতাকে দেওয়া ভালো।

প্রাণ দিয়ে সেই দেবীপূজা
চেয়ো না চেয়ো না তবে আর,
এসো থাকি দুইজনে সুখে দুঃখে গৃহকোণে
দেবতার তরে থাক পুষ্প-অর্ঘ্য ভার ॥

এই কবিই একদিন বলেছিলেন,

দেবতারে যাহা দিতে পারি তাই দিই প্রিয়জনে,
প্রিয়জনে যাহা দিতে পারি তাই দিই দেবতারে,—
আর পাবো কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।

এবার কবি কণ্ঠে গান শুনি—

প্রেমের পূজায় এই কি লভিলি ফল।
ঊষর মরুতে কেন দিলি আঁখিজল।

প্রেম সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার এ স্থান নয়। প্রেমের রোমান্টিক আদর্শ ও বিকার রবীন্দ্রনাথে কি পরিমাণ ছিল তাই দেখিয়েই এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত হল।

রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়সে এ-দেশে শেলির সঙ্গে তুলনীয় ছিলেন। জীবন-স্মৃতিতে তিনি নিজেই বলেছেন যে লোকে তাঁকে শেলি বলত। তিনিও এ তুলনায় সানন্দ স্বীকৃতি জানাতেন। পরবর্তীকালেও তিনি রোমান্টিক বলে নিজেকে স্বীকার করেছেন।—

আমারে বলে যে ওরা রোমান্টিক।
সে কথা মানিয়া লই।

রস-তীর্থ পথের পথিক।
মোর উত্তরীয়ে
রঙ লাগায়েছি, প্রিয়ে।
দুয়ার বাহিরে তব আসি যবে
সুর করে, ডাকি আমি ভোরের ভৈরবে।
বসন্তের গন্ধ আনি তুলে
রজনীগন্ধার ফুলে
নিভৃত হাওয়ায় তব ঘরে।
কবিতা শুনাই মৃদু স্বরে,
ছন্দ তাহে থাকে,
তার ফাঁকে ফাঁকে
শিল্প রচে বাক্যের গাঁথুনি—
তাই শুনি
নেশা লাগে তোমার হাসিতে।
আমার বাঁশিতে যখন আলাপ করি মুলতান
মনের রহস্য নিজ রাগিনীর পায় যে সন্ধান।
যে কল্পলোকের কেন্দ্রে তোমারে বসাই
ধূলি-আবরণ তার সযত্নে খসাই—
আমি নিজে সৃষ্টি করি তারে
ফাঁকি দিয়ে বিধাতারে।
কারুশালা হতে তাঁর চুরি করে আনি রঙ-রস,
আনি তাঁরি জাদুর পরশ।
জানি, তার অনেকটা মায়া,
অনেকটা ছায়া।

আর এই কবিতায় রোমান্টিক কাব্যের—প্রেমপ্রলাপ, প্রকৃতি বিলাস, আত্মরতি, কল্পলোকসৃষ্টি, দূরের মায়া, ও অতীতের ছায়াপাত এই কয়টি লক্ষণ লক্ষিত হয়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক কবিতাকে বাস্তবধর্মী বলেন নাই। কিছু তার ছায়া আর কিছু মায়া।

আমাকে শুধাও যবে এরে কভু বলে বাস্তবিক?
আমি বলি, কখনো না, আমি রোমান্টিক।

যেথা ঐ বাস্তব জগৎ
সেখানে আনাগোনার পথ
আছে মোর চেনা।
সেথাকার দেনা
শোধ করি—সে নহে কথায় তাহা জানি—
তাহার আহ্বান আমি মানি।
দৈন্য সেথা, ব্যাধি সেথা, সেথায় কুশ্রীতা,
সেথায় রমণী দস্যুভীতা—
সেথায় উত্তরী ফেলি পরি বর্ম ;
সেথায় নির্মম কর্ম,
সেথা ত্যাগ, সেথা দুঃখ, সেথা ভেরি বাজুক 'মা ভৈঃ',
শৌখিন বাস্তব যেন সেথা নাহি হই।
সেথায় সুন্দর যেন ভৈরবের সাথে
চলে হাতে হাতে।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথকে রোমান্টিক কবি বললে অন্যায় হবে না। তবে এই প্রসঙ্গে রোমান্টিসিজম ও তার দুর্বল দিকগুলি সব সময়েই মনে রাখতে হবে, এবং রবীন্দ্রনাথ যে রোমান্টিক হয়েও শ্রেষ্ঠ রোমান্টিকদের মত রোম্যান্সকে অতিক্রম করেছিলেন সে কথাও ভুললে চলবে না।

হিউম্যানিষ্ট রবীন্দ্রনাথ

Humanism কথাটা একটু গোলমেলে। প্রায়শঃই দেখি **Humanitarianism**এর-সঙ্গে ওর একটা **confusion** হয়ে যাচ্ছে। বড় বড় নাম করা লেখক ও সমালোচকের লেখাতেই ও ব্যাপার ঘটছে। কোন কোন বই-এ দেখতে পাই একটা শব্দ 'মানবমুখীতা', মনে হয় ইংরেজী **Humanism** শব্দেরই প্রতিশব্দ ওটা, কিন্তু তা হলে তো **Humanism**-এর অর্থ ঠিক থাকে না। 'মানবমুখী' কথাটা লেখার ভেতরে যে ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তাতে যেন বোঝায় মানুষের অর্থাৎ সাধারণ মানুষের জন্য দরদ। সেই সুধীরচন্দ্র করের

জনগণের রবন্দ্রনাথ আর কি। সাহিত্যে মানবমুখীতা মানেও দাঁড়ায় সাহিত্যে সাধারণ লোকের প্রতি দরদ।

ইংরেজীতে হিউম্যানিজম কথাটার একটা বিশেষ অর্থ আছে। সেটাকে বরং মানবিকতা বা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী বললেই ভাল হয়। এ কথাটা **idealism** বা আদর্শবাদের বীপরিত অর্থ দ্যোতক, আর সেই হিসেবে রোমান্টিসিজমেরও বিপরীত, এমন কি সোস্যালিজমেরও। রোমান্টিক বা সোস্যালিষ্ট আইডিয়ালিষ্টরা একটা উচ্চ আদর্শে চালিত হন। ঐ আদর্শের মাপকাঠিতেই সব কিছুর বিচার করেন। সেই আদর্শ অনমনীয়। তার কাছে অন্য কোন বিবেচনা নাই। সেই আদর্শের যূপকাষ্ঠে বিদ্রোহীদের বলি দিতেই হবে। অন্ততঃ আদর্শভ্রষ্টদের জাতিচ্যুত করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এমন যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ তিনিও কবির আদর্শ ভ্রষ্ট হয়ে গেলেন রাজকবির পদ গ্রহণ করে, আর ব্রাউনিং তাকেই **"Lost Leader"** আখ্যা দিলেন। লিখলেন,

> **Just for a handful of silver he left us**
> **Just for a ribbon to stick in his hat."**

মানুষের চিন্তাধারায় এখনও আদর্শবাদের যুগ চলেছে। কারও আদর্শ রোমান্টিক, কারও ক্লাসিক্যাল, কারও সমাজতান্ত্রিক, কারও ডেমোক্র্যাটিক—কিন্তু সর্বত্রই আদর্শ একটা আছেই। আর সে আদর্শ এমন যে সকলের পক্ষে তার সবটুকু গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এই সব 'অমানুষ' আদর্শের কাছে যুগে যুগে তাই মানুষগুলো বলি হয়ে আসছে।

এই থেকে প্রশ্ন আসে আচ্ছা আদর্শগুলোকে আর একটু মনুষ্যোচিত করে নিলে হয় না? এই **inhuman ideal**গুলোকে একটু **Humanise** করা যায় না!—এরই উত্তরে এলো **Humanism** বা মানবিকতা। এই মতে প্রথম স্বীকার্য্য হচ্ছে মানুষের অপরিপূর্ণতা। ইহা আদর্শের মধ্যে মানুষের অপূর্ণতা ও দুর্বলতার স্বীকৃতি। কথাটা আরও পরিষ্কার করে বোঝাতে হলে দুরূহ-বিষয়ের অবতারণা ভিন্ন হবে না। **Haldane**-এর মতে **Humanism** হচ্ছে—**Einstein**-এর থিওরি অব রিলেটিভিটির চিন্তারক্ষেত্রে প্রয়োগ। সাহিত্যে হিউম্যানিজম মানে তাহলে সাহিত্যে রিলেটিভিটি।

'রিলেটিভিটি' নাম শুনে ভয় পাবার কিছু নেই। এর গাণিতিক অংশ আমারও বোধগম্য নয়, সুতরাং আমার লেখার পাঠকদের সামনে সেটা আমি বিভীষিকার মূর্তিরূপে তুলে ধরতে পারবো না। রিলেটিভিটির নীতিগত অংশই

আমাদের বিবেচ্য। সে নীতিটা এই যে এ-বিশ্বে কোন জিনিষই একেবারে খাঁটি একটা কিছু নয় যাহা স্থানকালপাত্র-নিরপেক্ষ ভাবে সত্য। খাদ্যের ভাল লাগা মন্দলাগা যেমন ব্যক্তি-নির্ভর। দিনরাত্রি যেমন স্থান-নির্ভর, সেই রকম সব কিছুই স্থানকাল পাত্র-নির্ভর। ইউরোপীয় চিন্তাধারা কান্ট ও হেগেল পর্য্যন্ত স্থান ও কালের অন্য নিরপেক্ষতা স্বীকার করেছে। আর সবই ব্যক্তি-নির্ভর কিন্তু স্থান ও কাল ব্যক্তি থাকুক বা না থাকুক তারা নিজেরা আছেই! আর যা' কিছু আছে তা স্থান ও কালের ওপরে নির্ভর করে আছে। এ মতে স্থান ও কালই মহামায়া, তাতে বিধৃত হয়ে জগতের অস্তিত্ব। তার পর আইনষ্টাইন দেখালেন যে সময়ের মানও অন্য নিরপেক্ষ নয়। বিভিন্ন সৌরলোকে সময়ের বিভিন্ন পরিমাপ হতে পারে। স্থানও অসীম নয়। Space বক্র ও সসীম সুতরাং জগতে অন্য নিরপেক্ষ বা absolute বলে আর কিছু থাকলো না। সব কিছুই Relative, স্থানকালপাত্র-নির্ভর।

Haldane দেখালেন মানুষের চিন্তায় সত্য ও ঐ রকম রিলেটিভ। চিন্তা ব্যক্তি বিশেষের। সে তার ব্যক্তিত্বরূপ আধারে সত্যকে ধারণ করায় সত্য এক বিশেষরূপ গ্রহণ করেছে। সেই রূপেই সত্যকে সে তার লেখায় পরিবেশন করছে। সুতরাং এ সত্য সেই ব্যক্তি বিশেষের সত্য। জলের যেমন রূপ বা বর্ণ নেই, পাত্রের রূপই তার রূপ, বিম্বিত বস্তুর রংই জলের রং। সত্যেরও সেইরকম যে রূপ দৃষ্ট হয় তা তার পরিবেশকের ব্যক্তিত্বের রূপে ও রঙে রঞ্জিত। সাহিত্যে এই সত্যের স্বীকৃতিই Humanism বা মানবিকতা।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে এই মানবিক সত্য ছাড়া দ্বিতীয় কোন রকমের সত্যের স্থান সাহিত্যে নাই। অন্য নিরপেক্ষ সত্য বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি হতে পারে, শুধু ব্যক্তি নির্ভর সত্যই সাহিত্য। "যখন কোন একটা সত্য লেখক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দেখা দেয়, যখন সে জন্মভূমির সমস্ত ধূলি মুছে ফেলে এমন ছদ্মবেশ ধারণ করে যাতে করে তাকে একটা অমানুষিক স্বয়ম্ভু সত্য বলে মনে হয় তখন তাকে বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস প্রভৃতি নানা নাম দেওয়া হয়। কিন্তু যখন সে সঙ্গে সঙ্গে আপনার জন্মভূমির পরিচয় দিতে থাকে, আপনার মানবাকার গোপন করে না, নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা এবং জীবন আন্দোলন প্রকাশ করে তখনি সেটা সাহিত্যের শ্রেণীভুক্ত হয়।" "সাহিত্য"--রবীন্দ্র রচনাবলী—৮ম খণ্ড—পৃঃ ৪৬৬।

সত্যের এই মানবিকরূপ ছাড়াও মানবিকতার আর একটা দিক আছে। সেটা হচ্ছে মানুষের অন্তরের দুর্বলতাকে স্বীকার করে তদনুযায়ী সাহিত্যে

আদর্শকে সঙ্কুচিত ও সম্প্রসারিত করা। এটা মানব মনের রিয়ালিজমও বলা যেতে পারে। শেলি রোমান্টিক আত্মাভিমান থেকে ভেবেছিলেন তিনি রক্ত-মাংসে একটা দেবদূত বা দেবতা হবেন বা। তিনি সুন্দরের বা নৈর্ব্যক্তিক সৌন্দর্য্যের উপাসক। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি দেখলেন শুধু abstract সৌন্দর্য্যের পূজায় মন ভরে না। সৌন্দর্য্যকে সুন্দর বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে পেতে ইচ্ছে করে। তিনি মনে করতেন সৃষ্টির আদিনর অর্ধনারী অর্ধনর ছিলেন। তার অর্ধ ব্যক্তিত্ব ভাগ করে নিয়ে ঈশ্বর নারী সৃষ্টি করেছেন। প্রেম হচ্ছে পুরুষের প্রাণে তার সেই হারানো অর্ধের সন্ধান। প্রেমের আকুতি এই খোঁজার ব্যাকুলতা। সম্ভবত এই খোঁজার শেষ নেই। সেই হারানো ব্যক্তিত্বের অর্ধ-ভাগিণীকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নহে কিন্তু কখনও কখনও কোন একজন নারীকে দেখে মনে হয় বুঝি ইনিই আমার সেই হারানো অর্ধাঙ্গিনী। এই যেই মনে হওয়া আর অমনি প্রেমের সঞ্চার। তখন তার কাছে মন সমর্পন। কিন্তু নগ্ন মনটা দেখে সে ব্যক্তি চমকে ওঠে। সে আমার মনটাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারে না। তার মন আর আমার মনের মধ্যে বিরাট ব্যবধান। এই ব্যবধান যখন বুঝতে পারি তখনই বলতে হয়—ভুল করেছি আমার সেই অন্তর-সঙ্গিনী তো তুমি নও। তখনই বিচ্ছেদের কুরুক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। শেলী এই রকম কয়েকবার ভুল করে বুঝতে পারলেন, না সে হারানো অন্তর-সঙ্গিনীকে কোন রমণী বিশেষের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। খুঁজে পাওয়ার চেষ্টাই একটা বোকামি। ওটা তার চরিত্রের দুর্বলতা। তাই নিজেকে তিনি বলেছেন—**I am a power girt round with weakness,** আমি দুর্বলতা-ঘেরা শক্তি। এই দুর্বলতা থেকে মুক্ত না হলে সে শক্তির দ্বারা কোন উদ্দেশ্য সফল হবে না।

হিউম্যানিষ্টের কাছে কিন্তু রোমান্টিকের এই কান্না অর্থহীন। সে বলে ওতো স্বাভাবিক। তুমি রক্তমাংসের মানুষ, একটা বিদেহী আত্মা নও তো। রক্ত-মাংসের দুর্বলতা তোমাতে থাকবে বই কি? আদর্শটাকে একটু সংযত কর, নিজেকে দেবতা ভেবো না। তবে আর আক্ষেপ করতে হবে না। তুমি যা করেছ তার মধ্যে অপরাধ কিছুই নাই। মানুষের মধ্যে এই দ্বৈতসত্তা সব সময় কাজ করছে। সে যখন পাপ করে তখন সে পুণ্যের কথা চিন্তা করে, আবার পুণ্য কর্মের মাঝখানে তার মনে কুচিন্তা এসে যায়। তার সাহস তার ভয়ের সঙ্গে জড়িত, লোভের সাথে সংযম। তার স্বাধীনতা আইনের দ্বারা শৃঙ্খলিত, মুক্তি বন্ধনের। রবীন্দ্রনাথ এই অর্থেই বলেছিলেন অসংখ্য বন্ধন

মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ। মানুষের ভাষার অর্থবন্ধনও মেনে নিয়েছেন তিনি।

মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে
ঘুরে মানুষের চতুর্দিকে। অবিরত রাত্রিদিন
মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তার হয়ে ওঠে ক্ষীণ।
পরিস্ফুট তত্ত্ব তার সীমা দেয় ভাবের চরণে ;
ধূলি ছাড়ি' ঊর্ধ্বমুখে একেবারে অনন্ত গগনে
উড়িতে সে নাহি পারে সঙ্গীতের মতন স্বাধীন
মেলি দিয়া সপ্তস্বর সপ্ত পক্ষ অর্থভার হীন।

সঙ্গীতের perfection-এর আদর্শ ভাষায় অচল। কোন সুর দিয়ে ভাবকে যেমন সম্পূর্ণ করে প্রকাশ করা যায়, কথা দিয়ে তেমন পারা যায় না। কথার অর্থের বন্ধনই হয় এর অন্তরায়।

মানুষের এই অর্থবদ্ধ ভাষা প্রকৃতির অন্যান্য প্রকাশ মাধ্যমের সঙ্গে পেরে ওঠে না।

প্রভাতের মর্ম দ্বার মুহূর্তেকে করি উদঘাটন
নির্বারিত করি দেয় ত্রিলোকের গীতের ভাণ্ডার ;
যামিনীর শান্তিবাণী ক্ষণমাত্র অনন্ত সংসার
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, বাক্যহীন পরম নিষেধ
বিশ্বকর্ম কোলাহল মন্ত্র বলে করি দিয়া ভেদ
নিমেষে নিবায়ে দেয় সর্বখেদ সকল প্রয়াস
জীবলোক মাঝে আনে মরণের বিপুল আভাস ;
নক্ষত্রের ধ্রুব ভাষা অনির্বান আলোকের কণা
জ্যোতিষ্কের সূচীপত্রে আপনার করিছে সূচনা
নিত্যকাল মহাকাশে ; দক্ষিণের সমীরের ভাষা
কেবল নিশ্বাসমাত্র নিকুঞ্জে জাগায় নব আশা,
দুর্গম পল্লবদুর্গে অরণ্যের ঘন অন্তঃপুরে
নিমেষে প্রবেশ করে নিয়ে যায় দূর হতে দূরে
যৌবনের জয়গান ;

বাল্মিকীর দুঃখ মানুষের ভাষার এ রকম প্রকাশ শক্তি নাই।—

সেই মত প্রত্যক্ষ প্রকাশ
কোথা মানবের বাক্যে, কোথা সেই আনন্দ আভাস

কোথা সেই অর্থভেদী অভ্রভেদী সংগীত উচ্ছ্বাস,
আত্ম বিদারণকারী মর্মান্তিক মহান নিশ্বাস ?

সুতরাং বাল্মিকীর ভাশা এই বন্ধনের গুরুভার তিনি খানিকটা লাঘব করবেন মাত্র।—

মানবের জীর্ণবাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছুদূর
ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান অশ্বরাজ সম
উদ্দাম সুন্দর গতি, সে আশ্বাশে চিত্তভাসে মম।

দেবতাকে বাদ দিয়ে বাল্মিকী যে মানুষকে তাঁর কাব্যের নায়ক করে নিলেন এটাও তাঁর একটা মনবিকতার উদাহরণ। অবশ্য রামচন্দ্র আদর্শ চরিত্র হিসাবে দেবতারও পূজ্য। বাল্মিকী সত্যই বলেছিলেন, তুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দে গানে। কিন্তু সেই পৌরাণিক যুগে যখন দেবদেবী নিয়েই কাব্যলেখা রীতি ছিল সেই যুগে মানুষকে নিয়ে কাব্যলেখা একটা বিরাট মানবিক পদক্ষেপ।

অবশ্য এ ভাবে দেখতে গেলে গোটা সাহিত্যের ইতিহাসটাই একটা মানবিকতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস হয়ে দাঁড়ায়—সর্বদেশে, সর্বকালে। প্রকৃতির সৃষ্টিতে যেমন ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে মানবের আবির্ভাব হয়েছিল, মানুষের চিন্তা ও সাহিত্যেও তেমনি ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে মানবিকতার আবির্ভাব হয়েছে। থিওরি হিসাবে মানবিকতার যারা চালু করলেন তারা মানব মনে এই ধারার সৃষ্টি করেন নি। যেমন ভগবান মানুষ সৃষ্টি করে এরিষ্টটলের জন্য তাকে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন করা বাকি রাখেন নি। মানুষ মানবিক দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিল।

রোমান্টিক স্বভাবে ছেলে মানুষ। ছেলে মানুষ বলেই সে অনভিজ্ঞ। আর এই অনভিজ্ঞতা থেকেই আসে তার বিস্মিত হবার শক্তি। সে যা দেখে তাই ভালো লাগে। তবে এই ভালো লাগার কাল যৌবন পর্যন্ত। তখনও নূতন জানা এবং তা পাবার চেষ্টা চলতে থাকে। যৌবনে বরং এই পাবার চেষ্টাটা প্রবল হয়। রোমান্টিক চায় জয় করতে। তার আকাঙ্ক্ষা অসীম। এই আকাঙ্ক্ষা যৌবনে প্রবল হয়ে রিপু নাম গ্রহণ করে, ইংরেজীতে যাকে বলে lust. তিন রকম lust-এর কথা রোমান্টিকদের মধ্যে দেখা গেছে **Lust for power, Lust for knowledge and Lust for beauty.**

রোমান্টিক চায় বিশ্বজয় করতে তারপর এক বিশ্বেও হয়ত কুলায় না। রবীন্দ্রনাথের মুখে তাই কেবলই শোনা যেত নূতন নূতন লোকের কথা—

তাঁর নিমন্ত্রন লোকে লোকে
নবনব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।

Power অবশ্য নানা রকমের হতে পারে। Marlowe-র Tamburlaine দেখেছিলেন একে ক্ষাত্রবীর্য্য হিসেবে, Jew of Malta দেখেছিলেন একে অর্থরূপে, আবার Marlowe-র Dr. Faustus এবং Shakespeare-এর Prospero দেখেছিলেন একে অন্য অনেক alchemist-এর মত জ্ঞান হিসাবে, সে জ্ঞান ম্যাজিকই হোক আর ফিজিকস্‌ই হোক। ইংলণ্ডের প্রথম রোমান্টিক যুগের নাটক গুলোতে তাই দেখা যায় একদল অতিকায় মানুষের মাটি-কাঁপানো সদম্ভ পদক্ষেপ ; বাগাড়ম্বর। আবার জ্ঞানকে শক্তি হিসেবে না দেখে শুধু জ্ঞান হিসেবে দেখেও তার জন্য আকাঙ্ক্ষা তীব্রতম হতে পারে। যেমন একখানা Elizabethan নাটক, Tono Bungay, এখানে নায়ক চেয়েছিলেন অপ্রাকৃত জ্ঞান। তিনি এমন একটা মূর্তি নির্মাণ করলেন যার কাছে যে কোন প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে। (প্রাচীন oracle বা দৈবজ্ঞের প্রতিনিধি আর কি।)

কিন্তু এই সব সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা কখনও পরিতৃপ্ত হতে পারে না। মানুষের শক্তি যে সসীম। সুতরাং গল্পের শেষে বিফলতায় সমাপ্তি ঘটাতেই হয়। Tono Bungay-এর সমাপ্তিতে নায়ক নিজেই এইসত্য স্বীকার করে নিয়ে নিজের বিফলতাকে অনিবার্য্য বলে মেনে নিলেন। মনে হয় রোমান্টিক কবিরাই রোমান্টিক চরিত্রের বিপদ বুঝতে পেরেছিলেন। তারা মুখে আস্ফালন করলেও এ মতের হীনতা আপনার মনে মনে জানতেন।

তাছাড়া রিপুর তাড়নায় তাড়িত জীবনে সুখ শান্তির একান্ত অভাব। এলিজাবেথের যুগ তাই ইংলণ্ডের সব চেয়ে উন্নতির যুগ হয়েও সেটা সব চাইতে অশান্তির এবং পারিবারিক দুঃখের যুগ। শক্তিমান বুদ্ধিমান যে পুরুষ মনোরাজ্যে, প্রকৃতির রাজ্যে এবং পার্থিব রাজ্যে এক অতিবিস্তার নিয়ে এলো ইংলণ্ডের ইতিহাসে সেই আবার আনলো অতিরিক্ত মদ্যপান চরিত্রহীনতা চরম ভোগবিলাস ও অশান্তি। মাতালের ছেলেরা দেখতো বাবার সব গুণ আছে, কিন্তু ঐ যে অতিরিক্ত পানদোষ তাতেই তার সব গুণ যায় ঢেকে। তার অত্যাচারে মায়ের এবং তার এবং তার ভাইবোনদের জীবন যায় বিষিয়ে। সে

তখন প্রতিজ্ঞা করলো সে কখনও মদ্যপান করবে না। এইরূপে একে একে জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতার কারণগুলিকে সে পরিহার করতে দৃঢ় সঙ্কল্প বদ্ধ হল। আর বড় হয়ে সেই সঙ্কল্প কার্য্যেও পরিণত করল সে। এই ভাবেই এলো এলিজাবেথান বা প্রথম রোমান্টিক যুগের পর পিওরিটান বা শুচিতার যুগ।

আমাদের পুরাণে ইতিহাসে যেমন দেখি দৈত্যের প্রাদুর্ভাব হলে দেবতার আবির্ভাব ঘটে, তারপর দৈত্য নিধন করে দেবতারও কাজ ফুরায়। সর্বশেষে পৃথিবী আবার মানুষেররই হাতে ফিরে আসে। রোমান্টিক দৈত্যের বাড়াবাড়িও তাই পিওরিটান দেবতার আবির্ভাবে নির্মূল হল। কিন্তু দেবতার রাজত্ব পৃথিবীতে তো বেশিদিন চলতে পারে না। পৃথিবীটা যে মানুষের জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল। সুতরাং পিওরিটান যুগও বেশিদিন চলল না। আবার রাজতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ভোগবিলাসও সুখের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল ইংলণ্ডে। উৎসবের দিনে যদি অনিয়ম কিছু ঘটেও থাকে এবার আর তার জন্যে দানবারির অবতরণের প্রয়োজন হল না। উৎপাত উপসাসর্গাদি আপনা হতেই শান্ত হয়ে এলো। বরং চিন্তা ক্ষেত্রে জন্ম নিল ক্লাশিকাল ধারা—জগতে সর্বযুগে যা সুন্দর যা বড়ো তারই প্রতিষ্ঠা। সুন্দর এবং বড়ো বাছাই-এ ভুল হতে পারে কিন্তু উদ্দেশ্যে ত্রুটি থাকলো না। ক্লাসিক্যাল মানেই হল উঁচু ক্লাসের। ইতিহাসের পরীক্ষায় যার উচ্চতা প্রমাণিত হয়েছে এমন।

উচ্চতর চিন্তা ও ভাবরাজ্যে মানুষের এই অভিযান কিন্তু একেবারে স্থায়ী ফল প্রসব করল না। এক অভিযানেই সে রাজ্য সম্পূর্ণ বিজিত হল না। শুধু একদল সৈনিক সে রাজ্যের মধ্যে কিছুদিন ঢুকে পড়ে কিছু কিছু স্থান অধিকার করে অবস্থান করতে লাগল। তারপর নিম্নভূমি স্বদেশ থেকে আর বেশি সাহায্য না আসায় তারা সে স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হল। কিন্তু এই স্বল্পকালীন বিজয় ও অবস্থিতির ফলে তারা যে জ্ঞান সঙ্গে করে নিয়ে এলো সেটা একেবারে নিষ্ফল হল না। সে জ্ঞান ছড়িয়ে পড়লো নিম্নভূমিতে—এবং সেখানে ঘটালো কিছুটা পরিবর্তন। এর ফলে হয়তো দূর ভবিষ্যতে আবার একদিন সেই উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করবার তাগিদ আসবে সমস্ত সমতল ভূমির মনে। সেবারের অভিযান সম্পূর্ণ না হলেও নিশ্চয়ই অধিকতর সাফল্যে মণ্ডিত হবে।

Dryden ও Pope-এর ক্লাসিকাল যুগের পরে তাই এলো দ্বিতীয় রোমান্টিক যুগ। ওয়ার্ডাসয়ার্থ ও কোলরিজ হলেন এ যুগের পুরোধা। বায়রণ শেলি কীটস এদের অনুবর্তী। এই যুগের মূল উৎস ছিল রুশো ও ফরাসী

বিপ্লব। সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতার বাণী ছিল এই বিপ্লবেরও মন্ত্র। লেখক সম্প্রদায় ও সেই সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতার স্বপ্নে মসগুল হয়ে উঠেছিলেন।

স্বাধীনতা সহজেই উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হতে পারে যদি না নিয়ম দিয়ে তাকে সীমিত করা হয়। স্বাধীনতার বিপ্লব তাই প্রাণঘাতী গিলোটিনের সৃষ্টি করলো, করলো বিভীষিকার রাজত্বের। রাজতন্ত্রের অধীনে লোক যে স্বাধীনতা ভোগ করেছে বিপ্লবী গভর্ণমেণ্টের অধীনে তার ছায়া টুকুও রইল না। আজ যে নেতা—কাল সে গিলোটিনের বলি। অন্যসব স্বাধীনতার কথা ছেড়ে দিয়ে শুধু জীবন ধারণের স্বাধীনতাটুকুও লোকের রইল না। মনে হল রুশোর আদিম-অবস্থা ফিরে এসেছে। কিন্তু সেখানে সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতার বদলে আরণ্য নীতি, বলের অধিকার প্রবর্তিত হল। সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতার স্বপ্নদেখে যুবক ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ফরাসী বিপ্লবের স্বেচ্ছাসৈনিক হতে গিয়েছিলেন নিজের দেশ থেকে পালিয়ে। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করে বৈপ্লবিক স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করে তার অন্তরাত্মা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়লো। তিনি নির্মোহ হয়ে ফিরে এলেন স্বদেশে। দীর্ঘদিন রইলেন আশাভঙ্গের আঘাতে বিমূঢ় ভাবে। তারপর মনসুস্থ হলে শপথ করলেন আর দেশ ছেড়ে যাবেন না। স্বীকার করলেন ইংরেজের সমাজ ও স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠত্ব। বিপ্লবী যুবক রক্ষণশীল ইংরেজ জাতীয় কবিতে রূপান্তরিত হলেন। আর তার সঙ্গী কোলরিজ কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে দার্শনিক ও সমালোচকের জীবন গ্রহণ করলেন। রোমান্টিক কবি হিসাবে নবযুগ প্রবর্তনের অভিপ্রায়ে যে অনৈসর্গিক কবিতা লিখবার ভার তিনি নিয়েছিলেন বন্ধুর সঙ্গে ভাগ করে, দেখলেন কী দুর্বহ সেভার। কেবল একটি মাত্র সম্পূর্ণ কবিতা তিনি এ বিষয়ে লিখতে পেরেছিলেন—**Rhyme of the Ancient Mariner,** আর বাকী কয়েকটি অসম্পূর্ণ টুকরো মাত্র। সেগুলো সম্পূর্ণ করা তার স্বাধ্যায়ত্ব হল না। তিনি সাহিত্যিক চরিত প্রভৃতি নিয়ে নিজের প্রতিভার বিকাশ করতে লাগলেন।

বহু বিঘোষিত রোমান্টিক পুনরুজ্জীবনের যুগ এইভাবেই পরিসমাপ্ত হত যদি না এর আর একটা দ্বিতীয় অভিযাত্রী বাহিনী থাকত। সেটা হল বায়রাণ সেলিও কীটসের দল। তবে এদেরও পরিণতি কি হত শেষ পর্য্যন্ত বলা যায় না। মৃত্যু এসে অকালে জীবনের অবসান ঘটিয়ে দেওয়ায় এরা রোমান্টিক আদর্শ ও চিন্তাধারার উর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। তবে এদের মধ্যেও বায়রাণ এবং কীট্‌স্ ষোল আনা রোমান্টিক ছিলেন না। বায়রাণ

লেখায় ক্লাসিকাল ধারাই অনুসরণ করতেন, তবে জীবনে তিনি রোমান্স জাগিয়ে রাখতেন। রোমান্টিকের আত্মপ্রীতি তার ছিল ষোল আনার স্থলে আঠারো আনা কিন্তু বিশ্বপ্রীতির বদলে ছিল বিশ্ববিরূপতা ও ব্যঙ্গদৃষ্টি। পরার্থেও পরের স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াসে সাহায্য করতে গিয়ে আবার তিনি স্বাধীনতার শহীদও হলেন। আর কীটস্ যেভাবে চলেছিলেন আর দু'বছর বাঁচলে রোমান্টিক গণ্ডীর মধ্যে তাকে আর পাওয়া যেত না। সমালোচক মিড্‌ল্‌টন্ মারি কীটসের চিঠি-ও জীবনীসহিত কবিতার সমালোচনা করে দেখিয়েছেন কীটস্ চিন্তাজগতে সেক্সপীয়রের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। দীর্ঘজীবন পেলে তিনি দ্বিতীয় সেক্সপীয়ার হতে পারতেন। সেক্সপীয়ারকে যেমন কেবলমাত্র রোমান্টিক বললে তার প্রতিভার অবমাননা করা হয় কীটসের বেলায় তেমন শুধু রোমান্টিক কথা তার অবমাননা।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের মৃত্যুর পর ইংলণ্ডের রাজকবি হলেন টেনিসান। বায়রাণের চেয়ে বয়সে টেনিসান মাত্র সতের বছরের ছোট। টেনিসান যখন কিশোর বায়রাণ সেলি কীটস তখন যুবকও লেখক। ওদের কবিজীবনের পরিপূর্ণতার ক্ষণে টেনিসানের কবি চেতনার বিকাশ আরম্ভ হয়। কিন্তু এদের বিফলতা টেনিসানকে সতর্ক করে দেয় এবং টেনিসান ধীর স্থির জাগ্রতদৃষ্টি দিয়ে জাতীয় চরিত্রের যা বৈশিষ্ট্য জাতির যা আশা আকাঙ্ক্ষা আদর্শ সেই সব আহরণ করে তিনি সত্যিকারের ইংলণ্ডের জাতীয় কবি হয়ে ওঠেন। টেনিসানের যুগেই রোমান্টিক কারবারের হিসাব নিকাষ শেষ করে তার লাভ লোকসানের খতিয়ান তৈরি হয়। কাব্যলক্ষ্মীর সোনার তরীতে রোমান্টিকদের সোনার ধান কটি সযত্নে রক্ষা করে রোমান্টিক ব্যক্তিদের করা হয় প্রত্যাখ্যান।

ম্যাথিউ আরনল্ড শেলিকে বিদায় করলেন এই Certificate দিয়ে— that beautiful and ineffectual angel beating his luminous wings against the void in vain ; বায়রণকে—

a Byron trailing throuh Europe the pageant of his bleeding heart. মোদ্দাকথা রোমান্টিকরা এনেছেন দুঃখবাদ, বাড়িয়েছেন মানুষের দুঃখভার। তাদের কাব্য পড়তে গিয়ে দুঃখের হাত থেকে নিস্তার নেই। আর এই কাব্য তার আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরণ সত্বেও অন্তঃসার শূন্য। সুতরাং সবৈব পরিত্যাজ্য। আরণল্ড এ সম্বন্ধে এত নিশ্চিত যে তিনি তার নিজের রোমান্টিক কাব্য Empedocles on Etna-র প্রচার বন্ধ করে দিলেন।

প্রকাশকের আপত্তি আবেদন কিছুতেই তিনি বিচলিত হলেন না। আর কাব্যের চরম আদর্শ তিনি খুঁজে পেলেন ভগবদগীতায়। গীতাপাঠ তার কাছে মানসিক চিকিৎসা। সকল রকম আধুনিক ও রেমোন্টিক ব্যাধির পক্ষে ইহাই প্রশস্ত বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করলেন। রোমান্টিক উৎসবের শেষে সর্বপ্রকার উৎসবজনিত অনিয়মের বিরুদ্ধে আবার জেহাদ ঘোষিত হল। নিয়মানুবর্তিতা, সংযম, সত্য, মঙ্গল, জ্ঞান ও পরাজ্ঞান আবার সাহিত্যের আসরে আসন লাভ করল। বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানও বাদ গেল না। সোসালিষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি হল সোসালিষ্ট ভাবধারার প্রবর্তনের সঙ্গে। এবং এই সর্বপ্রকার আদর্শবাদের বিরুদ্ধে প্রবর্তিত হল মানবিকবাদ। মানুষকে মানুষ বলে জানাই ওই মানবিকবাদের লক্ষ্য। ধর্ম্ম রাজনীতি সাহিত্য সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে মানুষকে তার দুর্বলতা দুঃখ দোষ প্রভৃতি নিয়ে দেখবার এবং চিত্রিতকরার চেষ্টা হল এই মানবিক সাহিত্যে। সবার উপরে মানুষ সত্য এই নীতিই হল মানবিকতাবাদীদের নীতি। রবীন্দ্রনাথ প্রচুর পডাশুনো করেছিলেন। এইসব চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল গভীর এবং নিজের জীবনেও তিনি তাদের অনেক গুলিই গ্রহণ করেছিলেন। চণ্ডীদাসের মত এবং অন্যান্য মানবিকতাবাদী কবিদের মত তিনিও মানুষকে শুধু মানুষ হিসাবে দেখাবার অনেক চেষ্টা করেছেন। আর এই মনোভাব থেকেই তিনি মাঝে মাঝে তাঁর গুরুগিরিও অস্বীকার করেছেন।

আমি তো সাধক নই, আমি গুরু নই,
আমি কবি আছি
ধরণীর অতি কাছাকাছি,………
এপারের খেয়ার ঘাটায়।

তাছাড়া দুঃখ ও দুঃখবাদ নিরসনের জন্যও ররীন্দ্রনাথ আরণল্ডের মতই সচেষ্ট ছিলেন। এমনিতেই তিনি সত্য শিব ও সুন্দরের উপাসক ছিলেন। তাই দুঃখের ভেতর দিয়ে ঈশ্বর লাভ হতে পারে জেনে প্রথম দিকে তিনি দুঃখের জয়গান করলেও শেষ পর্য্যন্ত দুঃখকে অস্বীকারও করেছেন। আনন্দই উপাসনা আনন্দময়ের এইটেই তাঁর অন্তরের কথা ছিল। তাঁর কাছে সকল কথার শেষ কথা—

হে চিরসুন্দর আমি তোরে ভালোবাসি।

আর দুঃখবিলাসীদের তিনি কৃপা করেছেন তাদের দুঃখের কাহিনীতে তাঁর মন গলে গেছে, তিনি আধমরাদের ঘা মেরে বাঁচাতে চেষ্টা করেছেন। মানসীর ভৈরবীগান কবিতার শেষের অংশ মনে করুন।—

যাও তাহাদের কাছে ঘরে যারা আছে
পাষাণে পরাণ বাঁধিয়া,
গাও তাদের জীবনে তাদের বেদনে
কাঁদিয়া।

তারা পড়ে ভূমিতলে ভাসে আঁখিজলে
নিজ সাধে বাদ সাধিয়া।
হায়, উঠিতে চাহিছে পরাণ, তবুও
পারে না তাহারা উঠিতে।
তারা পারে না ললিত লতার বাঁধন
টুটিতে।

তারা পথ জানিয়াছে, দিবা নিশি তবু
পথপাশে রহে লুটিতে।
তারা অলস বেদন করিবে যাপন
অলস রাগিণী গাহিয়া,
রবে দূর আলো পানে আবিষ্ট প্রাণে
চাহিয়া।

ওই মধুর বেদনে ভেসে যাবে তারা
দিবস রজনী বাহিয়া।
সেই আপনার গানে আপনি গাহিয়া
আপনারে তারা ভুলাবে,
স্নেহে আপনার দেহে সকরুণ কর
বুলাবে।

সুখে কোমল শয়নে রাখিয়া জীবন
ঘুমের দোলায় দোলাবে।
ওগো, এর চেয়ে ভালো প্রখর দহন,
নিঠুর আঘাত চরণে।

যাব আজীবনকাল পাষাণ কঠিন
সরণে।
যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ,
সুখ আছে সেই মরণে।

রোমন্টিক মোহ মুক্তির উদাত্ত ঘোষণা রয়েছে চিত্রার 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায়। কবি তাঁর সঙ্গীতবিলাসী জীবনে ধিক্কার দিয়ে নিজেকেই বলছেন—

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শতকর্মে রত,
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুছায়ে
দূর বনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্তবায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি।

তারপর জগতের বিশেষ করে তাঁর নিজ দেশের চিরদুঃখী জনতার দুঃখদৈন্য দেখে ব্রত গ্রহণ করেছেন—

এই সব মূঢ়ম্লান মূকমুখে
দিতে হবে ভাষা—এইসব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা—

নিজেকে ডেকে বলছেন'

কবি, তবে উঠে এসো—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে, তাই করো আজি দান।
বড়ো দুঃখ, বড় ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু—
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য মাঝারে কবি,
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।

কিন্তু এ কাজের জন্য তাঁর কী সম্বল আছে? শুধু—

যেদিন জগতে চলে আসি,
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলবার বাঁশি।

আজ সেই বাঁশিখানিই তিনি একাজে নিযুক্ত করবেন—

সে বাঁশিতে শিখেছি যে সুর
তাহারি উল্লাসে যদি গীতশূন্য অবসাদপুর
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীতে
কর্মহীন জীবনের একপ্রান্ত পারি তরঙ্গিতে,
শুধু মূহূর্তের তরে দুঃখ যদি পায় তার ভাষা,
সুপ্তি হতে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি—তবে ধন্য হবে মোর গান
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্বাণ।

দুঃখ নিরশনের জন্য তাঁর কাব্যকে তিনি করলেন উৎসর্গ। ম্যাথিউ আরণল্ডের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোন পার্থক্য নাই।

কেবলমাত্র অলস কল্পনাবিলাসের বিরুদ্ধে ও রবীন্দ্রনাথের চিত্ত বিদ্রোহ করে উঠত। তিনি চাইতেন কল্পনা যেন কর্মে সার্থক হয়ে ফুটে উঠতে পারে। প্রথম জীবনের ভাবোচ্ছ্বাসকে তিনি দ্ব্যর্থহীনভাষায় নিন্দা করে গেছেন।

মাতৃস্নেহ বিগলিত স্তন্য ক্ষীর রস
পান করি হাসে শিশু আনন্দে অবশ,
তেমনি বিহ্বল হর্ষে ভাবরসরাশি
কৈশোরে করেছি পান, বাঁজায়েছি বাঁশি
প্রমত্ত পঞ্চম সুরে, প্রকৃতির বুকে
লালন ললিতচিত্ত শিশুসম সুখে
ছিনু শুয়ে ; প্রভাত শর্বরী সন্ধ্যা-বধূ
নানা পাত্রে আনি দিত নানাবর্ণ মধু
পুষ্পগন্ধে মাখা।
আজি সেই ভাবাবেশ
সেই বিহ্বলতা যদি হয়ে থাকে শেষ,
প্রকৃতির স্পর্শমোহ গিয়ে থাকে দূ'রে
কোনো দুঃখ নাহি।

বরং তিনি আনন্দে নূতন বাস্তব জীবনের দায়িত্ব বরণ করে নিলেন।

পল্লী হতে রাজপুরে
এবার এনেছ মোরে, দাও চিত্তে বল।
দেখাও সত্যের মূর্তি কঠিন নির্মল।

এই ভাব থেকেই ধর্ম্মজীবনেও তিনি ভক্তির উচ্ছ্বাস সংহত করে তাকে কল্যাণকর্ম্মে নিযুক্ত করতে চেয়েছেন।

ভকতিরে বীর্য দেহ
কর্মে যাহে হয় সে সকল, প্রীতিস্নেহ
পুণ্যে উঠে ফুটি।

তবে প্রথম জীবনের ভাবোচ্ছ্বাস মধ্যজীবনে কর্মের ও বাস্তবতার কাছে বলি দিলেও তিনি তাঁর স্বভাবকে ত্যাগ করতে পারেন নি। জীবনের পরাহ্ণে তিনি আবার হাসিমুখে কর্মমুখরবাস্তবতার কাছে বিদায় নিয়ে কল্পনার লীলা-নিকেতনে ফিরে গেছেন। জীবনের অভিজ্ঞতা বুঝি এই কল্পনার মধ্যেই তাঁকে সত্যের সন্ধান দিয়েছিল। খেয়ার বিদায় কবিতায় তাই শুনতে পাই—

বিদায় দেহো, ক্ষম আমায় ভাই।
কাজের পথে আমি তো আর নাই।
এগিয়ে সবে যাওনা দলে দলে,
জয়মাল্য লওনা তুলি গলে,
আমি এখন বনছায়াতলে
অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই।
তোমরা মোরে ডাক দিয়ো না ভাই।
... ...

তোমরা আজি ছুটেছ যার পাছে
সে-সব মিছে হয়েছে মোর কাছে।
রত্ন খোঁজা, রাজ্য ভাঙা-গড়া,
মতের লাগি দেশ বিদেশে লড়া,
আলবালে জল সেচন করা
উচ্চ শাখা স্বর্ণ চাঁপার গাছে।
পারি নে আর চলতে সবার পাছে।
... ...

পথের শেষে কবিতাতেও সেই স্বীকারোক্তি—

পথের নেশা আমার লেগেছিল
পথ আমারে দিয়েছিল ডাক—
সূর্য তখন পূর্ব গগনমূলে,

তারপর চলার পথে অনেক আশা আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়েছে। পেয়েছি-পাইনিতে হয়েছে তাদের শেষ। আজ জীবনে সায়াহ্নে তিনি এক পরম প্রাপ্তির আশায়ই কূলে বসে খেয়ার তরীর আগমন প্রতীক্ষা করছেন।

নৌকা তখন বাঁধা নদীর কূলে,
শিশির তখন শুকোয়নিকো ফুলে
শিবালয়ে উঠল বেজে শাঁখ।
পথের নেশা তখন লেগেছিল,
পথ আমারে দিয়েছিল ডাক।

এই পথের ডাকে অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করেই কবি পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

ভাবি নাইকো কেন কিসের লাগি
ছুটে চলে এলেম পথের পরে।
নিত্য কেবল, এগিয়ে চলার সুখ
বাহির হওয়ার অনন্ত কৌতুক,
প্রতি পদেই অন্তর উৎসুক
অজানা কোন নিরুদ্দেশের তরে।
ভোরের বেলা দুয়ার খুলে দিয়ে
বাহির হয়ে এলেম পথের পরে।
অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।
এখন কেবল একটি পেলেই বাঁচি,
এসেছি তাই ঘাটের কাছাকাছি।
এখন শুধু আকুল মনে যাচি
তোমার পারে খেয়ারতরী ভাসা।

শেষ দুটো লাইনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও বক্তব্য আছে।—

জেনেছি আজ চলেছি কার লাগি
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।

রোমান্টিকের মনে অকস্মাতের আশা প্রবল। এ এক রকম মানসিক মিকবারিজম। বায়রণের মানসিক বৈশিষ্ট্য ও এই ছিল। তার সৃষ্ট চরিত্রগুলি নানারকম অপকর্ম করে শেষ পর্য্যন্ত এই অকস্মাতের ভেতর দিয়ে সুখের তীরে

পৌঁছে গেছে। কিন্তু হিউম্যানিষ্ট জানেন অকস্মাৎ ওভাবে মনোজগতে কিছু লাভ হয় না। তার জন্য চাই সাধনা। স্থির লক্ষ্যে পৌঁছার দৈনন্দিন কর্মধারা। তিনি বিশ্বাস করেন—

The heights by greatmen reached and kept
Were not attained by sudden flights
But they, while their Companions slept,
Were toiling upwards in the night.

রবীন্দ্রনাথের বেলায় তাঁর বোলপুরের ঊষর মরুতে কৃচ্ছ্রসাধনও এই জন্যই। আর এর ভেতর দিয়েই তিনি সাধনার লক্ষ্যকেও জানতে এবং বুঝতে পেরেছেন। তাই বড় গলা করে বলেছেন সেকথা "জেনেছি আজ চলেছি কার লাগি।"

"কে সে?"—এবার ফিরাও মোরে লেখার সময়েও কিন্তু তা ভাল করে বলতে পারেন নি কবি।—উত্তরে বলেছেন—

জানি না কে। চিনি নাই তারে,—
শুধু এইটুকু জানি—তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানব যাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাত, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি।······ইত্যাদি।

কী জানলেন কবি এর পরে সেটা এক জায়গায় গুছিয়ে বলা নেই কোনখানে। সংগ্রহ করে নিতে হবে পাঠককে আপন সাধ্যমত। ব্যাপারটাও শক্ত এবং দার্শনিক তত্ত্বভরা। এ বই-এ ওটা এড়িয়ে যাবারই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে বিশ্ব ভারতী পত্রিকার ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত আমার একটা প্রবন্ধ চোখে পড়ে গোলমালের সৃষ্টি করে দিল। এখন কেবলই মনে হচ্ছে একেবারে এড়িয়ে গেলে লেখাটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই সংক্ষেপে একটু আলোচনা করছি।

আধুনিককালে সাহিত্যও বিজ্ঞানের মত একটা সর্বজাগতিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। এক দেশের বিজ্ঞান চর্চার ফলাফল যেভাবে অন্য দেশে যায় এক দেশের সাহিত্য চর্চার ফলাফল ও তেমনি অন্য দেশে যায়। আর এইভাবে সকল দেশের স্যহিত্য চিন্তা নিয়ে একটা সর্ব মানবের সাহিত্যচিন্তা গড়ে ওঠে।

সমস্ত উন্নত জাতির সাহিত্যিক ও সাহিত্যের ছাত্রেরা তাই পৃথিবীর অপরাপর উন্নত জাতির সাহিত্যের সহিত পরিচিত হয়ে থাকে এবং সাহিত্যের নানা সমস্যা নিয়ে চিন্তা করে। আর সকলের মিলিত চেষ্টায় এই সব সমস্যা সমাধানের দিকে এগিয়ে চলে।

রবীন্দ্রনাথ নিজে বিশ্ব সাহিত্য ও চিন্তাধারার সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। বিদেশী সাহিত্যের সমস্যাগুলি তাই তাঁরও নিজস্ব সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং সেই সব সমস্যার সমাধান তিনি তাঁর মত করে নিয়েছিলেন। তাই তো দেখি রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথ রিয়ালিষ্ট চিন্তাধারার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছেন এবার ফিরাও মোরে প্রভৃতি কবিতায় এবং অনেক সময়ে সাহিত্য সমালোচনার ভেতর দিয়ে তিনি নিজের লেখায় কল্পনার প্রভাব ও বাস্তবতার অভাব স্বীকার করতেও বাধ্য হয়েছেন। তবে বাস্তববাদীদের কাছে এই ন্যূনতাস্বীকার সাময়িক ঘটনা মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনে। তিনি বাস্তব বা রিয়ালিটির স্বরূপ কি এই প্রশ্নে বিজ্ঞান ও দর্শন-সম্মত সমস্ত তত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তার সাহিত্যিক মতবাদ গড়ে তোলেন ; এই নোতুন মতবাদকে উচ্চতর বাস্তববাদ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। তবে প্রকৃতিতে এটা রোমান্টিক বা আদর্শবাদী।

আদর্শবাদী সাহিত্য 'শিল্পের জন্যই শিল্প সৃষ্টি' (art for art's sake) এইখানে পৌঁছে গেলে বাস্তব জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তখন বাস্তববাদ শিল্পকে ফটোগ্রাফীতে পরিণত করতে চায়। যেমন দেখবো, তেমন লিখবো। তখন শিল্পীর চোখ যায় জগতের দুঃখ, দৈন্য, গ্লানি, নীচতা, ময়লা, নোংরা, আঁস্তাকুড়ের দিকে। তারই ছবি এঁকে শিল্পী মনে করে সে জীবনের বাস্তব রূপ দেখছে। কিন্তু আসলে সেও বাস্তবের এক পিঠ দেখছে মাত্র। বিধাতার জগত আলোয় আঁধারে সম্পূর্ণ, শিল্পীর হয় আলো নয় আঁধার। সুতরাং দু'জনই আংশিক সত্যের দ্রষ্টা এবং স্রষ্টা। তথাকথিত বাস্তববাদ তাই আর এক ধরণের আদর্শবাদ ছাড়া আর কিছু নয়।

তারপর বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বহির্জগতের সত্য ইলেকট্রোন ও প্রোটোন, এবং সম্ভবতঃ শেষ পর্য্যন্ত বস্তু জগতের বাস্তবতা একেবারেই বৈদান্তিকের মায়া হয়েই দাঁড়াবে। মনোবিজ্ঞানের কাছেও মানুষের মন কতকগুলি শারীরিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সমষ্টি ও বিন্যাস ছাড়া আর কিছুই নয়। মাত্র কয়েক-শতাব্দীর ব্যবধানে মানুষের বুকফাটা আর্তনাদ, ইতিহাসের কুরুক্ষেত্র কেবল মাত্র

সাহিত্যের কিম্বদন্তীতে রূপান্তরিত হয়। জগৎ ও সৃষ্টি শেষ অবধি হয়ে যায় লীলা। স্বপ্ন বিলাস –

We are such stuff
As dreams are made on, and our little life
Is rounded with a sleep.

রবীন্দ্রনাথও জীবনস্বপ্নের কথা বলেছেন চিত্রার 'মৃত্যুর পরে' কবিতায়।

যদি কোথা থাকে লেশ জীবন স্বপ্নের শেষ
তাও যাক মরে।

সুতরাং জীবন যদি স্বপ্ন তবে তার ছবি সাহিত্য সত্য বা বাস্তব হবে কি করে? সে তো স্বপ্নের স্বপ্ন, ছায়ার ছায়া। তাই বাস্তবতার বরাই করা বৃথা অহঙ্কার মাত্র। রবীন্দ্রনাথ তাই নারদকে দিয়ে বাল্মিকীকে বলিয়েছেন,

সেই সত্য যা' রচিবে তুমি,
ঘটে যা' তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনম স্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

কবি ঋষি, মন্ত্র দ্রষ্টা। সত্য দ্রষ্টা। কল্পনার সাহায্যেই এই সত্য দর্শন সম্ভব। ধ্যানে।

গুপ্তধন গল্পটিতে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। Bernard shaw বলেছেন শিল্পের জন্য কেবল শিল্প সৃষ্টি হলে আমি একটা ছত্রও লিখতুম না। সত্যের জন্য সাহিত্য। দেখ না—Goldsmith বলেছিলেন,

How small of all that human hearts endure
Kings or laws can cause or cure.

এখন Goldsmith বেঁচে থাকলে লিখতেন—

How much of all that human hearts endure
Factory laws alone can cause or cure.

Bernard shaw তাই বললেন, যারা গরীব তারাই করুক দারিদ্র্যের জয়গান, (Let those who are poor sing in praise of poverty.) জীবনে কিন্তু অর্থই অর্থ এনে দেয়। অনর্থের মূল একে তারাই বলে যাদের অর্থ নাই। রবীন্দ্রনাথ সব শুনলেন। তারপর তার নিজের সমাধান দিলেন গুপ্তধনে।

একদা গ্রামেরজমিদার বংশ পড়ে গেল দারিদ্র্যের মধ্যে। তাঁদেরই আশ্রিত এক পরিবার পেল জমিদারী। তখন দৈন্যদশাপ্রাপ্তদের চললো অর্থের সাধনা —তিন পুরুষ ধরে। মৃত্যুঞ্জয় সেই তৃতীয় পুরুষ। সাধনায় প্রসন্ন হলেন দেবতা। এবং সন্ন্যাসী এসে দিয়ে গেল গুপ্তধনের সন্ধান। আর সেই গুপ্তধন যখন অধিগত হল তখন মৃত্যুঞ্জয় স্বর্ণকারাগারে বন্দী হয়ে বুঝতে পারলেন সন্ধ্যার স্বর্ণের কাছে এই প্রাণহীন স্বর্ণ কত অকিঞ্চিৎকর। তখন সে বলে উঠল, "ধরাতলে দীনতম হইয়াও যদি আবার সেই জীবন স্রোতে জীবন মিশাইতে পারি তবেও জীবন ধন্য হয়।" কাব্যেও রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছেন,

না চাহিতে মোরে যা করেছ দান,
আকাশ আলোক তনু মনপ্রাণ
দিনে দিনে প্রভু লইতেছ মোরে
সে মহাদানেরই যোগ্য করে।

দেখা গেল অর্থ ছাড়াও জীবনের বড় অর্থ আছে।

'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ জীবনের এই অর্থ প্রকাশ করেছেন। দেখিয়েছের কল্পনার স্বর্গ থেকে বাস্তবের পৃথিবীকে ভাল করবার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরবার দরকার নেই। শতলক্ষ বৎসর স্বর্গ ভোগ করবার পর ক্ষীণপুণ্য মানবাত্মা—মর্ত্যে ফিরে আসার সময়ে দেখতে পেল—

শোকহীন
হৃদিহীন সুখস্বর্গভূমি, উদাসীন
চেয়ে আছে। লক্ষলক্ষ বর্ষ তার
চক্ষের পলক নহে; অশ্বত্থ শাখার
প্রান্ত হতে খসে গেলে জীর্ণতমপাতা
যতটুকু বাজে তার,—ততটুকু ব্যথা
স্বর্গে নাহি বাজে, যবে মোরা শতশত
গৃহচ্যুত হতজ্যোতি নক্ষত্রের মতো
মুহূর্তে খসিয়া পড়ি দেবলোক হতে
ধরিত্রীর অন্তহীন জন্মমৃত্যু স্রোতে।

অপর দিকে—

মর্ত্যভূমি স্বর্গনহে
সে যে মাতৃভূমি—তাই তার চক্ষে বহে

অশ্রুজল ধারা, যদি দুদিনের পরে
কেহ তারে ছেড়ে যায় দু দণ্ডের তরে।

তাই স্বর্গ দেবতাদের দিয়ে মানবাত্মা মাটির মায়ের কোলে ফিরে আসতে ব্যাকুল হল।

আকো স্বর্গ হাস্য মুখে, করো সুধাপান
দেবগণ, স্বর্গ তোমাদেরই সুখস্থান
মোরা পরবাসী।
স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
মর্ত্যে থাক সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেম ধারা—অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গ খণ্ডগুলি।

Aldous Huxley-র Brave New world-এও এই ভাবেই তার Savage বিজ্ঞানের স্বর্গকে পরিত্যাগ করে প্রাচীন রোমান্টিক জগতকে শ্রদ্ধা নিবেদন করল

রবীন্দ্রনাথ ও Aldous Huxley-র দেখা জগতের এইরূপ কি বাস্তব না কল্পনা? কল্পনা হলেও তা বাস্তবের চেয়েও বাস্তবতর। মানবিকতাবাদেরও উর্ধ্বে এর স্থান।

সমাপ্ত